ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

# মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

দ্বীন ও দুনিয়া (১)

**ভলিউম-৫**


লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল আজীজ
প্রাক্তন মোদার্‌রেস, আশ্‌রাফুল উলুম মাদ্রাসা, বড় কাটরা, ঢাকা



**এমদাদিয়া লাইব্রেরী**
চকবাজার ঃ ঢাকা



www.almodina.com

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **খাঁটি ধর্ম** | ১ |
| সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের ভ্রান্তি | ১ |
| মুসলমানের পদমর্যাদা | ৪ |
| পরিচিত ও অপরিচিতের সহিত ব্যবহার | ৬ |
| কাফেরদের সহিত সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত | ৮ |
| এখলাছের গুরুত্ব | ৯ |
| এখলাছের আবশ্যকতা | ১০ |
| বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়া | ১১ |
| মুজাহাদার নিয়ম | ১৩ |
| ছুফীবাদের স্বরূপ | ১৬ |
| এল্‌মের ব্যাপারে এখলাছের আবশ্যকতা | ১৮ |
| দাসত্বের চাহিদা | ২১ |
| সুনিয়তের আবশ্যকতা | ২৩ |
| এখলাছ না থাকার অপকারিতা | ২৪ |
| আধ্যাত্মবিদদের এখলাছ | ২৮ |
| এখলাছ লাভ করার উপায় | ২৯ |
| **ধর্মের ব্যাখ্যা** | ৩২ |
| ভূমিকা | ৩২ |
| “তাফরী” (বিকেন্দ্রীকরণ) ও “তাজদীদ” (সংস্কার)-এর স্তর | ৩৩ |
| ব্যাখ্যার স্তর | ৩৪ |
| ধর্মের অমর্যাদা | ৩৪ |
| দো'আ ও ওযীফার পার্থক্য | ৩৬ |
| দো'আর নিয়ম | ৩৮ |
| শয়তানী ধোঁকা | ৪১ |
| দৃঢ়তার আবশ্যকতা | ৪২ |
| দো'আর স্থান | ৪৩ |
| তাবার্‌রুক সংক্রান্ত আলোচনা | ৪৫ |
| বংশগত সম্পর্কের ফল | ৪৭ |


www.almodina.com

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|

তাবার্‌রুক উপকারী হওয়ার তাৎপর্য ........................ ৪৮
বংশমর্যাদার মূল্য ........................ ৪৯
আকায়েদের ভুল-ভ্রান্তি ৫২
অনিষ্টের কারণ ........................ ৫৩
আত্ম-প্রীতি দোষ ........................ ৫৫
অভ্যাস বিরুদ্ধ ও বিবেক বিরুদ্ধের পার্থক্য ৫৬
বাস্তবতার স্বরূপ ৫৭
পুলসিরাতের স্বরূপ ৫৮
শরীঅতের পথ ৬০
বিবেকের সীমা ........................ ৬০
তক্‌লীদের আবশ্যকতা ........................ ৬২
বাহুল্য ও স্বল্পতার পরিণাম ৬৩
শরীঅতের প্রাণ ........................ ৬৪
তত্ত্ব ও রহস্যের মুখোস উন্মোচন ৬৫
বিবেক বিরোধ ........................ ৬৭
রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ৬৮
ধর্মের অন্যান্য অঙ্গসমূহের গুরুত্ব ৬৯
ধর্মের অঙ্গসমূহের বিবরণ ৭০
কুসংসর্গের প্রতিক্রিয়া ........................ ৭২
আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ........................ ৭৩
জায়েয ও না-জায়েযের আলোচনা ৭৪
ইসলামী সভ্যতা ৭৫
আধুনিক সামাজিকতা ........................ ৭৭
অনুমতি চাওয়া ৭৮
ছুফীবাদের স্বরূপ ৮০
ইসলামের স্বরূপ ৮১
আমলের প্রকারভেদ ৮২
**পূর্ণ ধার্মিকতা** ........................ ৮৫
ভূমিকা ........................ ৮৫
অকৃতকার্যতার রহস্য ........................ ৮৬
আকাঙ্ক্ষা ও উপায়ের পার্থক্য ৮৬
ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই ........................ ৮৭
আধুনিক যুগের আপত্তিসমূহ ৮৮
কতিপয় উদাহরণ ৮৮
সঙ্কীর্ণতার স্বরূপ ৯১

www.almodina.com

**বিষয়** | **পৃষ্ঠা**


প্রতিফলের ওয়াদা ........................................ ৯৩
খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায় ৯৫
বন্দেগী ও অভিমানের স্তর ৯৭
প্রত্যেক কাজের উপায় ৯৮
দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য ১০০
জীবিকার জন্য উপায় অবলম্বন করা ১০১
নফ্‌সের বাহানা ১০৪
আল্লাহ্‌র সহিত বাক্যালাপ ১০৫
এবাদত কবূল হওয়ার লক্ষণ ১০৬
ধর্ম-কার্যে অকৃতকার্যতার কারণ ১০৭
আয়াতের তফসীর ১০৮
পূর্ণতা লাভের চেষ্টা ........................................ ১০৯
দ্বীনদারী ও অল্পে তুষ্টি ........................................ ১১০
জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনী ........................................ ১১১
মূর্খ তাওয়াক্কুল (ভরসা) কারীর কাহিনী ১১২
জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনী ১১৩
খোদার সাহায্য ........................................ ১১৪
চিন্তাহীনতা ........................................ ১১৫
একটি চমৎকার বিষয়বস্তু ১১৬
ছাহাবীদের অবস্থা ........................................ ১১৬
তাকওয়ার ব্যাখ্যা ........................................ ১১৭
ছাদেকীন (সত্যবাদীগণ)-এর ব্যাখ্যা ১১৯
উক্ত নেকীর আয়াতের তফ্‌সীর ১২১
আকায়েদের বর্ণনা ১২২
আমলের প্রকারভেদ ১২৩
আশেকের মর্যাদা ১২৫
বান্দার হকের প্রকারভেদ ১২৬
দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ ........................................ ১২৮
মৃতদিগকে মন্দ বলিতে নাই ১২৯
খোদার ওলীদের প্রতি সম্মান ১৩০
ছবরের স্বরূপ ও প্রকার ১৩১
পুংমৈথুন ........................................ ১৩২
পুংমৈথুনের সূচনা ১৩৩
লেওয়াতাত (পুংমৈথুন) শব্দের অপপ্রয়োগ ১৩৪
দৃষ্টি-রোগ ১৩৫

**বিষয়** **পৃষ্ঠা**


খোদা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা ১৩৬
খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় ১৩৮
খোদার দড়ি ১৩৯
কাম-প্রবৃত্তির প্রকারভেদ ১৪০
একটি ব্যাপক চরিত্রগুণ ........................................ ১৪০
কামেল হওয়ার উপায় ........................................ ১৪২
নফসের আকাঙ্ক্ষা দমন করা ........................................ ১৪২
সাধারণ ওলী ও বিশেষ ওলীর পার্থক্য ১৪৩
কামেলদের সংসর্গের শর্ত ........................................ ১৪৪
কামেলদের সংসর্গের প্রতিক্রিয়া ১৪৫
'ছিদক'-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ১৪৫
শরীঅতের পরিভাষা ১৪৬
তাকওয়ার ফযীলত ১৪৭
তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর ১৪৮
একটি রসাত্মক গল্প ........................................ ১৫০
নস্‌খ (শরীঅতের আদেশ নিষেধ রহিতকরণ)-এর অর্থ ১৫০
**ধর্মের প্রতি মনোযোগ দানের আবশ্যকতা** ১৫২
ধর্মীয় লাভই প্রকৃত লাভ ১৫২
সন্তানসন্ততির ধর্মীয় প্রতিপালন ১৫৪
দুনিয়া ও আখেরাতের সংশোধন ১৫৪
ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতা ........................................ ১৫৬
রাসূলকে অস্বীকার করার পরিণাম ১৫৭
আমল সংক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়া ১৫৮
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ব্যাখ্যা ১৫৯
উত্তম শিক্ষা ........................................ ১৬০
শিক্ষা দীক্ষার আদব ১৬১
উত্তম আদর্শের অনুসরণ ১৬২
বিবাহের দৃষ্টান্ত ........................................ ১৬৪
শোক প্রকাশে হযরত (দঃ)-এর দৃষ্টান্ত ১৬৫
হুযূর (দঃ)-এর দারিদ্র্য ১৬৬
একটি কাহিনী ১৬৭
গরীবের আন্তরিকতা ১৬৯
শ্রদ্ধার প্রতিক্রিয়া ........................................ ১৭০
**ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা** ১৭২
কোরআনের মর্যাদা ১৭২

**বিষয়** | **পৃষ্ঠা**


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কোরআন ও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র | ১৭৪ |
| কোরআন কিরূপে বুঝিতে হইবে | ১৭৪ |
| আজকালের রোগ ........................................ | ১৭৫ |
| কোরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রকারভেদ | ১৭৮ |
| কোরআনের শান্তি শিক্ষা | ১৮০ |
| আধ্যাত্মিক রোগ নিরূপণ | ১৮২ |
| ধর্ম খুবই সহজ ........................................ | ১৮৩ |
| কোরআনে পরিবর্তন সাধনের অপচেষ্টা | ১৮৬ |
| এল্ম ও আমলের অভাব | ১৮৭ |
| কোরআন হেফ্য করার আবশ্যকতা | ১৮৯ |
| দুনিয়ার স্বরূপ | ১৯১ |
| খেদমতে দ্বীনের গুরুত্ব | ১৯৩ |
| ধর্মের খাদেমের খেদমত | ১৯৪ |
| খোদা-প্রেমিকগণ অপমাণিত নহেন | ১৯৭ |
| কোরআন হেফাযতের দায়িত্ব | ১৯৮ |
| এল্মে দ্বীনের সহজ লভ্যতা | ১৯৯ |
| আরবী শিক্ষার গুরুত্ব | ২০০ |
| কোরআনের শব্দের গুরুত্ব | ২০১ |
| আখেরাতের ব্যাপার ........................................ | ২০১ |
| কোরআন শিক্ষা দেওয়ার সঠিক সময় | ২০৩ |
| অনুমতি লাভের রহস্য | ২০৪ |
| মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত অজুহাত | ২০৫ |


■

www.almodina.com

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

# মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

■

## খাঁটি ধর্ম

■

এই ওয়াযের আলোচ্য বিষয় "এখলাছ"। ১৩২৯ হিজরীর ৯ই যিলকদ কানপুর চাটাই মহলে ১২০০ শ্রোতার সম্মুখে তিন ঘন্টাকাল এই ওয়ায করেন।

এখলাছ হইল নিজের কোন স্বার্থ লক্ষ্য না হওয়া এবং শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা। ইহা লাভ করার উপায় এই যে, কোন কাজ করিবার পূর্বে কাজটি কেন করা হইতেছে, তাহা যাচাই করুন। যদি কোন খারাপ নিয়ত দেখেন, তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলুন এবং খালেছভাবে খোদার জন্য নিয়ত করুন।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّابَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ

### সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের ভ্রান্তি

ইহা সূরায়ে যুমারের একখানি আয়াত। এই সূরার প্রারম্ভেও অপর একখানি আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আয়াতখানি এই ঃ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ "স্মরণ রাখ, যে এবাদত শির্ক হইতে মুক্ত, তাহা আল্লাহ্‌র জন্যই উপযুক্ত।" ইহাতে একটি জরুরী বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে, যাহা কোন অবস্থাতেই উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, প্রথমতঃ, ইহা পালন করিতে আল্লাহ্ কর্তৃক আদেশ দান ইহা জরুরী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম দুই প্রকার। এক প্রকার কর্ম যাহা অধিকাংশ লোকই উহার গুরুত্ব দান করে। দ্বিতীয় প্রকার ঐসব

www.almodina.com

কর্ম যাহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহা গুরুত্ব দানের উপযোগী। উদ্ধৃত আয়াতে এই প্রকার কর্মই বর্ণিত হইয়াছে, যাহা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি সাধারণতঃ ইহাকে লোকে খুব কম গুরুত্ব দেয়, কিংবা একেবারেই দেয় না। তাছাড়া বিষয়টি ধর্মের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত, কোন একটির সঙ্গে নির্দিষ্ট নহে। এই দিক দিয়া দেখিলেও বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আয়াতের অনুবাদ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি বলিয়া দিন, ধর্মকে আল্লাহ্‌র জন্য খাঁটি রাখিয়া এবাদত করিতেই আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

এই অনুবাদ হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, আয়াতের আলোচ্য বিষয় "এখলাছ"। এখলাছ অর্থ খালেছ (খাঁটি) করা। এই শব্দটি নূতন নহে। বহুবার শুনাশুনি হইয়াছে। তবে সাধারণ লোক ভুলবশতঃ ইহার অর্থ প্রেম বা মহব্বত মনে করিয়া লইয়াছে।

এই কারণেই কোন কোন এলাকায় বিবাহের সময় কন্যার কপালে "কুলহুয়াল্লাহ্" লিখিয়া দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। "কুলহুয়াল্লাহ্" সূরার আলোচ্য বিষয় এখলাছ। সুতরাং কন্যার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহা কন্যার কপালে লিখা হয় যে, ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত ও এখলাছ বহাল থাকিবে। সুতরাং তাহারা এখলাছের অর্থ মহব্বত মনে করিয়াছে। নতুবা তাহারা কোন মহব্বতের আয়াতই লিখিত। অথচ প্রথমতঃ, এই অর্থটি নিরেট ভুল। দ্বিতীয়তঃ, তাবীয লিখা আসলে পাঠ করার স্থলাভিষিক্ত। (কেহ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেই তাহাকে তাবীয লিখিয়া দেওয়া হয়।) সুতরাং ইহা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়; কিন্তু সাধারণতঃ তাবীযকেই বেশী কার্যকরী মনে করা হয়। আয়াত পাঠ করাকে তেমন উপকারী মনে করা হয় না।

হাদীস শরীফে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের একটি অভ্যাস হইতে তাবীযের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। "হিছনে হাছীন" কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) আপন সন্তানদিগকে أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ "আমি আল্লাহ্‌র উক্তিসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করি" বাক্যটি পড়াইতেন। যাহারা অবুঝ ও পড়িতে অক্ষম ছিল, তাহাদিগকে বরকত পৌঁছাইবার জন্য তিনি এই দো'আ লিখিয়া গলায় পরাইয়া দিতেন। এই হাদীসই তাবীয প্রথার মূল, ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পাঠ করানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য। তবে যাহারা পাঠ করিতে পারিত না, তাহাদেরকে বরকত পৌঁছাইবার জন্য তাবীয ব্যবহার করানো হইত। সুতরাং তাবীয ধারণ করা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। কিন্তু আজকাল প্রকৃত তত্ত্ব না জানার কারণে ব্যাপার উল্টা হইয়া গিয়াছে। পাঠ করা অপেক্ষা তাবীয ধারণ করাকেই এখন বেশী ক্রিয়াশীল মনে করা হয়। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, যেহেতু এযুগে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ, এই জন্য আমাদের বুযুর্গগণ তাবীযের তরীকা অবলম্বন করিয়াছেন। তাছাড়া, পাঠ করা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। অথচ মানবীয় প্রবৃত্তি সকল কাজেই সহজ পথ আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পায়। তাবীযের বেলায়ও ইহাই হইয়াছে। যাহা হউক, আল্লাহ্‌র নামসমূহের বরকত নিশ্চয়ই আছে, তবে সম্পর্ক থাকা চাই। বিবাহের সহিত "সূরা-কুলহুয়াল্লাহ্"-এর কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন আয়াত পাঠ করা উচিত। আর লিখিতে হইলেও সম্পর্কযুক্ত আয়াত লিখা উচিত। কন্যার কপালে "মাহ্‌রাম" (যাহার সহিত চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষেধ) ব্যক্তি দ্বারা লিখানোও একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। অথচ মাহ্‌রাম নহে, সাধারণতঃ এমন ব্যক্তিই লিখিয়া থাকে। ইহা কিছুতেই জায়েয নহে। এই ত্রুটি

www.almodina.com

সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখলাছ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তাবীযের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ায় এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করা হইল।

মোটকথা, সাধারণ লোকদের মধ্যে কোন কোন শব্দের ভুল অর্থ প্রচলিত আছে। বলিতে কি, বিশিষ্ট লোকগণও কোন কোন শব্দের ভুল অর্থ করিয়া থাকেন। যেমন, উত্তম চরিত্রের অর্থ তাহাদের মধ্যে ভুল প্রচলিত আছে। মিযাজে নম্রতা থাকা ও রাগ না থাকাই তাহাদের মতে উত্তম চরিত্র। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহা উত্তম চরিত্র নহে; বরং ইহা উত্তম চরিত্রের একটি বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। চরিত্র বলিতে একটি আধ্যাত্মিক শক্তি বুঝায়। অর্থাৎ, সদগুণাবলী অভ্যাসগত চরিত্রে পরিণত হইলে চরিত্রবান বলা যায়।

দৃষ্টান্ত ঃ, নিজকে অন্য সকল অপেক্ষা মনে প্রাণে ছোট মনে করাকে বিনয় বলা হয়। বাহ্যতঃ কাহারও সহিত নম্র ব্যবহার করিলেই তাহাকে বিনয় বলা যাইবে না; বরং ইহা বিনয়ের একটি লক্ষণ মাত্র। ইহা স্থানবিশেষে প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। কোরআন মজীদেও নম্র ব্যবহারের প্রশংসা করা হইয়াছে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

"আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট বান্দাদের খাছ গুণ হইল জমিনে নম্রতার সহিত চলা।"

এই আয়াতে বিনয়ের একটি লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। কেননা, আসল স্বরূপ দ্বারা কোন জিনিসের পরিচয় বা সংজ্ঞা ব্যক্ত করা হয়, আর কখনও উহার লক্ষণ দ্বারা। সুতরাং নম্রতা-সহকারে চলাফেরা করা বিনয়ের একটি লক্ষণ মাত্র।

হাদীসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় দাড়িতে অঙ্গুলি বুলাইতেছিল। অনেকেরই এই রকম অভ্যাস দেখা যায়। তাহারা নামাযের মধ্যেই কাপড় কিংবা চুল লইয়া খেলা করে। এই ব্যক্তিকে দেখিয়া হুযূর (দঃ) বলিলেন ঃ "তাহার অন্তরে খুশু (একাগ্রতা) থাকিলে সে দাড়ি লইয়া খেলা করিত না।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, খুশু একটি আধ্যাত্মিক শক্তি এবং নামাযে খেলা-ধুলা না করা ইহার একটি লক্ষণ মাত্র।

নম্রতাকে তাওয়াযু' বা বিনয় মনে করিয়া লওয়ার ফলে দুইটি ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার ফলে প্রকৃত চরিত্রের শিক্ষাগ্রহণকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকে। কেননা, চরিত্রের অর্থ পরিবর্তন করিয়া মানুষ নিজকে চরিত্রবান মনে করে এবং ইহার উপরই ইতি দেয়। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, অন্তরে নিজকে অনেক বড় মনে করে আর মুখে প্রকাশ করে যে, সে কিছুই নহে। বাস্তবপক্ষেও তাহার অন্তরে নম্রতার কিছুই নাই।

ইহার পরীক্ষা এই যে, যখন কেহ বিনয়ের ভান করিয়া বলিতে থাকে যে, সে কিছুই নহে, তখন আপনি সাহস করিয়া এই কথা বলিয়া দিন ঃ ঠিকই বলিয়াছেন, আমি এত দিন মারাত্মক ভুলে পতিত ছিলাম। আজ জানিতে পারিলাম যে, আপনি একটা অপদার্থ বৈ কিছুই নহেন। এরপর লক্ষ্য করুন, লোকটি তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিবে। ভাইসব, জিজ্ঞাসা করি, লোকটি যদি প্রকৃতই নিজকে ছোট জ্ঞান করিত, তবে সে রাগান্বিত হয় কেন? বুঝা গেল, সে কখনই নিজকে ছোট মনে করে না। তবে এই ধরনের কথা বলার কারণ এই যে, সাধারণ লোক এই ধরনের উক্তিকে প্রশংসার চোখে দেখিয়া থাকে। এইভাবে অধিক পরিমাণে শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়ানো যায়। সুতরাং অধিক প্রশংসার লোভে নফ্স এই তরীকা আবিষ্কার করিয়াছে। সত্য বলিতে কি,

www.almodina.com

এই ধরনের বিনয় অহঙ্কার হইতে উদ্ভূত। উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারাই প্রকৃত বিনয়ী ও মেকী-বিনয়ীর পার্থক্য ধরা পড়িয়া যায়।

দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই যে, নম্রতাকে বিনয় মনে করার পর কঠোরতাকে চরিত্রহীনতা মনে করা স্বাভাবিক। খোদাপ্রেমিকগণ মাঝে মাঝে আপন ভক্তদের প্রতি কঠোরতা করিয়া থাকেন। ইহাতে অন্যেরা তাঁহাদেরকে চরিত্রহীন বলিয়া দোষারোপ করে। ভাইগণ, চরিত্রের অর্থ পরিবর্তন করার ফলেই ইছ্‌লাহ্ বা দোষ সংশোধনের নাম হইয়া গিয়াছে চরিত্রহীনতা। প্রকৃতপক্ষে কঠোরতার স্থলে নম্রতা প্রদর্শন করাই অভদ্রতা বা অসৎ ব্যবহার।

বন্ধুগণ! যদি কোন অবুঝ ছেলে বিষ কিংবা আফিম মুখে দেয় এবং দেখা যায় যে, এখনই গিলিয়া ফেলিবে, এমতাবস্থায় কোন্‌টি উত্তম চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে? তাহার মনঃকষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চুপ থাকা, না তাহার মুখে হাত ঢুকাইয়া উহা বাহির করিয়া লওয়া? প্রকৃতপক্ষে ছেলেটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা না করাই হইবে চরিত্রহীনতা এবং রক্ষা করা একটি মহৎ চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। অথবা মনে করুন, কোন অন্ধ পথ চলিতেছে। তাহার সম্মুখে কূয়া। মুখে বলিলে সে থামিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় পূর্ণ গাম্ভীর্যের সহিত তাহাকে বলা, হাফেয সাহেব! আপনার সম্মুখে কূয়া সাবধানে চলুন; কিংবা হাত ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম চরিত্র?

اگـر بینم که نابینـا و چاه است ـ اگر خاموش بنشینم گناه است

(আগার বীনাম কে নাবীনা ও চাহ্ আস্ত + আগার খামুশ বনাশীনাম গোনাহ্ আস্ত)

"যদি কোথাও অন্ধকে যাইতে দেখা যায় এবং তাহার সম্মুখে কূয়া থাকে, তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা গুরুতর অন্যায়।"

একটি প্রসিদ্ধ গল্প শুনুন। জনৈক ক্বারী সাহেব কণ্ঠস্বরকে খুব ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কেরাআত পড়িতেন। তিনি কেরাআত সহকারে কথাবার্তা বলার জন্য আপন শিষ্যদিগকে আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। এক দিন ক্বারী সাহেব হুক্কা পানে রত আছেন, এমন সময় একটি স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া তাঁহার পাগড়ীতে পড়ে। ইহা দেখিয়া জনৈক শিষ্য অনেকক্ষণ কেরাআত করিয়া ক্বারী সাহেবকে বুঝাইল যে, তাঁহার পাগড়ীতে একটি স্ফুলিঙ্গ পড়িয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্বারী সাহেবের পাগড়ী যথেষ্ট পরিমাণে পুড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি কেরাআত করার উপযুক্ত স্থান ছিল? শিষ্যটি অস্থানে কেরাআত করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছে।

তেমনি অস্থানে নম্রতা দেখাইলেও তাহা নিন্দনীয় হইবে, চরিত্র বলিয়া গণ্য হইবে না। বুঝা গেল যে, বুযুর্গগণ যে কঠোরতা দেখান, উহাকে কঠোরতা বলা অন্যায়। তাঁহারা শুধু শিষ্যবর্গের প্রতিই কঠোরতা করেন এবং ইহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা বৈ কিছুই থাকে না।

**মুসলমানের পদমর্যাদা ঃ** এক্ষণে রাসূলে খোদা (দঃ)-এর দুইটি ঘটনা বর্ণনা করিব। তন্মধ্যে একটি নম্রতা সম্বন্ধে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে স্থানে নম্রতা প্রদর্শন করা দরকার, সে স্থানে হুযূর (দঃ)-এর ন্যায় নম্রতা কেহ প্রদর্শন করিতে পারিবে না। অপরটি কঠোরতা সম্বন্ধে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি কঠোরতার স্থানে কি পরিমাণ কঠোরতা করিয়াছেন?

একবার জনৈক গেঁয়ে ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর উপস্থিতিতেই মসজিদে নববীতে প্রস্রাব করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ছাহাবাগণ লোকটির প্রতি চটিয়া তাহাকে ধমকাইতে চাহিলেন। হুযূর (দঃ)

www.almodina.com

বলিলেনঃ "তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না, সে নির্বিঘ্নে প্রস্রাব সমাপ্ত করুক।" সোবহানাল্লাহ্! কি বিজ্ঞজনোচিত উক্তি। লোকটিকে ধমকাইলে সে হয় প্রস্রাব বন্ধ করিয়া দিত, না হয় প্রস্রাব করিতে করিতে দৌড়াইয়া পালাইত। প্রথমাবস্থায় তাহার ভীষণ কষ্ট হইত। দ্বিতীয়াবস্থায় মসজিদ আরও বেশী অপবিত্র হইত। লোকটি নির্বিঘ্নে প্রস্রাব শেষ করিলে তিনি তথায় এক বাল্তি পানি ঢালিয়া দিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর গেঁয়ে লোকটিকে নিকটে ডাকিয়া অত্যন্ত নম্রস্বরে বলিলেনঃ "ভাই মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। ইহা এবাদত করার স্থান ইহাকে অপবিত্র করা সমীচীন নহে।"

এই হাদীস হইতে ইহাও বুঝা উচিত যে, খোদা ও রাসূলের নিকট মুসলমানের মর্যাদা মসজিদ হইতে অনেক বেশী। রাসূলে খোদা (দঃ) মসজিদ অপেক্ষা গেঁয়ে মুসলমানটির প্রতিই বেশী লক্ষ্য দিয়াছেন। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একবার তিনি পবিত্র কা'বা ঘরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "হে ঘর! তুমি অসাধারণ সম্মানের পাত্র; কিন্তু আল্লাহ্র নিকট মু'মিন ব্যক্তি তোমা অপেক্ষাও বেশী সম্মানিত।" তাই কবি বলিয়াছেনঃ

دل بدست آور که حج اکبر است — از هزاراں کعبه یك دل بهتر است

(দিল বদস্ত আওয়ার কেহ্ হজ্জে আক্বর আস্ত + আয হাযারাঁ কা'বা এক দিল বেহ্তর আস্ত)

"কাহারও অন্তর তুষ্ট করা অতি বড় হজ্জ। হাজার হাজার কা'বা অপেক্ষা একটি অন্তর বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।"

অনেকেই এই কবিতাংশের ভুল অর্থ বুঝিয়া লইয়াছে। তাহারা বন্ধু-বান্ধবের পীড়াপীড়িতে নাচ-গানেও চলিয়া যায়, আর বলে যেঃ

دل بدست آور که حج اکبر است "একজন মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা হজ্জ হইতেও উত্তম।" সুতরাং নাচে গেলে যদি বন্ধুর মন সন্তুষ্ট হয়, তবে ইহাও পুণ্য কাজ হইবে। অন্য এক ব্যক্তি ইহার চমৎকার উত্তর দিয়াছে যে, কবিতায় অন্যের অন্তর বুঝান হয় নাই; বরং নিজ অন্তর সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, আপন অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত কর এবং ইহাকে খোদার আদেশ-নিষেধের অনুগত বানাও। ইহাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম উত্তর বলা চলে, যদিও ইহা কবির আসল উদ্দেশ্যের অনুকূলে নহে। কবি অন্যের অন্তরই বুঝাইয়াছেন। তবে শরীঅতবিরুদ্ধ কাজে অন্যের মনস্তুষ্টি করা কিছুতেই জায়েয নহে। কবি এই কবিতায় উপরোক্ত হাদীসেরই অনুবাদ করিয়াছেন। মু'মিন ব্যক্তি কা'বা হইতে উত্তম হওয়ার অন্যতম কারণ এই যেঃ

دل گزر گاه جلیل اکبر است

"অন্তর মহিমান্বিত খোদার বিচরণ ক্ষেত্র।"

ঈমানদার ব্যক্তি যখন কা'বা হইতে উত্তম, তখন অন্যান্য মসজিদ হইতে সে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। প্রস্রাব আটকাইয়া দিলে ঐ ব্যক্তি দারুণ পীড়া ও কষ্ট অনুভব করিত। এই কারণে হুযূর (দঃ) মসজিদের অপবিত্রতার মোটেই পরওয়া করেন নাই।

আজকাল মু'মিন ব্যক্তিকে সর্বত্র লাঞ্ছিত করা হয়। দুঃখের বিষয়, একদল নব্যশিক্ষিত লোক গরীব মুসলমানদিগকে যেরূপ ঘৃণার চোখে দেখে, বিধর্মীরাও সেরূপ দেখে না। আমাদের সমাজে যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা অন্যকে অসভ্য, অভদ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

www.almodina.com

অন্যকে চতুষ্পদ জন্তু হইতেও অধম মনে করিয়া তাহারা মুসলমান বলিয়া দাবী করে এবং নিজদিগকে জাতির হিতাকাঙক্ষী ভাবিয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে এই কথাই বলিতে হয়ঃ

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"আপনি বলিয়া দিন, তোমাদের ঈমান যাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, তাহা অত্যন্ত মন্দ।"

هرکس از دست غیـر ناله کند ــ سعدی ز دست خویشتن فریاد

(হরকস আয দস্তে গায়র নালা কুনাদ + সা'দী যে দস্তে খেশতান ফরিয়াদ)

"প্রত্যেকেই অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে; কিন্তু সা'দীর অভিযোগ আপন লোকের বিরুদ্ধেই।"

মুসলমানদের পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া থাকা উচিত। কেহ কাহারও গীবত করিলে তাহাকে বাধা দেওয়া কর্তব্য। সে ইহাতে বিরত না হইলে নিজেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়। তদ্রূপ প্রত্যেকেরই উচিত নিজকে অপর সকল হইতে ছোট মনে করা। ইহাতে মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ হ্রাস পাইবে। কেননা, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। ইহা হইতেই গীবতের উৎপত্তি হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য নেক দো'আ করা। মোটকথা, কোন মুসলমান গোনাহে লিপ্ত থাকিলেও তাহার সহিত অসুস্থ ভাইয়ের ন্যায় ব্যবহার করুন। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا

"হে খোদার বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া যাও।"

মোটকথা, একটি তো হইল উক্ত গ্রাম্য লোকটির প্রতি হুযূর (দঃ)-এর ব্যবহার, যাহা আপনারা শ্রবণ করিলেন।

**পরিচিত ও অপরিচিতের সহিত ব্যবহারঃ** দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপঃ একবার হুযূর (দঃ) মসজিদে আগমন করিয়া মসজিদের প্রাচীরে থুথু দেখিতে পাইলেন। ইহাতে ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কাঠির সাহায্যে প্রাচীরগাত্র হইতে থুথু ঘষিয়া ফেলিলেন। জনৈক ছাহাবী সুগন্ধি আনিয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দিলেন। এখন লক্ষ্য করুন, যিনি মসজিদে প্রস্রাবকারীকে কিছুই বলিলেন না, এখানে শুধু মসজিদের প্রাচীরে থুথু ফেলার কারণে তাঁহারই চেহারা ক্রোধে লাল হইয়া গেল। পার্থক্য এই যে, প্রস্রাবকারী ব্যক্তি ছিল গেঁয়ে, আর এই থুথু নিক্ষেপকারী ছিল তাঁহার একান্ত পরিচিত ও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত। সুতরাং বুঝা গেল যে, পরিচিত ও অপরিচিতের সহিত ভিন্নরূপ ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেক কঠোরতাই অভদ্রতার মধ্যে গণ্য হইলে হুযূর (দঃ) কখনও কঠোরতা করিতেন না। কেননা, তাঁহার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "নিঃসন্দেহ, আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

আরও শুনুনঃ একবার জনৈক ছাহাবী হারানোপ্রাপ্তি সম্পর্কে হুযূর (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন, "যদি জঙ্গলে কোন ছাগল পাওয়া যায়, তবে হেফাযতের জন্য উহা আপন বাড়ীতে লইয়া আসা উচিত কিনা?" তিনি বলিলেনঃ "হাঁ, লইয়া আসা উচিত। নতুবা হিংস্র জন্তু উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।" অতঃপর অপর একজন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "উট পাওয়া গেলেও কি এইরূপ

www.almodina.com

করিতে হইবে?” এই প্রশ্ন শুনা মাত্রই ক্রোধে হুযূরের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেনঃ “উটের হেফাযতের প্রয়োজন কি? সে নিজেই হিংস্র জন্তুদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। গাছের পাতা খাইতে খাইতে সে নির্বিঘ্নে মালিকের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে।”

যেহেতু ছাহাবীর এই প্রশ্নের মধ্যে লোভের মনোবৃত্তি পরিস্ফুট ছিল, তাই, হুযূর (দঃ) রাগান্বিত হইলেন। এর পরও কি যে কোন কঠোরতা ও যে কোন রাগকেই অসদাচরণ বলা হইবে? আজকাল আলেমদের প্রতি দোষারোপ করা হয় যে, তাহারা সামান্য ব্যাপারেই রাগান্বিত হইয়া যায়। তাহাদের আচরণ ভাল নহে। উপরোক্ত ঘটনাবলী দ্বারা খোদার ফযলে এই দোষারোপের অসারতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় জানা গেল। কোন কোন ছাত্র উস্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি বড়ই কঠোর প্রকৃতির লোক। হাদীসের উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, অসমীচীন ব্যাপারে কঠোর হওয়াও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। সত্য বলিতে কি, অনেক ছাত্র নানা আবল-তাবল প্রসঙ্গ তুলিয়া উস্তাদকে বিরক্ত করিতে প্রয়াস পায়। ইহা খুবই ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ ও বেআদবী। উস্তাদ ভুল করিলেও তখন চুপ থাকা উচিত। সময়ান্তরে বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাহা উস্তাদকে বলিয়া দেওয়া যায়। নিজে ভুল করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইয়া সংশোধিত হওয়া চাই। আজকাল ছাত্ররা এমনসব কাজ করিয়া বসে, যাহাতে রাগ না আসিয়া পারে না। বলাবাহুল্য, সত্যিকার ছাত্রের সংখ্যাই কমিয়া গিয়াছে। কোন কোন ছাত্র উস্তাদের তক্‌রীর (পাঠদান) মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে না। অথবা উদ্দেশ্য না বুঝিয়া উস্তাদের সহিত তর্কে অবতীর্ণ হইয়া যায়। এমতাবস্থায় উস্তাদ রাগান্বিত না হইয়া কি করিবেন?

লক্ষ্ণৌয়ের একটি ঘটনা বলিতেছি, সেখানকার এক মাদ্রাসায় জনৈক উস্তাদ ‘ছদরা’ কিতাব পড়াইতেন। কিতাবের এক জায়গায় ছাপার ভুল সন্দেহে সকল ছাত্রের কিতাব দেখা হইল। জনৈক ছাত্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহার কিতাবে কি লিখিত আছে? তখন সে কিতাবে খোঁজাখুজি করিতে লাগিল। উস্তাদ রাগান্বিত হইলে সে কাচুমাচু করিয়া বলিলঃ “স্থানটি এইমাত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি এখনই বলিতেছি।” দেরী হওয়ায় অতঃপর উস্তাদ কিতাবটি তাহার নিকট হইতে লইয়া নিজেই দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু হায়! কিতাবটি ছদরা ছিল না; বরং উহা ছিল “শামছে বাযেগা”। উস্তাদ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “তুমি কি রোজই এই কিতাব পড়?” ছাত্র বলিলঃ “জী হাঁ।” দেখুন, ছাত্রপ্রবর জানিতেনই না যে, তিনি প্রত্যহ কি কিতাবের স্থলে কি কিতাব লইয়া পড়িতে আসেন? জিজ্ঞাসা করি, এই উদাসীনতার নযীর আছে কি?

তদ্রূপ জনৈক ছাত্র বলিতঃ “যাহারা লেখাপড়া শেষ করিয়া ফেলে, তাহারা নিতান্তই বোকা। কেননা, এর পর মাদ্রাসার তরফ হইতে তাহাদের খোরাক বন্ধ হইয়া যায়। আমাকে দেখ, আমি কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল ‘নূরুল আনোয়ারই’ পড়িতেছি, ভবিষ্যতেও ইহাই পড়িবার ইচ্ছা রাখি।”

দেওবন্দ মাদ্রাসায় জনৈক বৃদ্ধ ছাত্র ছিল। লেখাপড়ার মধ্যেই তাহার সারাটি জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। দেওবন্দে আসার পর সে সব ক্লাসেই শরীক হইত। একবার এই ছাত্রটিই উস্তাদের তকরীরে প্রশ্ন করিয়া বসিলঃ “ইহাতে একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।” উস্তাদ বলিলেনঃ “প্রমাণ”? ইহা শুনিয়া ছাত্রপ্রবর বলিলঃ “সোবহানাল্লাহ্! দাবীও আমি করিব, প্রমাণও আমি দিব?

www.almodina.com

আমি দাবী উত্থাপন করিলাম। এখন প্রমাণ আপনি দিন।” জিজ্ঞাসা করি, এমন উদ্ভট প্রশ্নেরও কোন জওয়াব আছে কি? এমতাবস্থায় উস্তাদ যদি কঠোরতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে দোষ কি?

দেখুন, রাসূলে খোদা (দঃ)-এর ন্যায় সদাচারী আর কে? তিনিই যখন কোন কোন ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন বুযুর্গদিগকে তজ্জন্য অসদাচারী মনে করা খুবই অন্যায়। কোন কোন বুযুর্গ সামান্য বিষয় হইতেই বিরাট তত্ত্বপূর্ণ কথা বাহির করিয়া লইতেন ও তদনুযায়ী আমল করিতেন।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা শুনুনঃ তাঁহার নিকট কেহ মুরীদ হইতে আসিলে তিনি তাহার খাওয়ার জন্য পরিমাণের চেয়ে বেশী খাবার পাঠাইতেন। আহারের পর অতিরিক্ত খাবার ফেরত আসিলে তিনি রুটি এবং তরকারির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিতেন। যদি দেখা যাইত যে, লোকটি যে পরিমাণ তরকারি দ্বারা যে পরিমাণ রুটি খাওয়া স্বাভাবিক, সেই পরিমাণই খাইয়াছে, তবে তাহাকে মুরীদ করিয়া লইতেন। অন্যথায় অস্বীকৃতি জানাইয়া দিতেন। বাহ্যতঃ মনে হয় যে, তিনি সামান্য ব্যাপারের জন্য এতটুকু কঠোরতা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইহা দ্বারা লোকটির শৃঙ্খলাবোধ জানিতে প্রয়াস পাইতেন। উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে তিনি কখনও মুরীদ করিতেন না। কারণ, শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। বাস্তবিকই যাহার মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব তাহার দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হয় না, শুরু করিয়া কিছু দিন পরে আবার ছাড়িয়া দেয়।

**কাফেরদের সহিত সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তঃ** কোন কোন ব্যাপার বাহ্যতঃ সামান্য মনে হইলেও উহার অন্তর্নিহিত রহস্য খুবই বৃহৎ হইয়া থাকে। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে সক্ষম হয় না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে তাহারা মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়া পড়ে। তাহারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামান্য মনে করিয়া নির্ভয়ে উহা লঙ্ঘন করিতে থাকে আর মুখে বলে, খোদার শান বহু ঊর্ধ্বে। তিনি সামান্য সামান্য বিষয়ে শাস্তি প্রদান করেন না। জানা দরকার যে, ইহা মারাত্মক ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বিষয়কে আপনি সামান্য মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা খুবই বিরাট হইতে পারে।

বন্ধুগণ! প্রথমতঃ, বান্দার উপর খোদার হক অপরিসীম। এই হিসাবে তাহার যে কোন বিরুদ্ধাচরণ নগণ্য নহে। ইহাতে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, তবে কি ছগীরা গোনাহের জন্যও শাস্তি হইবে? তাহা হইলে ছগীরা ও কবীরা গোনাহে পার্থক্য কোথায়? উত্তর এই যে, আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জমাআত এই বিষয়টি যথার্থ বুঝিয়াছেন। তাহাদের মতে ছগীরা গোনাহের জন্যও শাস্তি হইতে পারে। অপরাপর বড় গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছগীরাকে ছগীরা গোনাহ্ বলা হয়। নতুবা বাস্তবপক্ষে কোন গোনাহ্ই ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং ছগীরা ও কবীরা গোনাহের পারস্পরিক পার্থক্য একটি লক্ষণীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে খোদার মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রত্যেক গোনাহ্ই কবীরা। দ্বিতীয়তঃ, ইহা উপেক্ষা করিলেও কোন কোন গোনাহ্ বাহ্যতঃ হাল্কা মনে হয়, কিন্তু উহার স্বরূপ অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া থাকে।

জনৈক বুযুর্গের একটি ঘটনা শুনুনঃ একদা তিনি হিন্দুদের হোলী উৎসবের দিন পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হিন্দুরা পরস্পরের রং মাখামাখিতে লিপ্ত ছিল। বাজারের সমস্ত জিনিসপত্র রঙ্গীন দেখা যাইতেছিল। তিনি একটি গাধার শরীরে মোটেই রং না দেখিয়া সহাস্যে বলিলেনঃ “তোকে কেউ রং দিল না? আয়, আমিই তোকে রং দিয়া দেই।” এই বলিয়া তিনি গাধার গায়ে পানের পিক নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার এন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি কাশ্‌ফ (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা

জানিলেন যে, উক্ত বুযুর্গ ব্যক্তিকে হোলী উৎসব পালনকারী হিন্দুদের সহিত অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কেননা, তিনি গাধার গায়ে পানের পিক নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের কাজে শরীক হইয়া গিয়াছিলেন।

ভাইগণ, পানের পিক নিক্ষেপ করা সামান্য ব্যাপার নহে। কেননা, ইহাতে কাফেরদের সহিত সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। ইহা অত্যন্ত মারাত্মক গোনাহ্। সুতরাং গোনাহ্কে ছোট মনে করার পর উহার শাস্তির কথা শুনিলে অনেকে খোদার প্রতি কুধারণা পোষণ করিতে থাকে। তাহারা বলে, খোদার বড় ক্রোধ। তিনি সামান্য ব্যাপারেই ক্রোধান্বিত হইয়া যান। (খোদা মাফ করুন) সদাচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও মানুষ এই ধরনের ভ্রমে লিপ্ত আছে। ইহাতে বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকগণও জড়িত আছেন।

**এখলাছের গুরুত্বঃ** অতএব, বুঝা উচিত এখলাছের অর্থ মহব্বত বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, ইহা শুদ্ধ নহে। এই কারণে আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে, "এখলাছ" শব্দটি সকলেই বহু বার শুনিয়াছে; কিন্তু নিজের মধ্যে ইহা সৃষ্টি করার প্রতি অনেকেই চিন্তা করে না। কেহ কেহ ইহার অর্থই ভুল বুঝিয়াছে। যাহারা সঠিক অর্থ বুঝিয়াছে, তাহারাও ইহা অর্জন করা জরুরী মনে করে নাই। আমরা কখনও নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখি না যে, আমাদের মধ্যে কি বিষয়ের ত্রুটি আছে। ইহাই আমার অভিযোগ। এই কারণেই অদ্য আমি এই আয়াতটি অবলম্বন করিয়াই কিছু বলিতে চাই, যাহাতে সকলেই শুনিতে ও বুঝিতে পারে যে, এখলাছের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং ইহা না হইলে ধর্মকর্মে কি কি ত্রুটি হইতে পারে। প্রথমে কোরআন ও তৎপর বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা আমি আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব।

এখলাছের গুরুত্ব কোরআন দ্বারা এইভাবে বুঝা যায় যে, এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম قُلْ বলিয়াছেন। ইহাতে হুযূরকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, 'আপনি এ কথা বলিয়া দিন'। যদি قُلْ না-ও বলিতেন, তবুও নিশ্চিতভাবে হুযূর (দঃ) তাহা উম্মতকে বলিতেন। কেননা, তিনি যে ক্ষেত্রে অন্যান্য আদেশ-নিষেধ উম্মতকে জানাইয়াছেন, সে ক্ষেত্রে ইহাও জানাইতেন। সুতরাং قُلْ শব্দ ব্যবহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, اِنِّىْ اُمِرْتُ "নিশ্চয়ই আমি আদিষ্ট হইয়াছি" বলা হইয়াছে। اِنِّىْ শব্দে দ্বিতীয় দফা তাকীদ করা হইয়াছে। এর পর اُمِرْتُ দ্বারা তৃতীয় দফা তাকীদ করা হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্র নিকট হযরত (দঃ) হইতে অধিক প্রিয় আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহার আদেশ-নিষেধ শিথিলযোগ্য হইলে তিনিই ইহার বেশী হকদার হইতেন। ফলে কতক আহ্কাম অন্যের প্রতি ওয়াজিব হইলেও হুযূর (দঃ)-এর প্রতি তাহা ওয়াজিব হইত না। অপর একটি আয়াতে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করা হইয়াছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ "যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত ও অনাগত গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে انى امرت "নিশ্চয়ই আমি আদিষ্ট হইয়াছি" বলায় এইরূপ বুঝার কোন কারণ নাই যে, এই বিষয়ে একমাত্র তাঁহাকেই আদেশ করা হইয়াছে, অন্যের উপর ইহা ওয়াজিব নহে। যদি নির্দিষ্টভাবে হুযূর (দঃ)-কে আদেশ দেওয়ার কোন প্রমাণ থাকে, তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এখানে এরূপ বৈশিষ্ট্যের কোন দলীল নাই। অতএব, হুযূর (দঃ)-এর ন্যায় সর্বগুণে গুণান্বিত মহাপুরুষকে যখন সম্বোধন করা হইয়াছে যে, "বলিয়া দিন, আমাকে ইহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে" তখন ইহা অন্যের উপরও যে ফরয, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না।

www.almodina.com

উপরোক্ত আয়াতে আরও একটি তাকীদ আছে। তাহা এই যেঃ

إِنِّىٓ أُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ

"আমাকে এখলাছবিশিষ্ট এবাদত করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে" বলা হইয়াছে। অতএব, এবাদত নিজেই একটি অভীষ্ট কার্য। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, এখলাছ না হওয়া পর্যন্ত এবাদত গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, اَنْ اَعْبُدَ اللهَ বলার পর مُخْلِصًا বলায় বুঝা যায় যে, যেকোন এবাদতের আদেশ দেওয়া হয় নাই; বরং এখলাছসহ এবাদতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই اُمِرْتُ اَنْ اَخْلُصَ "আমাকে এখলাছের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে" বলা হয় নাই। এরূপ বলিলে এখলাছের গুরুত্ব বুঝা যাইত না। কিন্তু এবাদতের সহিত এখলাছের উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, এখলাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমন কি ইহা না হইলে এবাদতের ন্যায় অভীষ্ট কার্যও পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়।

এই আয়াত হইতে যেরূপ এখলাছের গুরুত্ব বুঝা যায় যে, ইহা ব্যতীত এবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ ইহাও বুঝা যায় যে, এখলাছের জন্য এবাদতও অত্যন্ত জরুরী। কেননা, আয়াতে اُمِرْتُ اَنْ اَخْلُصَ "আমাকে এখলাছের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে" বলিয়া শুধু এখলাছের আদেশ দেওয়া হয় নাই; বরং এবাদত ও এখলাছ উভয়টি সম্বন্ধেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এবাদতকে জরুরী মনে করে না, এই আয়াত দ্বারা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়া যায়। তবুও বলিতে হইবে যে, এখানে এখলাছের প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এমন কি "এবাদত" ইহা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না।

আয়াতে আরও একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এই আছে যে, اَنْ اَعْبُدَ اللهَ বলার পর مُخْلِصًا لَّهُ الْعِبَادَةَ বলাই বাহ্যতঃ অধিক সমীচীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ বলিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এবাদত তখনই দ্বীন বা ধর্মের কাজ হইবে, যখন উহাতে এখলাছ থাকিবে। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, এখলাছ ব্যতীত বাহ্যিক এবাদত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। প্রাণ অর্থাৎ, এখলাছ থাকিলেই এবাদত ধর্মের কাজ এবং আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় হইবে। আফসোস, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আমাদের গাফলতির অন্ত নাই। এ পর্যন্ত আয়াতের আলোকে এখলাছের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল।

**এখলাছের আবশ্যকতা ঃ** এখন যুক্তির ভিত্তিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করুন। শাব্দিক অর্থ হইতেই এখলাছের আবশ্যকতা বুঝা যায়। এখলাছ শব্দের অর্থ খালেছ করা। যাহাতে কোন কিছুর মিশ্রণ নাই; উহাকেই খালেছ বলে। যেমন, খালেছ ঘি বলিতে ঐ ঘি বুঝায়, যাহাতে তৈলের ভেজাল নাই। আপনার সহিত কেহ মহব্বত প্রকাশ করিলে আপনি কি তাহার নিয়ত পরখ করেন না ? কেহ আপনাকে উপঢৌকন দিয়া যদি বলে, "আমার জন্য সুফারিশ করুন," তখন আপনি ইহাই বুঝিবেন যে, উপঢৌকনটি উদ্দেশ্যমূলক। তদ্রূপ কেহ আপনাকে নিমন্ত্রণ করার পর যদি বলে, "আমি ভারাক্রান্ত" তখন কি এই নিমন্ত্রণ আপনার বিরক্তির উদ্রেক করিবে না ?

মোটকথা, সকাল হইতে বৈকাল পর্যন্ত পারস্পরিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, একমাত্র খালেছ মহব্বতকেই মর্যাদার চোখে দেখা হয়। আপনিও খালেছ ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বকেই পছন্দ করেন। এমতাবস্থায় পবিত্র খোদা ভেজালপূর্ণ এবাদতকে কিরূপে মর্যাদা দিবেন ? পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার প্রিয়জনকে উপঢৌকন দেওয়ার বেলায় খাঁটি ও নির্ভেজাল বস্তু

দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়; কিন্তু খোদার দরবারে যে এবাদত পেশ করা হয়, উহাকে খালেছ করার জন্য চেষ্টা করা হয় না। এ পর্যন্ত আয়াত ও যুক্তি উভয় প্রকার এখলাছের আবশ্যকতা সপ্রমাণ হইয়া গেল।

এখন দেখিতে হইবে যে, আমাদের আমলসমূহে এখলাছ আছে কি না। কারণ, এখলাছ একটি জরুরী বিষয় হওয়ার ফলে আমাদের কর্মজীবনে উহার 'বাস্তব' রূপায়ণ আছে কিনা তাহা যাচাই করাও একটি জরুরী বিষয় হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে তাকীদসহ নির্দেশ আসার পর ইহাকে ফরয মনে না করার কোন যৌক্তিকতা নাই।

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة ـ وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

"জানা না থাকা একটি বিপদ; কিন্তু জানা থাকার পর আমল না করা দ্বিগুণ ও মারাত্মক বিপদ।" দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত ইহা পূরণ হইতে পারে না। কারণ, বান্দার ইচ্ছাধীন সমস্ত আমলই তাহার সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা ও সংকল্প না করিলে উহার বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভব। এখলাছও এই ধরনের একটি আমল। সুতরাং আপনি যদি ইচ্ছাই না করেন, তবে এখলাছ কিরূপে হাছিল হইবে?

কিছু সংখ্যক লোক যাহারা অন্তরের সংশোধন কামনা করে, তাঁহারা এই জাতীয় ভ্রান্তিতে পতিত আছে। তাঁহারা শায়খের খেদমতে আবেদন করে, হুযূর, এমন দো'আ করুন, যাহাতে আমার দোষত্রুটি সংশোধিত হইয়া যায়, কিংবা এমন কোন তাবীয দিন, যাহার ফলে অন্তরের কুমন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া যায়। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, শুধু আবেদনই কর? নিজকে সংশোধিত করার জন্য কখনও চিন্তা বা ইচ্ছাও করিয়াছ? আশ্চর্যের বিষয়, তাহাদের কাজকর্ম দেখিলে মনেই হয় না যে, তাহারা সংশোধন কামনা করে। যদি বাস্তবিকই সংশোধনেরই ইচ্ছা হয়, তবে প্রথমতঃ তজ্জন্য কঠোর সংকল্প গ্রহণ কর, তবেই আত্মশুদ্ধি সম্ভব হইবে।

صوفی نه شود صافی تا در نه کشد جامی ـ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

(ছূফী না-শাওয়াদ ছাফী তা দর না-কাশাদ জামী
বেসিয়ার সফর বা-য়াদ তা পোখ্তা শাওয়াদ খামী)

"এশ্কের পিয়ালা পান করিয়া বিস্তর মুজাহাদা বা সাধনা না করা পর্যন্ত আত্মশুদ্ধি অর্জিত হইবে না।"

আমার উদ্দেশ্য এই নহে যে, কম আহার কর ও কম নিদ্রা যাও। আপনি হয়তো শুনিয়া থাকিবেন যে, এই পথে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়; কিন্তু আমি আপনাকে অধিক পরিশ্রম করিতে বলি না। আপনি স্বচ্ছন্দে পানাহার করুন। কখনও তাস্‌বীহ্ পাঠকালে নিদ্রা আসিয়া গেলে নির্বিঘ্নে ঘুমাইয়া পড়ুন। কখনও তজ্জন্য পেরেশানও হইবেন না। তবে কথা হইল এই যে, আত্মশুদ্ধির চিন্তায় সদাসর্বদা লাগিয়া থাকুন। মাওলানা রূমী বলেনঃ

اندریں ره می تراش ومی خراش ـ تا دمے آخر دمے فارغ مباش

(আন্দরী রাহ্ মী তারাশ ও মী খারাশ + তা দমে আখের দমে ফারেগ মবাশ)

"সংশোধনের চিন্তায়ই লাগিয়া থাকুন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একদণ্ডও ইহা হইতে নিশ্চিন্ত হইবেন না।"

**বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়াঃ** আপনাকে পরিশ্রম করাইতে চাই না। আমার এই কথা বলার কারণ এই যে, আজকালকার মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশী পরিশ্রমের উপযুক্ত নহে। নানাবিধ চিন্তার

www.almodina.com

চাপ মানুষকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং যাহার মস্তিষ্ক যত অধিক চিন্তায় মগ্ন হইবে, সে তত দুর্বল হইয়া পড়িবে। পূর্বেকার লোকদের মস্তিষ্ক বাজে চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিত। ফলে তাহাদের মস্তিষ্ক শক্তিশালী ছিল। আজকাল শৈশবের সিঁড়ি পার হইতেই মানুষ চিন্তার বেড়াজালে আটকাইয়া যায়। ইহার এক কারণ এই যে, প্রাচীনকাল অপেক্ষা আজকাল চিন্তাই বেশী। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মানুষ নিজেই স্বেচ্ছায় চিন্তার বোঝা মাথায় চাপিয়া লয়। বিশেষতঃ কিছু সংখ্যক লোক চালচলনে ফ্যাশনের চিন্তায়ই মশগুল থাকে। এমন কি তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থা এরূপ দেখা যায় যে, প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পোশাক-পরিচ্ছদ রাখে। খাওয়ার পৃথক, আরোহণের পৃথক, নিদ্রার পৃথক, দরবারে যাওয়ার পৃথক, পায়খানায় যাওয়ার জন্য পৃথক। পোশাক তো নয়—যেন সাক্ষাৎ বিপদ আর কি?

জনৈক ব্যক্তিকে কেহ ডাকিলে সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া খুব সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইত। এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প স্মরণ হইয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি কাচারীতে চাকুরী করিত। সে প্রাচীনপন্থী সাদাসিধা মুসলমান ছিল। ব্যস্ততার কারণে তাড়াতাড়ি পাগড়ী বাঁধিয়া অফিসে যাওয়াই ছিল তাহার নিত্যকার অভ্যাস। ফলে পাগড়ী বিশেষ সুন্দররূপে বাঁধা হইত না। কাচারীর অন্যান্য কর্মচারীরা সম্মুখে আয়না রাখিয়া দীর্ঘ সময় লাগাইয়া পাগড়ী বাঁধিত। ফলে তাহাদের পাগড়ী চমৎকাররূপে বাঁধা হইত। একদিন কাচারীর বড় সাহেব ঐ ব্যক্তিকে বলিলেনঃ "কেরানী সাহেব, আপনি কি পাগড়ী বাঁধিতে জানেন না? দেখুন তো, অন্যান্যরা কেমন চমৎকার পাগড়ী বাঁধে।" কেরানী সাহেব বলিলেনঃ "জনাব, তাহাদের পাগড়ী তাহাদের বিবিগণ বাঁধিয়া দেয়, আর আমার পাগড়ী আমি নিজেই বাঁধিয়া লই। বিশ্বাস না হয়, এখনই সকলকে পাগড়ী খুলিয়া পুনর্বার বাঁধিতে বলুন। পূর্বের ন্যায় সুন্দররূপে বাঁধিতে না পারিলে মনে করিবেন যে, তাহারা স্বহস্তে পাগড়ী বাঁধে না।" বড় সাহেব সকলকে পাগড়ী খুলিয়া পুনরায় বাঁধিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে কেরানী সাহেব পূর্বের ন্যায়ই বাঁধিলেন কিন্তু অন্যান্যরা কেহই পূর্বের ন্যায় সুন্দর করিয়া বাঁধিতে পারিল না। কারণ, তখন সম্মুখে আয়না ছিল না। বড় সাহেব বলিলেনঃ "কেরানী সাহেব, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। বাস্তবিকই তাহারা প্রত্যহ বিবিদের দ্বারা পাগড়ী বাঁধাইয়া অফিসে আসে।" ইহাতে অন্যান্য কর্মচারীরা যারপরনাই লজ্জিত হইল।

মোটকথা, কিছু সংখ্যক লোক সাজসজ্জার মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। ফলে অসংখ্য চিন্তা তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে। একে তো সাজসজ্জার ব্যয় বহনের মত টাকা-পয়সার চিন্তা, তাছাড়া সাজসজ্জাও কম ঝামেলার বিষয় নহে। ফলে তাহাদের শুধু চিন্তাই চিন্তা। একদা আমি এক স্থানে সফরে মেহ্‌মান ছিলাম। তথায় জনৈক পদস্থ অফিসারও মেহ্‌মান হিসাবে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন পোশাক নির্দিষ্ট ছিল। ফলে তিনি ভীষণ অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। "এখন কি পরি"—সর্বদাই এই চিন্তা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা স্বাধীনতার দাবী করেন; কিন্তু তাঁহারা ইহা নামে মাত্রই ভোগ করিতে পারেন। প্রকৃত স্বাধীনতা তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে না। চিন্তার বেড়াজালে তাঁহারা সর্বদাই আবদ্ধ থাকেন। সত্য বলিতে কি, খোদা-প্রেমিকগণই সত্যিকার স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন।

لنگکے زیر و لنگکے بالا — نے غم دزد نے غم کالا

(লঙ্গকে যীর ও লঙ্গকে বালা + নায় গমে দোয্‌দ নায় গমে কালা)

"একটি সাধারণ লুঙ্গি ও একটি সাধারণ চাদর। ফলে না চোরের ভয় আছে, না ধনসম্পদের চিন্তা।"

সারকথা, বাড়াবাড়ি সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই মস্তিষ্ক পেরেশান ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; বরং এই শ্রেণীর লোকদের কারণে খোদাপ্রেমিকগণকেও কিছুটা চিন্তা স্পর্শ করিয়াছে। অনেক সময় তাহাদের আদর-আপ্যায়নের জন্য তাঁহাদিগকেও অল্পবিস্তর চিন্তা করিতে হয়। উদাহরণতঃ তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কোন বুযুর্গের বাড়ীতে মেহ্মান হইলে তাহার জন্য ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইতে হয়। কেননা, এই শ্রেণীর লোক পায়ে হাঁটায় অভ্যস্ত নহে। গাড়ী না পাঠাইলে কয়েক দিন পর্যন্তই তাহাদের ক্লান্তি দূর হয় না। তাহাদের এই কষ্ট দেখিয়া বুযুর্গগণও ব্যথা অনুভব করেন।

আল্লাহ্ওয়ালাগণ নিজের ব্যাপারে কিরূপ ব্যবহার করেন, উহার একটি নযীর শুনুনঃ নানূতা শহরে জনৈক চিকিৎসক ছিলেন। একদিন তাঁহার বাড়ীতে জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি মেহমান হইলেন। হাকীম সাহেব মেহমানকে বলিলেনঃ "অদ্য আমার বাড়ীতে পানাহারের কিছুই নাই। সকলেই উপবাসে আছে। অনুমতি হইলে আপনার খেদমতের জন্য অন্য কাহাকেও বলিয়া দেই।" বুযুর্গগণ পরস্পরে সম্পূর্ণ অকপট। তাই মেহমান বুযুর্গ বলিলেনঃ "ভালকথা, যখন আপনার বাড়ীতে উপবাস, তখন আমিও আপনার মতই উপবাস করিব। মাঝে মাঝে উপবাস করিতে হয়।" সে মতে তাঁহারা উভয়েই অনাহারে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় জনৈক ব্যক্তি হাকীম সাহেবের খেদমতে কিছু টাকা নযর পেশ করিলেন। অতঃপর উহা দ্বারা খাদ্য আনিয়া উভয়েই আহার করিলেন।

সত্য বলিতে কি, আল্লাহ্ওয়ালাগণ বেজায় আরামে আছেন। তাঁহারা দুর্বলতার এই কারণ (—চিন্তা) হইতে একেবারে মুক্ত। তবে আবহাওয়া ও অন্যান্য কারণে তাঁহারাও দুর্বল। ফলে তাঁহারাও অধিক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না।

**মুজাহাদার নিয়মঃ** বেশী পরিশ্রমের উপদেশ না দেওয়ার এক কারণ উপরে বর্ণিত হইল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বেশী পরিশ্রম করিলে মনও বেরস হইয়া যায়। ফলে মানুষ পেরেশান হইয়া কাজ ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে আরামে থাকিলে মনে স্ফূর্তি থাকে। ইহাতে প্রত্যেক কাজ সহজে সম্পন্ন হয়। এই কারণে আমাদের শায়খ বলিতেনঃ "নফ্সকে খুব প্রফুল্ল রাখ। তৎসঙ্গে তাহা হইতে কাজও খুব লও। যাঁতা পিষাও। কাজ না করিলে কম খাদ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে শাস্তি দিও না; বরং তখন বেশী পরিমাণ নফল দ্বারা উহার ত্রুটি পূর্ণ কর। নামায সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ "ইহা একটি বড় বোঝা।" ইহাতে নফ্স ঘাবড়াইয়া যায়। কাজেই এইরূপ করিলে নফ্স দৈনন্দিন কাজে অলসতা করিবে না।

বহু সংখ্যক লোক আমাকে বলেঃ "এমন উপায় বলিয়া দিন, যাহাতে কম খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইতে পারি।" আমি উত্তরে বলিঃ "যদি কম খাদ্য গ্রহণ করার ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়েন, তবে বর্তমানের ন্যায়ও কাজ করিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহাতে লাভ কি? মুজাহাদা করার আরও বহু নিয়ম-পদ্ধতি আছে।" হযরত শিব্লী (রহঃ)-এর অভ্যাস ছিল কোন দিন তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য নিদ্রা ভঙ্গ না হইলে তিনি সজোরে আপন শরীরে চাবুক মারিতে মারিতে বলিতেনঃ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا "যদি আবার এরূপ কর, তবে আমিও এরূপ করিব।" সুতরাং কম খাদ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? অন্য উপায়েও তো মুজাহাদা করা যায়।

সারকথা এই যে, এই শ্রেণীর পরিশ্রম আমার লক্ষ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য হইল, আত্মশুদ্ধির চিন্তায় মশ্গুল হইয়া যান। খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করার মোটেই প্রয়োজন নাই। ধর্মকর্ম তেমন

www.almodina.com

কঠিন নহে। তবে আপনি যতটুকু কঠিন অনুভব করিতেছেন ইহার একমাত্র কারণ হইল, আপনি কখনও ইচ্ছাই করেন নাই। ইচ্ছা না করিলে অতি সহজ কাজও কঠিন হইয়া যায়।

একটি গল্প মনে পড়িল। শাহী আমলে দুই অলস ব্যক্তি ছিল। একদা তাহাদের একজন শায়িত ছিল ও অপরজন নিকটেই উপবিষ্ট ছিল। রাস্তায় জনৈক অশ্বারোহী ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া শায়িত ব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিলঃ "অশ্বারোহী সাহেব, আমার একটি কথা শুনিয়া যান।" অশ্বারোহী তাহার কথা শুনিবার জন্য কাছে আসিলে অলস বলিলঃ "আমার বুকের উপর যে কুলটি পড়িয়া রহিয়াছে, দয়া করিয়া তাহা আমার মুখে তুলিয়া দিন।" এই কথা শুনিয়া অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহাকে এক ঘা চাবুক মারিয়া বলিলঃ "গাধা কোথাকার! অনর্থকই আমাকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিস্। নিজে মুখে তুলিয়া খাইতে পারিলে না, অথবা কাছে উপবিষ্ট লোকটিকে বলিতে পারিলে না?" ইহা শুনিয়া নিকটে উপবিষ্ট অলস ব্যক্তি বলিতে লাগিলঃ "সাহেব, আমি কখনও তাহার কোন কাজ করিয়া দিব না। অদ্য সকালে একটি কুকুর আমার মুখে পেশাব করিতেছিল। সে নিকটেই বসা ছিল। তা সত্ত্বেও কুকুরটিকে তাড়াইল না।" অশ্বারোহী ব্যক্তি তাহার পিঠেও এক ঘা মারিয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ইচ্ছা এমন একটি জিনিস, যাহা না হইলে সহজতর কাজও কঠিনতর মনে হইতে থাকে। এখনও আমরা কিছুই হারাই নাই। তবে শুধু একটি জিনিস হারাইয়াছি। তাহা এই যে, আমরা আপন ইচ্ছা সম্পদকে কোন কাজে লাগাইতেছি না। ফলে সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অবস্থা এইরূপঃ

یك سبد پر نان ترا بر فوق سر — تو همی جوئی لب نان در بدر

(এক সুবুদ পুর নান তুরা বর ফওকে সর + তু হামী জূয়ী লবে নান দর বদর)

"তোমার মাথায় ঝুড়ি ভর্তি রুটি আছে, তবুও তুমি দ্বারে দ্বারে রুটি ভিক্ষা করিয়া বেড়াও।" বন্ধুগণ! আপনাদের নিকট মহা মূল্যবান সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আপনারা ভিখারীর ন্যায় যাজ্ঞা করেনঃ "কিছু বলিয়া দিন।" প্রকৃতপক্ষে আপনারা চান না। চাওয়া ও কাজ করা ব্যতিরেকে কিছুই পাওয়া যাইবে না। কোন কোন ওলীআল্লাহ্ এক দিনেই সবকিছুই পাইয়াছেন বলিয়া যে সব গল্প প্রচলিত আছে, উহাদের স্বরূপ শুনিয়া লউনঃ

হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী সম্বন্ধে এই ধরনের গল্প প্রচলিত আছে। তিনি শাহ্ ভীককে এক দিনেই সবকিছু দান করিয়াছিলেন। ইহা একটি ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। আসলে এইরূপ দেওয়ার যে পূর্ণ কারণ ছিল, উহার শেষ অংশ এক দিনে সংঘটিত হইয়াছিল। সমস্ত কারণই এক দিনে ঘটে নাই। এক দিনে কামেল করিয়া দেওয়াটাই মানুষ দেখিয়াছে; কিন্তু এই এক দিনের পূর্বে তিনি যে অজস্র কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, উহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। শাহ্ ভীক (রঃ) সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত শায়খের খেদমতে থাকিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার একটি ঘটনা বলিতেছিঃ একবার শায়খ তাঁহার প্রতি ভীষণ চটিয়া যান এবং তাঁহাকে কখনও সম্মুখে না আসিতে আদেশ দেন। শাহ্ ভীক শায়খের আদেশ শিরোধার্য করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় আশ্বেঠা বস্তির চতুর্দিকে ঘুরাফিরা করিতেন; কিন্তু শায়খের সম্মুখে আসিতেন না। তখন তাঁহার অবস্থা ছিলঃ

أُرِيْدُ وِصَالَهٗ وَيُرِيْدُ هَجْرِىْ — فَاَتْرُكُ مَاأُرِيْدُ لِمَا يُرِيْدُ

www.almodina.com

"আমি তাঁহার মিলন চাই, কিন্তু তিনি আমার সহিত বিচ্ছেদ কামনা করেন। সুতরাং আমি আপন ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছায় উৎসর্গ করিতেছি।" সত্যিকার এশ্ক ইহাকেই বলে।

শাহ্ ভীক দীর্ঘকাল পর্যন্ত শায়খের সম্মুখে আসিলেন না। বর্ষাকাল আসিল। প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের দরুন শায়খের বাসগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। এখন ঘর নির্মাণের জন্য মজুর কোথা হইতে আসিবে? দারিদ্র্যের কারণে শায়খ প্রায়ই উপবাসে দিন কাটাইতেন। অথচ শাহ্ ভীক্ তাঁহার একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। সাহারানপুরের কেহ শায়খকে দাওয়াত করিলে তিনি পায়ে হাঁটিয়া শায়খের পরিবারবর্গের জন্য আম্বেঠা বস্তিতে খানা লইয়া যাইতেন। তাহাজ্জুদের সময় আবার ফিরিয়া আসিয়া শায়খকে ওযূ করাইতেন। ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এক দিন বিবি সাহেবা অভিযোগের স্বরে বলিলেনঃ "এখানে যত খাদেম আছে, সকলেই স্বার্থপর। এক বেচারা গোঁয়ারের মত ছিল, সে সমস্ত কাজকর্ম করিয়া দিত। আপনি তাহাকেই বহিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।" শায়খ বলিলেনঃ "তাহাকে আমি বহিষ্কার করিয়াছি, তুমি কর নাই। কাজেই তুমি তাহাকে ডাকিয়া লও। আমি নিষেধ করি না।" আসল কথা এই যে, শায়খ শাহ্ ভীককে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন না। বিবি সাহেবা তৎক্ষণাৎ শাহ্ ভীককে বলিয়া পাঠাইলেনঃ "ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। উহা পুনর্নিমাণের জন্য তোমাকে ডাকিতে শায়খ আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং সত্বর চলিয়া আস। শাহ্ ভীক সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। কিন্তু ভয়ে শায়খের সম্মুখে পড়িলেন না।

এক দিন ঘরের ছাদের মাটি কাটিতেছিলেন, এমন সময় শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ) বাড়ীতে খানা খাইতে আসিলেন। আহারে রত অবস্থায় হাতে একটি লোকমা লইয়া শাহ্ ভীককে দেখাইয়া বলিলেনঃ "আস ভীক, লও।" শাহ্ ভীক্ পাগলপারা হইয়া ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তড়িত গতিতে শায়খের সম্মুখে হাযির হইলেন। শায়খ তাঁহার মুখে লোকমা দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং খেলাফত দান করিলেন।

এই গল্পটি শুনিয়া এখন সকলেই মনে করে যে, এক দৃষ্টিতেই কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। এক দিনেই শাহ্ ভীককে কামেল বানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দেখা উচিত যে, এই একটি দৃষ্টি লাভ হইতে কত দিন সময় লাগিয়াছে? দিয়াশলাই-এর একটি কাঠি দ্বারাই কাঠ জ্বলিয়া যায়; কিন্তু কখন? পূর্ব হইতেই শুষ্ক হইলে। কাঠ শুকাইতেও যথেষ্ট দিন লাগে। যদি কোন মোটা ও তাজা বৃক্ষ এইরূপ মনে করে যে, তাহাকে আগুন স্পর্শ করে না কেন? দিয়াশলাই তাহাকে জ্বালায় না কেন? তবে বৃক্ষের এই ধারণাকে কেহ ঠিক বলিবে কি? কখনই নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বলা হইবে যে, কাঠ শুকনা ছিল, উহাতে আর্দ্রতা ছিল না। কাজেই দিয়াশলাই লাগাইতেই জ্বলিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে মোটা ও তাজা বৃক্ষে প্রচুর আর্দ্রতা থাকে। কাজেই উহা জ্বালাইবার জন্য একটি দিয়াশলাই যথেষ্ট নহে।

যাহাদের বেলায় এক দৃষ্টিই যথেষ্ট হইয়া যায়, জানা উচিত যে, তাহাদের নফ্স পূর্ব হইতেই কতটুকু পরিষ্কার হইয়া রহিয়াছিল। আপনাদের নফ্স এখন মোটা এবং ফাসেদ উপকরণে পূর্ণ। সুতরাং এরূপ নফ্সের পক্ষে এক নযর যথেষ্ট নহে। কিন্তু মানুষ ধোঁকায় পড়িয়া আছে। আরও একটি ভ্রান্তি লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মুজাহাদাকে অত্যন্ত কঠিন কাজ মনে করিয়া আপন আত্মশুদ্ধির চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ ইহাকে এত সহজ মনে করে যে, বস্, শায়খ একটি দৃষ্টি করিলেই কেল্লা ফতেহ। অথচ

www.almodina.com

صوفی نه شود صافی تا در نه کشد جامی ـ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

(ছূফী না-শাওয়াদ ছাফী তা দর না-কাশাদ জামী
বেসিয়ার সফর বা-য়াদ তা পোখ্‌তা শাওয়াদ খামী)

"এশ্‌কের পিয়ালা পান করত বিস্তর মুজাহাদা না করা পর্যন্ত এছ্‌লাহ্ বা আত্মশুদ্ধি লাভ হইবে না।" আরও বলেনঃ

شنیدم رهروی در سر زمینے ـ همیں گفت ایں معمه با قرینے
که اے صوفی شراب آنگه شود صاف ـ که در شیشه بماند اربعینے

(শানীদাম রাহ্‌রুয়ে দর সর যমীনে + হামীঁ গুফত ইঁ মোয়াম্মা বা করীনে
কেহ্ আয় ছূফী শরাব আঁ গাহ্ শাওয়াদ ছাফ + কেহ্ দর শীশা বমানাদ আরবায়ীনে)

"জনৈক আধ্যাত্মিক পথের পথিককে আপন সঙ্গীর সহিত সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতে শুনিয়াছিলাম। হে ছূফী! শরাব তখনই স্বচ্ছ ও উৎকৃষ্ট হয়, যখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাঁচের পাত্রে আবদ্ধ থাকে।"

عاشقی چیست بگو بندۂ جاناں بودن ـ دل بدست دیگرے دادن و حیراں بودن
سوئے زلفش نظرے کردن و رویش دیدن ـ گاه کافر شدن و گاه مسلماں بودن

(আশেকী চীস্ত বগু বন্দায়ে জানাঁ বুদন + দিল বদস্তে দীগারে দাদন ও হায়রাঁ বুদন
সুয়ে যুলফাশ নযরে করদন ও রুয়াশ দীদন + গাহ্ কাফের শুদন ও গাহ্ মুসলমাঁ বুদন)

"আশেক হওয়ার অর্থ কি? প্রেমাস্পদের দাস হইয়া যাওয়া, আপন অন্তর অন্যের হাতে সঁপিয়া দিয়া অস্থিরচিত্ত হওয়া, তাহার কেশরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তাহার মুখমণ্ডল অবলোকন করা। অতঃপর কখনও আপন সত্তাকে বিলীন করা এবং কখনও আপন অস্তিত্বে ফিরিয়া আসা।"

"কাফের" ও "মুসলমান" দুইটি পারিভাষিক শব্দ। "কুফর" শব্দ দ্বারা পরিভাষায় "ফানা" (অস্তিত্ব বিলোপ করা) এবং "ইসলাম" শব্দ দ্বারা "বাকা" (অস্তিত্বে ফিরিয়া আসা) বুঝান হইয়া থাকে। ফানার জ্যোতিকে যুলফ (কেশদাম) এবং বাকার জ্যোতিকে "রুখ" (মুখমণ্ডল) বলা হইয়া থাকে।

মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, মুজাহাদা অতটুকু সহজ নয়, যতটুকু মনে করা হয়। আবার এত কঠিনও নয় যে, ভীত হইয়া উহা ত্যাগ করিতে হইবে।

**ছূফীবাদের স্বরূপঃ** বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ভ্রান্তির মূলে ছূফীবাদ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা। তাই ছূফীবাদের স্বরূপ জানা আবশ্যক। ছূফীবাদের স্বরূপ হইল تعمير الظاهر والباطن "মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ রূপকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করা।" ইহা ইচ্ছাধীন কাজ। সুতরাং তত কঠিন নহে। আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে ইহা এত সহজও নয় যে, কোনরূপ ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়া যাইবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই অর্জিত হয়, তবুও একটি জিনিস পূর্ণত্ব আমাদের হাতে। তাহা হইল ইচ্ছা ও চেষ্টা। চেষ্টা ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন হয়। দুঃখের বিষয়, আজকালকার মানুষ ইচ্ছা ব্যতিরেকেই কার্যসিদ্ধি কামনা করে। ভাইসব! জানিয়া রাখুন, ইচ্ছা ব্যতীত দুনিয়াতে কোন কাজই সম্পন্ন হয় না।

www.almodina.com

মনে করুন, খাওয়া কত সহজ কাজ! কিন্তু ইহাও ইচ্ছা না করিলে সম্ভব হয় না। শস্য ক্রয় করা, পিষানো, পাকানো, পাত্রে পরিবেশন করা ইত্যাদি কত কিছু করার পর ভাগ্যে খাওয়া জুটে। কেহ পাকানো খাদ্য দিয়া গেলেও উহা খাওয়ার বেলায় হাত মুখ চালনা করিতে হয়। অনেকে মনে করে যে, খোদার পথে চলিতে গেলে না জানি কি কি করিতে হইবে। পরিবার পরিজন ত্যাগ করিতে হইবে, অল্প পরিমাণে পানাহার করিতে হইবে ইত্যাদি আরও কত সুকঠিন কাজ করিতে হইবে। বলাবাহুল্য, এই শ্রেণীর লোকেরাই বুযুর্গদের নিকট পৌঁছিয়া রাতারাতি কামেল হইয়া যাওয়ার কৌশল চিন্তা করিয়া থাকে।

জনৈক পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই রকম ধারণা লইয়াই একজন বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ "জনাব, খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার কোন সহজ পদ্ধতি বলিয়া দিন—যাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য হইতে পারি।" বুযুর্গ ব্যক্তি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিলেনঃ "আপনার বয়স কত?" তিনি বয়স বলিলেন। আবার প্রশ্ন হইল, কখন লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন? উত্তরে জানা গেল যে, তিনি চতুর্থ বৎসরে বিস্‌মিল্লাহ্ করিয়াছিলেন। আজকাল চারি বৎসর বয়সে বিস্‌মিল্লাহ্ করার প্রথাটি মুসলমানদের মধ্যে বেশ চালু হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কোরআন ও হাদীসে ইহার কোন প্রমাণ নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বর্ণনা করিলেন যে, তিনি অমুক বয়সে উর্দু, অমুক বয়সে ফারসী ও অমুক বয়সে ইংরেজী পড়া আরম্ভ করেন। ইংরেজীতে ডিগ্রী লাভ করার পর এত বৎসর বয়সে চাকুরী লাভ করেন। এরপর প্রমোশন পাইতে পাইতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। বর্তমানে তিনি পেন্সন পাইতেছেন। বুযুর্গ ব্যক্তি বলিলেনঃ "তবে দীর্ঘ দিন পরেই তো আপনি উন্নতি লাভ করিয়াছেন?" উত্তর হইল, "হাঁ"। তিনি আবার বলিলেনঃ "মানুষ যখন একটি কাম্যবস্তু লাভ করার পর অপর একটি কাম্যবস্তু লাভ করিতে চায়, তখন স্বভাবতঃই দ্বিতীয়টিকে প্রথমটি হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। আপনি সাংসারিক উন্নতি লাভের জন্য এত দীর্ঘ সময় ব্যয় করিয়াছেন, অথচ ইহা আপনার দৃষ্টিতে হেয়। এক্ষণে খোদাকে লাভ করিবার বেলায় শীঘ্র পাওয়ার পন্থা বলিয়া দিতে আদেশ করিতেছেন। ছিঃ, আপনার লজ্জা করা উচিত।" পরে এই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিতেন, বাস্তবিকই বুযুর্গ ব্যক্তি এমন যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন যে, ইহাতে আমার কথা বলার কোন যো ছিল না।

বুযুর্গদিগকে খোদাপ্রাপ্তির পদ্ধতি বলিয়া দিবার ফরমায়েশ করা খুবই ভাল কথা। কিন্তু সহজ পদ্ধতির ফরমায়েশ করা নিতান্তই অশোভনীয়। যে খোদাকে পাইতে চায়, তাহার অবস্থা তো এইরূপ হওয়া উচিত।

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید

(দস্ত আয তলব না দারাম তা কামে মান বর আয়াদ

ইয়া তন রসদ বজানাঁ ইয়া জাঁ যেতন বর আয়াদ)

"যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য হাছিল না হয়, অন্বেষণে বিরত হইব না। আমার দেহ প্রেমাস্পদের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে, না হয় আমার প্রাণ দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে।"

ভাইগণ, নিজের পক্ষ হইতে ইচ্ছা ও অন্বেষণ করিতে থাকুন। খোদার পক্ষ হইতে অবশ্যই অনুগ্রহ হইবে। হাদীসে কুদসীতে বলা হইয়াছেঃ

www.almodina.com

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا الخ

"যে আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত আগাইয়া আসে, আমি তাহার দিকে বা' (উভয় হাত প্রসারিত করা) পরিমাণ আগাইয়া যাই। যে আমার দিকে ধীর গতিতে আসে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।" মোটকথা, আপনারা সামান্য মনোযোগ দিলে খোদার তরফ হইতে অপরিসীম রহমত হইবে। তাই কবি বলেনঃ

آب کم جو تشنگی آور بدست ـ تا بجوشد آبت از بالا و پست
تشنگاں گر آب جوئیند از جہاں ـ آب ہم جوید بعالم تشنگاں

(আব কম জো তেশ্‌নেগী আওয়ার বদস্ত + তা বজুশাদ আবাত আয বালা ও পস্ত
তেশ্‌নেগাঁ গর আব জুইয়ান্দ আয জাহাঁ + আব হাম জুইয়াদ ব আলম তেশ্‌নেগাঁ)

"পানি খুঁজিয়া ফিরিও না, পিপাসা সৃষ্টি কর। উচ্চ ও নিম্নভূমি হইতে তোমার নিকট পানি উথলিয়া আসিবে। অর্থাৎ, নিজের মধ্যে খোদার অন্বেষণ সৃষ্টি কর, তবে খোদার রহমত স্বয়ং তোমার দিকে ধাবিত হইবে। পিপাসিত ব্যক্তি যেমন পানি তালাশ করে, পানিও তেমনি পিপাসিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া ফিরে।" আপনি যেমন খোদার রহমত অন্বেষণ করেন, খোদার রহমতও তেমনি আপনাকে তালাশ করে। এই কারণেই দেখা যায়, বন্দার তরফ হইতে সামান্য মনোযোগ হইলে খোদার তরফ হইতে অসীম রহমত বর্ষিত হইতে থাকে। কবি বলেনঃ

عاشق که شد یار بحالش نظر نه کرد ـ اے خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

(আশেক কেহ্ শোদ ইয়ার বহালশ নযর না করদ + আয় খাজা দরদ নীস্ত ওগর না তবীব হস্ত)

"যে আশেক হইয়াছে, মাশুক নিশ্চয়ই তাহার প্রতি করুণা করিয়াছে। সত্য বলিতে কি, ব্যথা অর্থাৎ অন্বেষণই নাই। নতুবা চিকিৎসক অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রহমত সর্বদাই বিরাজমান আছে।"

বন্ধুগণ! কোন কিছু না করিয়া কেবল একদৃষ্টিতে কামেল হওয়ার আশায় থাকিবেন না। অন্বেষণ করিলেই দৃষ্টি হইবে। মাঝে মাঝে উস্তাদ অঙ্কের সহজ পদ্ধতি বলিয়া দেন, কিন্তু সকলকে নহে, যে ছাত্রের মধ্যে আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখেন শুধু তাহাকেই বলেন। সারকথা এই যে, এখলাছ মোটেই কঠিন কাজ নহে। তবে চেষ্টা ব্যতীত ইহা লাভ হইবে না।

এখন নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আমরা নামায পড়ি সত্য, কিন্তু নিয়ত খালেছ আছে কিনা, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করি না। কাহারও কথায় এদিকে লক্ষ্য করিলেও চাই যে, কোনকিছু না করিয়াই আপনাআপনি এখলাছ হউক। আমরা যখন এতই অমনোযোগী, তখন আল্লাহ্ তা'আলা কি জোর করিয়া আমাদের প্রতি রহমত করিবেন? اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ "তোমরা মুখ ফিরাইয়া রাখিলেও কি আমি তোমাদের মাথায় রহমত চাপাইয়া দিব?"

**এল্‌মের ব্যাপারে এখলাছের আবশ্যকতাঃ** দ্বীন বা ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত। একটি এল্‌ম ও অপরটি আমল। আমলের ব্যাপারে যেমন এখলাছ অপরিহার্য এলমের ব্যাপারেও তেমনি ইহা জরুরী। বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে আপনাদের নিয়ত কি, তাহা যাচাই করা দরকার। অশোভনীয় কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকে ও খোদাকে সন্তুষ্ট রাখার নিয়তে এল্‌ম শিক্ষা করে আজকাল

এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এল্‌মের ব্যাপারেই যখন এখলাছ নাই, আমলের ব্যাপারে ইহা কোথা হইতে আসিবে? প্রথমে এল্‌ম শিক্ষার ব্যাপারে এখলাছ পয়দা করা উচিত। আমি এ কথা বলি না যে, এখলাছ না হইলে এল্‌ম শিক্ষাই ত্যাগ করুন। এল্‌ম সর্বাবস্থায়ই শিক্ষা করা উচিত। কারণ, শিক্ষার সময় এখলাছ না থাকিলে পরে এখলাছ পয়দা হওয়ার আশা আছে। এল্‌ম শিক্ষা না করিলে এই আশাও থাকিবে না। তদ্রূপ আমলে এখলাছ না থাকিলেও আমল ত্যাগ করিবেন না। আমল করিতে করিতে এক সময় ইহার বরকতে এখলাছ পয়দা হইয়া যাইবে। ইহাদের একটি অপরটিকে আকর্ষণ করে। এল্‌ম দ্বারা যেমন নিয়ত দুরুস্ত হইয়া যায়, তেমনি আমল দ্বারাও এরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং নিয়ত খালেছ না হইলেও আমল ত্যাগ করিবেন না। কারণ, ভবিষ্যতে হাছেল হওয়ার আশা ত রহিয়াছে। বুযুর্গগণ বলিয়াছেনঃ

تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ فَاَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ

“আমরা অন্য নিয়তে এল্‌ম শিখিয়াছিলাম, কিন্তু এল্‌ম তাহা মানিল না। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র জন্যই হইয়া গেল।” ফতওয়া লিখিয়া মুফ্‌তী বলিয়া কথিত হওয়ার নিয়তে ফেকাহ্ পড়িয়াছিলাম কিংবা ওয়ায করিবার ও অন্যের নিকট হইতে নযরানা লইবার নিয়তে হাদীস পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এল্‌ম শেষাবধি খোদার জন্যই হইয়া রহিল। সে অন্যের জন্য হইতে স্বীকৃত হইল না। কারণ, অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোরআনের একখানি আয়াত তেলাওয়াত করিল। উহাতে এল্‌ম দ্বারা দুনিয়া উপার্জনের নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সে নিজেই এই রোগে আক্রান্ত মনে করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে বাধ্য হইবে। ফলে পরবর্তী-কালে সে একজন প্রকৃতই আমলকারী আলেম হইয়া যাইবে। اَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ বাক্যাংশের ইহাই তাৎপর্য।

এক শ্রেণীর লোক বলিয়া থাকে যে, ইংরেজী শিক্ষা করা যদি নিন্দনীয় হয়, তবে আজকাল আরবী শিক্ষা করাও দোষমুক্ত নহে। কেননা, আরবী শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা উভয়টিই দুনিয়া উপার্জনের নিয়তে করা হয়। অতএব, উভয়টিই মন্দ। যদি বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষায় ধর্মীয় বিশ্বাস বিগড়াইয়া যায়, তবে আরবী শিক্ষার মধ্যেও তো ফলসফা (দর্শন) শাস্ত্র আছে; ইহা দ্বারাও বিশ্বাস নষ্ট হইতে পারে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের এই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হইয়া যায়। এইসব উক্তির উদ্দেশ্য ভ্রান্তি সৃষ্টি ছাড়া কিছুই নহে। উভয় প্রকার শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আরবী শিক্ষিত ব্যক্তি যখন কোরআন ও হাদীস পাঠ করিবে কিংবা কানে শুনিবে এবং উহার অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করিবে, তখন ইহার সহিত এক হেদায়তকারী তো মওজুদ রহিয়াছে। ফলে কোন না কোন সময় ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে এবং সংশোধিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। উভয়ের মধ্যে কত স্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। মোটকথা, اَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ -এর উদ্দেশ্য—এল্‌ম খোদার পথের পথিক বানাইয়া ছাড়ে।

অতএব, এল্‌ম শিক্ষার প্রথম হইতেই নিয়ত খালেছ করার চেষ্টা করা উচিত। তখন হইতেই কাহারও নিয়ত খালেছ না হইলে তজ্জন্য এল্‌ম ত্যাগ করা উচিত নহে। আশা করা যায় যে, কোন সময় তাহার নিয়ত খালেছ হইয়া যাইবে। এই কারণেই বুযুর্গগণ বলিয়া থাকেন যে, এক ব্যক্তি আমল করে—যদিও সে রিয়াকার, তথাপি সে ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম—যে আমল করে না।

কারণ, তাহার বেলায় আশা করা যায় যে, এক সময় রিয়া থাকিবে না; কিন্তু আমল থাকিয়া যাইবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যিকর করে অপর এক ব্যক্তি তাহাকে রিয়াকার বলিয়া ভর্ৎসনা করে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা হইবে যে, তুমি তো লোক দেখানোর জন্যও যিকর কর না। সুতরাং কোন্ মুখে তুমি ভর্ৎসনা করিতেছ? কবি 'সাওদা' চমৎকার বলিয়াছেনঃ

سودا قمـار عشق میں شیـریں سے کوهکن ـ بازی اگـرچـه پا نه سکـا سر تو کهـو سکا

کس منـه سے اپنے آپ کو کہتـا ہے عشقباز ـ اے روسیـاه تجـه سے تو یه بهی نه هو سکا

(সাওদা কেমারে এশ্‌ক মেঁ শীরী সে কোহ্‌কন
বাযী আগরচে পা না সকা সর তো খো সকা
কিস মুঁহ্ ছে আপনে আপ কো কাহ্‌তা হায় এশ্‌কবায
আয় রো-সিয়াহ্ তুঝছে তো এহ্ ভী না হো সকা)

"শিরীণের সহিত এশ্‌কের জুয়া খেলায় পাহাড় খননকারী (ফরহাদ) যদিও বাযী জিতিতে পারিল না—তথাপি সে নিজকে বিলোপ করিতে পারিয়াছে। ওহে পোড়া কপাল! তুই তো ইহাও করিতে পারিলে না। অতএব, কোন্ মুখে আশেক হওয়ার দাবী করিস্?"

মোটকথা, কর্মী অকর্মী হইতে উত্তম। তবে কর্মীদিগকে এ কথা বলা হইবে যে, নিয়ত খালেছ করাও তাহাদের উপর ফরয। তাহারা ইহা করিতেছে না কেন? উদাহরণতঃ কেহ চর্বন না করিয়াই খাদ্য খাইলে তাহাকে খাইতে নিষেধ করা হইবে না; বরং উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে বলা হইবে। নামায যেরূপ পড়া উচিত সেইরূপ পড়িতে পারে না বলিয়া কেহ কেহ নামাযই পড়ে না। তাহারা ভীষণ ভ্রান্তিতে পতিত আছে। কোন কাজ উত্তমরূপে করিতে না পারিলেই কি তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে? ভাল লিখিতে পারে না বলিয়া কোন ছেলে শ্লেটে লিখা ত্যাগ করিলে তাহার এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাহাকে বলা হইবে, একাগ্রচিত্তে লিখিতে থাক। এক সময় হাতের লেখা সুন্দর হইয়া যাইবে।

যদি কেহ মনে করে যে, যেরূপ হওয়া উচিত—তাহার দ্বারা সেরূপ করা অসম্ভব, তবে ইহা ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। শরীঅতে অসম্ভব কোন কাজ নাই। তবে ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রথম শর্ত। যাহারা এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া কাজ করে না, এক্ষণে আমি তাহাদিগকে একটি বিষয় বলিতেছি। যে স্তরকে আপনি কামেল মনে করেন, লাভ করার পরও উহাকে অপূর্ণ মনে করিবেন। সর্বাবস্থায় কাজ করিয়া যান। পূর্ণ হউক বা অপূর্ণ হউক জানিয়া রাখুন, অপূর্ণ অবস্থা হইতেই মানুষ পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছিয়া থাকে।

মনে করুন, এক ব্যক্তি সবেমাত্র লেখা আরম্ভ করিয়াছে। সে একটি আঁকা বাঁকা জীম অক্ষর লিখিয়া পুস্তকে লিখিত জীমের সহিত তুলনা করত একেবারে নিরাশ হইয়া গেল। এমতাবস্থায় তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইবে যে, কার্যের শুরুতে থাকিয়াই শেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে নাই। এখন যেমনই হউক—লিখতে থাক। ক্রমান্বয়েই লিখা সুন্দর হইবে, একবারেই সুন্দর হইয়া থাকে না।

اندریں ره می تراش و می خراش ـ تا دم آخـر دم فارغ مبـاش

(আন্দরী রাহ্ মী তারাশ ও মী খারাশ + তা দমে আখের দমে ফারেগ মবাশ)
'এই কার্যেই লাগিয়া থাক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইহা হইতে পৃথক হইও না।'

www.almodina.com

تا دم آخر دم آخر بود ـ كه عنايت با تو صاحب سر بود

(তা দমে আখের দমে আখের বুয়াদ + কেহ্ এনায়েত বা তু ছাহেব সর বুয়াদ)

'শেষ পর্যন্ত এমন কোন মুহূর্ত উপস্থিত হইবে যাহাতে খোদার অনুকম্পার দৃষ্টি তোমার সঙ্গী হইয়া যাইবে।' কাজ করিতে থাক, কোন না কোন দিন ইন্‌শাআল্লাহ্ রহমতপ্রাপ্ত হইবে। হাফেয (রঃ) বলেনঃ

يوسف گم گشته باز آيد بكنعاں غم مخورـ كلبۂ احزاں شود روزےگلستاں غم مخور

(ইউসুফে গোমগাশতা বায আয়াদ ব-কেনআঁ গম মখোর
কালবায়ে আহ্যাঁ শাওয়াদ রোযে গুলিস্তাঁ গম মখোর)

'হারানো ইউসুফ কেনআনে ফিরিয়া আসিবে। তুমি চিন্তা করিও না, দুঃখ কষ্টের আবাসমূল কোন না কোন দিন বাগানে পরিণত হইবে।' অর্থাৎ, কাজে লাগিয়া থাক। চিন্তান্বিত হইও না। ইন্‌শাআল্লাহ্ এক দিন খোদা মেহেরবানী করিবেন।

**দাসত্বের চাহিদাঃ** আল্লাহ্‌র মেহেরবানী লাভে তাড়াতাড়ি করা দূষণীয়! আজকাল মানুষ প্রথমেই কোন একটি বিষয়কে লক্ষ্যবস্তু সাব্যস্ত করিয়া লয়। পরে উহা লাভ না হইলে কিছুই লাভ হইল না মনে করিয়া বসে। বলিতে কি, ইহাই তাহাদের নৈরাশ্যের মূল কারণ। তাহাদের জানা উচিতঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ কাহাকেও সামর্থ্যের বাহিরে কোনকিছু করিতে আদেশ করেন না।' মানুষ যখন যতটুকু করিতে সক্ষম হয়, বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ ততটুকু করার জন্যই। এক শত বৎসর যাবৎ যে মুজাহাদা করিতেছে, সে যেমন খোদার নিকট প্রিয়—সবেমাত্র মুজাহাদা শুরু করিয়াছে, যদিও পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই, সে-ও তেমনি খোদার প্রিয় বান্দা। তবে উভয়ের মধ্যে মর্তবার পার্থক্য আছে। মনে করুন, ছাত্রদের মধ্যে মিষ্টান্ন বন্টন করা হইলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্র উভয়কেই সমান অংশ দেওয়া হয়। সুতরাং মুজাহাদায় লিপ্ত থাকুন। হিম্মত হারাইবেন না। তবে প্রথম দিনেই জুনাইদ বাগদাদী (রঃ)-এর সমকক্ষ হইয়া যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করাই বিপদ। ইহাতে নিজের মধ্যে ত্রুটি দেখিলেই মনের আকাশ নিরাশার কাল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অনেকে মনে করে, জুনাইদের মত হওয়াই কামেল হওয়ার মাপকাঠি। অথচ এরূপ হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা নিরাশ হইয়া যায়। তাহাদের জানা উচিত, জুনাইদের সমকক্ষ হওয়াই কামেল হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি নহে। তাছাড়া জুনাইদের সমকক্ষ হওয়াকে অসম্ভব মনে করাও ঠিক নহে। খোদার অনুগ্রহ ধারা সর্বকালেই সমভাবে বিরাজমান। তাঁহার অনুগ্রহ আজও শত শত জুনাইদ ও শিব্‌লী (রঃ) পয়দা করিতে পারে।

هنوز آں ابر رحمت در فشاں است ـ خم و خم خانه با مهر و نشاں است

হুনুয আঁ আবরে রহমত দুর ফেশা নাস্ত + খোম ও খোম খানা বা মেহের ও নিশানাস্ত

অর্থাৎ, খোদার রহমতের ধারা এখনও পূর্বের ন্যায় বলবৎ আছে। তবে আপনি যে জুনাইদের সমকক্ষ হইয়াছেন, তাহা জানা আপনার জন্য জরুরী নহে। কারণ, ইহাতে আপনি অহঙ্কারে লিপ্ত হইয়া ফাসেক অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারেন। সুতরাং আপন মর্তবা জানিতে চেষ্টা করা

www.almodina.com

অবনতিকে ডাকিয়া আনার নামান্তর। এই পথে নিজকে সর্বনিকৃষ্ট মনে করাই উন্নতির লক্ষণ। যাহা লাভ হয়, উহাকে নিরেট খোদার অনুগ্রহ ভাবিতে হইবে। নিজের উন্নতি অনুভব করার কোন আবশ্যকই নাই।

উদাহরণতঃ, কেহ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি যদি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া যায়, তবে প্রকৃতপক্ষে ছেলেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক এবং জমিদার। কিন্তু কি পরিমাণ সম্পত্তির মালিক সে নিজে তাহা জানিতে পারে না। মোট-কথা, এই ধরনের বিষয়াদি জানিতে চাওয়া নিজকে উচ্চ মর্তবা হইতে নিম্ন মর্তবায় টানিয়া আনার শামিল। আপনাকে কাজ করিয়া যাইতে বলা হইয়াছে, আপনি কাজ করিয়া যান। کار خود کن کار بیگانه مکن 'নিজের কাজ করুন। অপরের কাজ লইয়া মাথা ঘামাইবেন না।' আদেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া যাওয়াই আপনার কর্তব্য। ইহাতে রত থাকুন, তৎপর উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কামিয়াবী লাভ করিতে পারিবেন। পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নাই।

অনেক কর্মী কাজ করার পর কিছু লাভ হইল কিনা, তাহা জানিবার পিছনে পড়িয়া যায়। ইহা একটি ভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। এরূপ ধারণাকে অন্তরে স্থান দেওয়া সমীচীন নহে।

যাহা মানুষের ক্ষমতাধীন নহে এমন ফলাফল অন্বেষণের পিছনে লাগিয়া যাওয়াও আজকাল-কার মানুষের একটি দোষ। মনে রাখুন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়াদির পিছনে পড়িবে, সে শুধু পেরেশানীই ভোগ করিবে। কতক ফলাফল সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ ওয়াদা দেন নাই। এইগুলি লাভ হওয়া নিশ্চিত নহে। সুতরাং ইহাদের পিছনে পড়া পেরেশানী বৈ কিছুই নহে। কতক ফলাফল সম্বন্ধে অবশ্য ওয়াদা আছে। যেমন, ছওয়াব ও পুরস্কার। এইগুলি আখেরাতে দেওয়া হইবে। সুতরাং দুনিয়াতেই এইগুলি লাভ করিতে চাওয়া নিছক পেরেশানী। খোদা আমাদিগকে একটি কাজ করিতে বলিয়া একটি পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। আমাদের কর্তব্য তাঁহার এবাদত করা। তিনি আপন ওয়াদা আখেরাতে পূর্ণ করিবেন। দুনিয়াতেই ফলাফল অন্বেষণ করা দাসত্ববিরোধী কাজ। আপন কর্মের সাফল্য জানিতে চাওয়াও এখলাছের পরিপন্থী। কেননা, ইহা ক্ষণস্থায়ী ফলাফল অন্বেষণ করার নামান্তর মাত্র। অথচ দুনিয়াতে সে যাহাকিছু পায় (অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধির ক্রমবর্ধমান মর্তবা) সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যেমন, কোন ছেলে লেখাপড়া করে; কিন্তু অদ্য ও কল্যের জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বুঝিতে পারে না। যদি সর্বপ্রথম দিনের জ্ঞান ও সর্বশেষ দিনের জ্ঞান তুলনা করা যায়, তবে দুই-এর মধ্যে বিরাট ব্যবধান পরিদৃষ্ট হয়। বন্ধুগণ, মু'মিন ব্যক্তির মুজাহাদার শুরু ও শেষকে এইভাবে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, কি ছিল, আর কি হইয়া গিয়াছে? অতএব, পার্থক্য অবশ্যই হয়, কিন্তু কর্মীর পক্ষে তাহা জ্ঞাত হওয়া জরুরী নহে। প্রথমতঃ দুনিয়াতেই ফলাফল লাভ হওয়া নিশ্চিত নহে, হইলেও তাহা জানা জরুরী নহে। এই বিষয়টি ভালরূপে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহা না বুঝার ফলেই অন্তরে নানা প্রকার ওয়াসওয়াসা ও কু-মন্ত্রণা মাথা চাড়া দিয়া উঠে।

খোদা তা'আলা কাহাকেও মানসিক আনন্দ দান করেন, আবার কাহাকেও অনাগত আশঙ্কা চিন্তায় লিপ্ত রাখেন। প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ীই এইরূপ করা হয়। যে ব্যক্তি আনন্দ পাইবার যোগ্য তাহাকে চিন্তা দান করিলে সে এক দিনেই আমল ছাড়িয়া দিবে। আবার যে ব্যক্তি চিন্তার উপযুক্ত, তাহাকে আনন্দ দিলে সে অহঙ্কারী হইয়া যাইবে। সুতরাং যে যাহা পায়, বুঝিতে হইবে, সে ইহারই উপযুক্ত। তাই কবি বলেনঃ

www.almodina.com

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم در کش ـ که آنچه ساقی ما ریخت عین الطاف ست

(বদরদ ও ছাফ তোরা হুক্‌ম নীস্ত দম দরকাশ
কেহ্‌ আঁচে সাকীয়ে মা রীখত আইনে আল্‌তাফ আস্ত)

"সঙ্কোচন ও খোলাখুলিভাবে চাওয়া না চাওয়ার তুমি অধিকারী নও। খোদা তোমাকে যাহাই দেন, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পক্ষে ইহাই মঙ্গলজনক ও প্রকৃত মেহেরবানী।"

**সুনিয়তের আবশ্যকতা**ঃ মুজাহাদার ইচ্ছা করার পর সাধারণতঃ উপরোক্তরূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে। ফলে ইচ্ছা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অনেকে ইচ্ছাই করে না। আবার অনেকে আরম্ভ করিয়াও উপরোক্তরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া মুজাহাদা ত্যাগ করিয়া বসে। তাই আমি বিষয়টি বিস্তারিত বুঝাইয়াছি যে, ইচ্ছা করুন এবং বাজে চিন্তা পরিত্যাগ করুন। যাহা করিতে বলা হইয়াছে, উহার পিছনে লাগিয়া যান এল্‌ম ও আমল উভয়টিতেই নিয়ত খালেছ করুন। আপনাকে ইহাই করিতে বলা হইয়াছে। এখানে যেহেতু শ্রোতাগণ সকলেই শিক্ষিত, তাই আমি এল্‌ম শিক্ষার ব্যাপারে প্রচলিত দোষ-ক্রটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করি। এল্‌ম শিক্ষা করার পিছনে খোদার আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনে তৎপর হওয়া এবং জনগণকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়াই আপনাদের একমাত্র নিয়ত থাকা উচিত। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ—এই এল্‌ম শিক্ষা করিতে যাইয়া চাকুরী লাভের নিয়ত করিবেন না। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ ইহা নিয়ত ছাড়াই লাভ হইবে। তখন স্বচ্ছন্দে চাকুরী করুন এবং বেতনও গ্রহণ করুন। শিক্ষাদান কার্যে বেতন লওয়া জায়েয নহে কথাটি নিরেট ভ্রান্তি প্রসূত। হানাফী মযহাবের নীতি অনুযায়ীও ইহা জায়েয। কারণ, যে অন্যের কোন কাজে আবদ্ধ থাকে, তাহার ভরণ-পোষণ ঐ ব্যক্তির জিম্মায় ওয়াজিব। কাযী (বিচারক) দিগকেও এই কারণেই বেতন দেওয়া হয়। কেননা, তাঁহারা জনগণের কাজে নিজকে নিয়োজিত রাখেন।

"বায়তুল মাল" (সরকারী ধনাগার) কি? ইহা মুসলমান জনগণের ধনসম্পদের সমষ্টি। সুলতান প্রয়োজন অনুযায়ী ইহা বিভিন্ন জনহিতকর কাজে ব্যয় করেন। পূর্ববর্তীকালে আলেম সমাজকেও ইহা হইতে ভাতা দেওয়া হইত। ইহা হারাম বলিয়া কেহ ফতওয়া দেয় নাই। আজকাল চাঁদারূপে আদায়কৃত অর্থও মুসলমান জনগণের ধনসম্পদের সমষ্টি। তবে বায়তুল মাল সুলতান বা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। তাই উহাকে মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হয়। অপর পক্ষে চাঁদার অর্থের কোন মর্যাদা নাই। উভয়ের মধ্যে এই তফাৎ। নতুবা প্রকৃতপক্ষে উভয়টি একই শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং চাঁদার অর্থ হইতে আলেমদিগকে ভাতা দেওয়া হারাম হইবে কেন? নির্ধারিত পরিমাণে দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে পারিশ্রমিক মনে করা ভুল হইবে। নির্ধারিত পরিমাণে না দিলে এবং প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করিলে পরে মতানৈক্য ও কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, কেহ বলিবে, এই পরিমাণ অর্থ আমার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট নহে, অপর একজন বলিবে, না, ইহাই যথেষ্ট। সুতরাং এইরূপ মতানৈক্য দূর করার উদ্দেশ্যেই প্রথমে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। মোটকথা, বেতন লওয়া যে জায়েয, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে বেতনের ব্যবস্থা করা মুসলমান জনগণের দায়িত্ব। আপনি ইহার জন্য মাথা ঘামাইবেন কেন? আপনার কর্তব্য দ্বীনের খেদমত করা। আপনি খেদমতের নিয়তে বেতন ছাড়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। জনগণ তাহাদের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করিবে। বেতনের ব্যবস্থা করিয়া

কাজ আরম্ভ করা মোক্তাদীদের নিয়ত বাঁধার পর ইমামের নিয়ত বাঁধার অনুরূপ। আমি জোর গলায় দাবী করিতে পারি যে, যদি আপনারা নিজ কর্তব্যে লাগিয়া যান, তবে জনসাধারণ জবরদস্তি আপনাদের খেদমত করিবে। তাহাদিগকে ধাক্কা মারিলেও তাহারা করজোড়ে মিনতি করিবে। এই কারণে প্রায়ই আমি বন্ধুবর্গকে বলিয়া থাকি, আপনারা বেতন লইয়া কোন দিন দর কষাকষি করিবেন না।

বন্ধুগণ, ধর্মের খেদমত করা আমাদের কর্তব্য। ইহাতে দর কষাকষি কিসের? ব্রাহ্মণ সমাজ হিন্দুদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, আপনারা কি তদ্রূপ করিতে চান? হিন্দুরা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজের নিমন্ত্রণ করিলে তাহারা সামান্য খাইয়া হাত গুটাইয়া লয়। তখন আরও খাইবার জন্য হিন্দুরা খোশামোদ করে। তাহারা বলে, "আরও খাইলে কি দিবে বল?" হিন্দুরা বলে, "প্রতি লাড্ডুতে এক টাকা।" অতঃপর দুই এক লাড্ডু খাওয়ার পর তাহারা আবার বায়না ধরে। তখন প্রতি লাড্ডুতে দুই টাকা দর সাব্যস্ত হয়।

আমি বলি, বেতন লইয়া কখনও কথা কাটাকাটি করিবেন না। যা দেয়, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করুন। আপনার অসুবিধা হইতেছে দেখিলে তাহারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার সাহায্য করিবে। এল্‌মের ব্যাপারে এখলাছ সম্বন্ধে এই পর্যন্তই বলা হইল।

**এখলাছ না থাকার অপকারিতাঃ** আমলের ব্যাপারে এখলাছ না থাকিলে যে সকল অপকারিতা সাধিত হয়, তাহাতে সাধারণ লোকও সম অংশীদার। তবে এল্‌মের ব্যাপারে সাধারণ লোকের অবস্থা খুবই ভাল। তাহারা চাকুরী লাভের নিয়তে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে না। অবশ্য মাঝে মাঝে তাহারা প্রয়োজন ছাড়াই অনর্থক মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। আবার কোন কোন সময় অসদুদ্দেশ্যে অর্থাৎ, বিবাদ সৃষ্টির নিয়তে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে; তবে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বেশীর ভাগ লোক আমল করার নিয়তেই মাসআলা জানিতে চায়।

হাঁ, আমলের দোষ-ত্রুটিতে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই সমভাবে জড়িত। তবে বিশিষ্ট লোকের রিয়ার স্থান পৃথক ও সাধারণ লোকের পৃথক। কোন কোন বিশিষ্ট লোক শুধু সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের নিয়তে যিকর ও তেলাওয়াত করে, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, টাকা-পয়সা রোযগার ও সুনাম অর্জনের নিয়তে সভা সমিতি করে এবং আমদানী বাড়াইবার উদ্দেশ্যে পীরী-মুরীদী করে। এক শ্রেণীর পীর টাকা-পয়সা লয় না—নযরানা কবূল করে না। ইহার পিছনেও তাহাদের নিয়ত ভাল নহে। না লওয়ার মধ্যেও সম্মান, যশ, অমুখাপেক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ ইত্যাদি জাগতিক স্বার্থ নিহিত থাকে। এখলাছ না থাকার ফলেই তাহাদের লওয়া না লওয়া উভয়টিই দূষণীয়। তাহাদের অবস্থা এইরূপঃ

چوں گرسنه می شوی سگ شوی - چونکه خوردی تند و بدرگ می شوی

(চুঁ গুরসানা মী শভী সগ শভী + চুঁকে খুরদী তুন্দ ও বদরগ মী শভী)

"যখন ক্ষুধার্ত থাক, তখন কুকুরের স্বভাব অবলম্বন কর এবং যখন আহার কর, তখন বদ মেযাজ ও দুরাচারী হইয়া যাও,—এই তোমার অবস্থা।"

সাধারণ লোকেরা যশ লাভের নিয়তে মসজিদ নির্মাণ করে, যাহাতে সকলে জানিতে পারে যে, মসজিদটি অমুকের নির্মিত। এই কারণেই আজকাল প্রয়োজন ব্যতিরেকেই প্রচুর সংখ্যক

www.almodina.com

মসজিদ নির্মিত হইতেছে। ভাইগণ, মসজিদ পরে বানাইবেন—আগে মসজিদ আবাদকারী তো বানাইয়া লউন। বর্তমানে বহু মসজিদ অনাবাদ পড়িয়া থাকে। ঐ গুলিতে আযান ও জমাআত বলিতে কিছুই হয় না।

আজকাল অনেকেই নাম যশের উদ্দেশ্যে ওয়াযের পর মিষ্টান্ন বণ্টন করে। অপরের সম্মুখে বড় লোক সাজিবার জন্য দামী পোশাক পরিধান করে। দামী পোশাক পরিতে আমি নিষেধ করি না। স্বচ্ছন্দে পরুন; কিন্তু আপন মনস্তুষ্টির নিয়ত করুন। ইহাতে খোদার নেয়ামতের শোক্‌র আদায় হইবে। সাবধান, অপরকে দেখাইবার নিয়ত করিবেন না, ইহা জায়েয নহে। যদি কেহ একাকী ও নির্জন অবস্থায়ও দামী পোশাকে সজ্জিত থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে ভাল নিয়তে পোশাক পরিধান করে। অনেকেই বাড়ীতে থাকার সময় নিকৃষ্টতম পোশাক পরে, কিন্তু কোথাও যাইতে হইলে সমস্ত সাজসজ্জা গায়ে জড়াইয়া লয়। তাহাদের বেলায় কিরূপে বলা যায় যে, তাহারা লোক দেখানো পোশাক পরে না?

কাহারও উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে সে নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায়ই উৎকৃষ্ট খাদ্য খায়; পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও যদি আপন মনস্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকিত, তবে একাকী অবস্থায় তাহা খুলিয়া ফেলা হয় কেন? অনেকে এইরূপ লোকদেখানোর খাতিরে কষ্টদায়ক পোশাক পরিয়া থাকে। তাহারা গ্রীষ্মকালে গরম আচকান পরিয়া বাহিরে যায়, এ সমস্তই রিয়া। ইহাতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতি সাধিত হয়। অবশ্য অন্তরে রিয়ার ভাব না থাকিলে এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকিলে উৎকৃষ্ট পোশাক পরা অন্যায় নহে। তবে ইহাও সত্য যে, সামর্থ্যবান লোকদের পোশাকের প্রতি তেমন মনোযোগ নাই।

ভূপালের একটি গল্প শুনিয়াছি। একদা কোন উন্মুক্ত স্থানে সকলেই ফরয শেষ করিয়া সুন্নত নামায পড়িতেছিল। এমন সময় ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। সকলেই দ্রুত গতিতে নামায শেষ করিয়া ঘরে চলিয়া গেল, কিন্তু জনৈক দামী পোশাক পরিহিত ধনী ব্যক্তি গেলেন না। তিনি বৃষ্টিতে ভিজিয়াই অত্যন্ত খুশু খুযূ সহকারে নামায সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর তিনি ঘরে পৌঁছিলে কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ "আপনি দ্রুত গতিতে নামায শেষ করিলেন না কেন? বৃষ্টির পানিতে আপনার পোশাক সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ধনী ব্যক্তি বলিলেনঃ "আমার কাছে আরও অনেক কাপড় আছে। এইগুলি খুলিয়া আমি অন্য কাপড় পরিতে পারিব। কিন্তু দ্রুততার কারণে নামাযে ত্রুটি হইলে তাহা পূরণের উপায় ছিল না।" সোবহানাল্লাহ্! এরূপ ব্যক্তি বাস্তবিকই দামী পোশাক পরিধান করার অধিকারী। তিনি পোশাককে নামায অপেক্ষা উত্তম মনে করেন নাই। যেমন, জনৈক পাগলমনা কবির একটি গল্প আছে—একদা নামায-রত অবস্থায় তাহার মস্তিষ্কে কবিতার একটি পংক্তি গজাইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া উহা কাগজে লিপিবদ্ধ করত আবার নামায পড়িতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলঃ 'এরূপ করিলেন কেন? নামাযের পরও তো পংক্তি লিখিতে পারিতেন।' উত্তরে বলিলঃ "নামাযের কাযা আছে; কিন্তু কবিতার পংক্তি একবার ভুলিয়া গেলে উহার কোন কাযা নাই।"

যাহারা পুরা কবি নহে তাহারাই এই ধরনের পাগলসুলভ কাণ্ড কারখানা করিয়া থাকে। যথার্থ কবিরা এরূপ নহে। যওক বলিতেন, "যে ব্যক্তি কক্ষে আবদ্ধ হইয়া কবিতা লিখে, আমি তাহাকে কবি বলি না। আপনারা আমাকে এবং আমার সমসাময়িক কোন কবিকে এক সঙ্গে কোমরে রশি বাঁধিয়া কূপের ভিতরে লটকাইয়া দিন। এরপর উপর হইতে রশি কাটিয়া দিন। পানি পর্যন্ত

www.almodina.com

পৌঁছিতে যে বেশী কবিতা রচনা করিতে পারিবে সেই প্রকৃত কবি।" পূর্ণত্বের অধিকারী কবিদের বেলায় কবিতা লিখিতে সাত পাঁচ যোগাড় করিতে হয় না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি পর্যাপ্ত পোশাকের মালিক, সে কখনও পোশাকের পরওয়া করে না। যাহারা এরূপ নহে, তাহারা পোশাকের প্রতি মনোযোগ দিলে উহাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। তাহারা গাবরুনের (এক প্রকার মোটা কাপড়) পোশাক পরিলেও তাহা আকর্ষণীয়রূপে পরিধান করে।

জনৈক বুযুর্গ বর্ণনা করেনঃ 'একদা রেলগাড়ীতে জনৈক তথাকথিত ভদ্রলোককে গাবরুনের কোট পরিহিত দেখিলাম। তাহার নিকট লেপ বা গরম কাপড় ছিল না। তখন শীতকাল ছিল। শীতকালে তুলার কাপড় পরিধান না করাও আজকালকার একটি ফ্যাশন। এক ষ্টেশনে কয়েকজন ইংরেজ হোটেলে যাইয়া বরফ পান করিলে তাহাদের দুর্দশা দেখে কে? কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে নাজেহাল হওয়ার দশা। যে কেহ সামর্থ্যের বাহিরে কাজ করিবে, সেই দুর্দশাগ্রস্ত হইবে। অনেকের সামর্থ্য নাই; কিন্তু মরিয়া হইয়া অন্যের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। বুযুর্গ ব্যক্তি ভদ্রলোককে বলিলেন, "আমার কাছে যথেষ্ট কাপড় আছে; কিন্তু সবগুলি তুলার তৈরী। বোধ হয় আপনি পছন্দ করিবেন না।" কিন্তু শীতের দাপটে ভদ্রলোক তখন বলিতে বাধ্য হইলেন, তুলার কাপড়ই দিন আপনার বড়ই অনুগ্রহ হইবে।

আরও একটি গল্প মনে পড়িল। জনৈক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে পানির সোরাহী লইয়া রেলে সওয়ার হইলেন। একজন ভদ্রলোক তাহাকে দেখিয়া নাক সিটকাইয়া বলিলেন, "মেথরদের ন্যায় এ কি পাত্র লইয়া চলাফিরা করেন?" লোকটি ইহার উত্তরে কিছুই বলিল না। ঘটনাক্রমে একবার ভদ্রলোকের দারুণ পিপাসা হইল। ষ্টেশনে বহু খোঁজাখুঁজির পরও পানি পাইলেন না। অতঃপর আপন সিটে বসিয়া বারবার সোরাহীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। লোকটি তখন ইচ্ছাপূর্বক ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর ভদ্রলোক তাহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া সোরাহী উঠাইয়া পানি পান করিতে লাগিলেন। পানি পান সমাপ্ত হইলে লোকটি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "আপনি মেথরের পাত্র হইতে পানি পান করিলেন কেন?" তথাকথিত ভদ্রলোক আর কি করিবেন? অগত্যা তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন।

লোক দেখানো পোশাক সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা হইল। ইহাতে জনসাধারণই বেশীর ভাগ লিপ্ত। মাঝে মাঝে তাহারা সমাজের লোকদিগকে দাওয়াত করিয়া বিস্তর অপব্যয় করে। অথচ উদ্দেশ্য নাম যশঃ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আলেমগণ এইসব ব্যাপারে নিষেধ করিলে তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলে, "আলেমগণ জায়েয কাজেও বাধা দান করেন।" অথচ আলেমগণ লোকদেখান কাজ হইতে বাধা দান করেন। বিবাহে পাত্রীকে যৌতুক দেওয়ার বেলায়ও তাহাদের অপব্যয় সীমা ছাড়াইয়া যায়। তাহারা ইহাকে আত্মীয়-তোষণ নাম দিয়া থাকে। অথচ আত্মীয়-তোষণ হইলে গোপনে দেওয়াই অধিক সঙ্গত ছিল। আত্মীয়-তোষণে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা করা জরুরী হইলে তাহারা প্রত্যহ আপন সন্তানদিগকে বিরাট জনসমাবেশ করিয়া খাওয়ায় না কেন? আসলে ইহা একটি বাহানা বৈ কিছুই নহে। লোকে বলুক—অমুক ব্যক্তি আপন কন্যাকে ক্ষমতার বাহিরে যৌতুক দিয়াছে, ইহাই তাহাদের কাম্য। অথচ ইহা নির্বুদ্ধিতা এবং সূক্ষ্ম নিন্দা। কিন্তু আজকালকার মানুষের এমনি রুচি বিকৃতি যে, তাহারা নিন্দাকেও প্রশংসা মনে করিয়া আনন্দিত হয়।

আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতেও যে দাওয়াত করা হয়, ইহাতেও ছওয়াবের নিয়ত থাকে বলিয়া মুখে দাবী করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহাদের এই দাবী সর্বৈব মিথ্যা। পরীক্ষা এই যে, এরূপ ব্যক্তিকে নির্জনে বলিবে, "সাহেব, যেখানে প্রয়োজন বেশী সেখানে টাকা দিলেই বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। দাওয়াতে যাহারা খায়, তাহারা সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। সুতরাং দাওয়াতে যে টাকা খরচ হইবে, তাহা গোপনে অমুক মাদ্রাসা, মসজিদ কিংবা অমুক আত্মসচেতন দরিদ্রকে দান করিয়া দিন। এরপর ইহার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে বখশিয়া দিন।" এইরূপ পরামর্শ দেওয়ার পর দেখিতে পাইবেন, সে ইহাতে মোটেই রাযী হইবে না; বরং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবে, "সোবহানাল্লাহ্! এত এত টাকা খরচ করিব অথচ কেহ জানিতেও পারিবে না! না, তা হয় না।" এবার বলুন, ইহা স্পষ্ট রিয়া নয় কি? এমতাবস্থায় দাওয়াতে কি ছওয়াব হইবে এবং মৃতব্যক্তিকেই বা কি বখশিয়া দিবে? ছওয়াব বখশিয়া দেওয়া অর্থ এই যে, আপনি কোন নেক কাজ করিয়া যে ছওয়াবটুকু পাইবেন, তাহা অন্যের নামে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এখানে দাওয়াতকারীর ছওয়াবের কোঠাই যখন শূন্য, তখন সে মৃতব্যক্তিকে কোথা হইতে দিবে?

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল। রামপুরের জনৈক ব্যক্তি কোন ভণ্ড পীরের মুরীদ হইল। কিছুদিন পর তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলঃ "বলুন তো পীর সাহেবের নিকট হইতে কি 'ফয়েয' পাইলেন?" লোকটি ছিল স্পষ্টভাষী। বলিল, "হাউযেই পানি নাই, বদনায় কোথা হইতে আসিবে?"

ছওয়াব পাওয়ার অবস্থাও তদ্রূপ। যে নেক কাজ করে, সেই যদি ছওয়াব না পায়, তবে অন্যকে কি দিবে? দাওয়াতের সমস্ত টাকা-পয়সাই বিফলে যায়। ছওয়াবের নিয়ত করার কথাটি শুধু দাবীই দাবী। প্রকৃতপক্ষে লোকলজ্জার খাতিরে এসব করা হয়। কেহ কেহ ইহা স্বীকারও করিয়া থাকে।

কেরানা শহরে জনৈক (گوجر) গোয়ালা পীড়িত ছিল। তাহার পুত্র জনৈক হাকীম সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "হাকীম সাহেব, বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইলে আমার দুঃখ হইবে না; কিন্তু এবার চাউলের দাম ভয়ানক চড়া। সমাজের লোকদিগকে খাওয়ানো আমার পক্ষে খুবই মুশকিল হইবে। কাজেই দয়া করিয়া এবারকার মত পিতাকে আরোগ্য করিয়া দিন।"

বেচারা ছিল সরল, তাই অকপটে সত্য কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেও এইরূপ ধারণাই থাকে; কিন্তু সম্ভ্রম বজায় রাখার খাতিরে আমরা তাহা প্রকাশ করি না। ইহা হইল যাহারা দাওয়াত করিয়া খাওয়ায়, তাহাদের মনের অবস্থা। যাহারা খায়, তাহাদের অবস্থা কি বলিব! তাহারা পুরাপুরিই বেহায়া। নতুবা কাহারও মৃত্যুতে কোথায় সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত, তাহা না করিয়া তাহারা উল্টা খরচের বোঝা চাপাইয়া দেয়।

এ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তির একটি গল্প মনে পড়িল। বুলন্দশহর জেলার জনৈক ধনী ব্যক্তির এন্তেকাল হয়। চল্লিশতম দিনে অনুষ্ঠান পালনের জন্য তাহার বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব হাতী ঘোড়া লইয়া উপস্থিত হইল। মৃতব্যক্তির পুত্র সকলকে আপ্যায়ন করার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করাইল। খাওয়ার সময় সকলেই দস্তরখানে একত্রিত হইলে মৃত ব্যক্তির পুত্র দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল। "বন্ধুগণ! খাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে দয়া করিয়া আমার কয়েকটি কথা শুনিয়া লউন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, অদ্য কি উপলক্ষে এই বিরাট জনসমাবেশ। বর্তমানে আমি ভয়ানক বিপদে পতিত আছি। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বার ছায়া চিরদিনের জন্য

আমার মাথার উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে, তাই আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশার্থে আপনারা সমবেত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার দরুন নিজেই খাইতে পরিতে পারি না, এমতাবস্থায় আপনারা আস্তিন গুটাইয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য খাইতে বসিয়াছেন। ইহাই কি সমবেদনা? লজ্জা-শরম বলিতে কি আপনাদের কিছুই নাই। বস্‌, আমার কথা শেষ হইয়াছে। এখন খাওয়া আরম্ভ করুন।"

কিন্তু এই বক্তৃতার পর কে খাইতে পারে? সকলেই লজ্জিত হইয়া মজলিস হইতে প্রস্থান করিল এবং সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, বাস্তবিকই চল্লিশার এই অনুষ্ঠানটি চিরতরে বর্জন করার যোগ্য। সকলেই নির্বিবাদে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সমস্ত খাদ্য গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইল।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমস্ত সামাজিক দাওয়াতের অবস্থাই এইরূপ। এইগুলিতে দাওয়াতকারীর কষ্ট ও যাহারা খায় তাহাদের নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। তা সত্ত্বেও মৌলবী সাহেবদের প্রতিই দোষারোপ করা হয় যে, তাহারা ইছালে ছওয়াব করিতে নিষেধ করে। বন্ধুগণ, ইছালে ছওয়াব করিতে কেহ্ নিষেধ করে না। তবে উদ্ভট পন্থায় করিতে নিষেধ করা হয়। মনে করুন, কেহ কেবলার দিকে পিঠ দিয়া নামায পড়িলে তাহাকে নিষেধ করা হইবে নাকি? শরীঅতানুযায়ী আমল করিলে কাহারও নিষেধ করার অধিকার নাই। বলা বাহুল্য, এখলাছ অর্থাৎ, খাঁটি ছওয়াবের নিয়তে করিলেই তাহা শরীঅতানুযায়ী হইবে।

**আধ্যাত্মবিদদের এখলাছঃ** এ পর্যন্ত বাহ্যদর্শী লোকদের এখলাছ সম্বন্ধে বলা হইল। এখন আধ্যাত্মবিদদের এখলাছ সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা রাখি। যিকর ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মনস্তুষ্টি কামনাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহা ছাড়া অন্য কোন নিয়তে যিকর করা উচিত নহে। পার্থিব স্বার্থ-সিদ্ধি উদ্দেশ্য না হইলেও, আধ্যাত্মিক ফল প্রকাশের নিয়তে যিকর করিলে তাহাও এখলাছ বিরোধী হইবে।

হযরত হাফেয যামেন সাহেব শহীদ (রঃ) বলিতেন, আল্লাহ্ বলেনঃ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" সুতরাং আমরা এই নিয়তেই যিকর করি যে, আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের যিকর হইবে। যিকরের এই লক্ষ্য থাকিলে শয়তান আমাদিগকে ধোঁকা দিতে পারিবে না যে, সম্ভবতঃ খোদা তোমাদিগকে স্মরণ করিবেন না। কারণ, পবিত্র কোরআনে খোদা ইহার পরিষ্কার ওয়াদা করিয়াছেন। "আমি এই বক্তব্যটিই প্রকারান্তরে বর্ণনা করিতেছি যে, যিকরের ফলাফল দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম প্রকার, ওয়াদাকৃত ফলাফল। যেমন, আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ "তোমরা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" ইহা কামনা করা দূষণীয় নহে; বরং ইহাই কাম্য হওয়া উচিত। দ্বিতীয় প্রকার ফলাফল ওয়াদাকৃত নহে। যেমন, "হাল ও বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা।" এই প্রকার ফলাফল কামনা করা বাস্তবিকই দোষের কথা। কেননা, খোদা যে বিষয়ের ওয়াদা দেন নাই, উহাকে উদ্দেশ্য হিসাবে কামনা করা মোটেই সঙ্গত নহে। মোটকথা, খোদার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য মিশ্রিত হওয়া এখলাছ বিরোধী। প্রকৃত আধ্যাত্ম-পন্থীর ধর্ম এইরূপ হওয়া উচিতঃ

زنـده کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو ۔ دل شده مبتلائے تو هرچه کنی رضائے تو

(যিন্দা কুনী আতায়ে তু ওর বকুশী ফেদায়ে তু
দিল শোদাহ্ মোব্‌তালায়ে তু হারচে কুনী রেযায়ে তু)

"জীবিত রাখিলে আপনার অনুগ্রহ হইবে ; হত্যা করিলে আপনার প্রতি উৎসর্গীত হইব। আমার অন্তর আপনার এশ্‌কে নিমজ্জিত, সুতরাং যাহাই করিবেন, তাহাতেই আমি রাযী।" হযরত সারমাদের ভাষায় তাহার অবস্থা এরূপ হওয়া উচিতঃ

سرمــد ! گله اختصــار می بایــد کرد ـ یك كار ازیــں دو كار می بایــد کرد

یا تن برضــائـے دوست می بایــد داد ـ یا قطع نظر ز یارے می بایــد کرد

(সারমাদ, গেলা এখতেছার মীবায়াদ কারদ্‌ + এক কার আযইঁ দো কার মীবায়াদ কার্‌দ
ইয়া তন বরেযায়ে দোস্ত মীবায়াদ দাদ + ইয়া কাতয়ে নযর যে ইয়ারে মীবায়াদ কারদ্‌)

"সারমাদ! কুৎসা ও অভিযোগ ত্যাগ করা উচিত। দুইটি হইতে যে কোন একটি কাজ করা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার মনস্তুষ্টিতে প্রাণ সঁপিয়া দাও, নতুবা প্রেমাস্পদকেই ত্যাগ কর।"

বলা বাহুল্য, আধ্যাত্ম পথের পথিককে এমনই হওয়া উচিতঃ

توبنــدگی چو گدایــاں بشــرط مزد مکن ـ که خواجــه خود روش بنــده پروری داند

(তু বন্দেগী চুগাদায়াঁ বশর্তে মুযদ মকুন + কেহ খাজা খোদ রাভেশে বান্দা পরওয়ারী দানাদ)

"তুমি মজুরের ন্যায় পারিশ্রমিকের শর্তে খোদার বন্দেগী করিও না। কেননা, প্রভু দাস পালনের রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন।" অর্থাৎ, 'হাল' লাভ করিবার নিয়তে এবাদত করিও না; বরং খোদার সন্তুষ্টির জন্য কর।

মোটকথা, 'হাল' ইত্যাদি খোদার আয়ত্তে। আপনি আপন কাজ করিয়া যান। ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়ের পিছনে পড়িবেন না।

এই মাহফিলে আমি এখলাছ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমুদয় তথ্য উপস্থাপিত করিতে চাই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় বিষয়ে বর্ণনা করিয়া দিলাম এবং ইহার তদবীরও বলিয়া দিলাম। যাহা হউক, উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এখলাছের স্বরূপ তো বুঝিতে পারিলেন। স্বীয় স্বার্থ উদ্দেশ্য না হইয়া শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা উচিত।

**এখলাছ লাভ করার উপায়ঃ** এক্ষণে এখলাছ লাভ করার তদবীর ও উপায় শুনুন। কোন কাজ করিবার পূর্বে কাজটি কেন করা হইতেছে, তাহা মনে মনে অনুধাবন করুন। যদি কোন খারাপ নিয়ত দেখেন, তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলুন। এর পর খালেছ খোদার জন্য নিয়ত করুন। এখলাছের সহজ উপায় লাভ করার উত্তম পন্থা এই যে, খ্যাতনামা এখলাছবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাহিনী পাঠ করুন, ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। মাওলানা রূমী (রঃ) এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেনঃ

او خدو انــداخــت بر روئے علی ـ افــتــخــار هر نبــی و هر ولی

(উ খাদু আন্দাখ্‌ত বর রুয়ে আলী + এফতেখারে হার নবী ও হার ওলী)

"সে হযরত আলী (রাঃ)-এর মোবারক মুখমণ্ডলে থুথু নিক্ষেপ করিল, যিনি নবী ও ওলীদের গৌরব।" 'নবীদের গৌরব' কথাতে কেহ মনে করিবেন না যে, হযরত আলী নবী হইতেও উত্তম। সর্বদা বড়কে লইয়া গর্ব করা হয় না; বরং কোন সময় বড়গণ ছোটদিগকে লইয়াও গর্ব করিয়া থাকেন। যেমন, উস্তাদ আপন উপযুক্ত শিষ্য লইয়া গর্ব করেন।

www.almodina.com

ঘটনা এইরূপঃ কোন এক যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) জনৈক ইহুদীকে নীচে ফেলিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসেন। তিনি তাহাকে খঞ্জর দ্বারা যবাহ্ করিবেন, এমন সময় ইহুদী তাঁহার মুখে থুথু নিক্ষেপ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। এই অভাবিত ব্যাপার দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিলঃ "মুখে থুথু দেওয়ার কারণে আমি আরও অধিক হত্যার যোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন কেন?" হযরত আলী (রাঃ) বলিলেনঃ "থুথুর পূর্বে হত্যা করিলে তাহা খালেছ আল্লাহ্‌র জন্য হইত; কিন্তু থুথু নিক্ষেপের পর হত্যা করিলে তাহাতে আমার ব্যক্তিগত ক্রোধও শামিল হইয়া যাইত। এই কারণে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" হযরত আলীর এই মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া ইহুদী তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, প্রকৃত এখলাছ ইহাই। এই ঘটনাটি স্মরণ রাখাই যথেষ্ট।

তাছাড়া, যাঁহারা এখলাছের গুণে গুণান্বিত, অন্তরে তাঁহাদের প্রতি মহব্বত রাখুন। তাঁহাদের বাণী ও কার্যাবলী লক্ষ্য করুন। ইহাতে আপনার চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এক্ষণে আমার দুইটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। তন্মধ্যে একটি বেলগ্রামের। সেখানে জনৈক বুযুর্গের নিকট এক ব্যক্তি কিছু পড়াশুনা করিত। এক দিন পড়িতে আসিয়া সে উস্তাদকে কিছু দুর্বল দেখিতে পাইল। আসলে ঐদিন তাঁহার বাড়ীতে আহার্য বস্তু কিছুই ছিল না। তিনি উপবাস করিতেছিলেন। শাগরেদ ছিল অত্যন্ত শিষ্টাচারী। সে পড়িতে ওযর পেশ করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আপন বাড়ী হইতে সামান্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া আবার উস্তাদের খেদমতে হাযির হইল। উস্তাদ বলিলেন, "প্রয়োজনের মুহূর্তেই এই খাদ্যদ্রব্য আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আমি ইহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। কারণ, ইহা গ্রহণ করিলে হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ হইবে। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ
مَااَتَاكَ مِنْ غَيْرِ اِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ "যে বস্তু মনের প্রতীক্ষা ব্যতিরেকে তোমার নিকট পৌঁছে, তাহা গ্রহণ কর।" তুমি যখন এখান হইতে বিদায় হইয়াছিলে, তখনই আমার মনে খট্‌কা হইয়াছিল যে, হয়তো তুমি কিছু লইয়া আসিবে। শাগরেদ ছিল জ্ঞানী। সে মোটেই পীড়াপীড়ি না করিয়া খাদ্যদ্রব্য লইয়া চলিয়া গেল। উস্তাদের দৃষ্টির আড়ালে পৌঁছিয়া আবার ফিরিয়া আসিল এবং বলিল, "এবার খানা গ্রহণ করিলে হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ হইবে না। কেননা, আমি যখন চলিয়া যাইতেছিলাম, তখন আপনি নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন।" শাগরেদের এই কথা শুনিয়া বুযুর্গ ব্যক্তি নিরতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাহার জন্য দো'আ করিলেন।

এক্ষেত্রে আমরা হইলে পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতামঃ না হুযূর, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইহা গ্রহণ করুন। আজকাল বুযুর্গদিগকে হাদিয়া কবূল করিতে জোরজবরে বাধ্য করাও একটি উত্তম গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আমার মতে ইহা একেবারে অসমীচীন। এই অভ্যাস প্রশংসনীয় নহে। খেদমত করার শত শত পথ খোলা আছে। শুধু হাদিয়া দেওয়ার মধ্যে খেদমত সীমাবদ্ধ নহে।

উপরোক্ত বুযুর্গ ব্যক্তির খালেছ নিয়ত লক্ষণীয়। তিনি নিয়তে অন্য জিনিসের সামান্য মিশ্রণ হইতে দেন নাই। এই ঘটনা হইতে জানা গেল যে, এরূপ কারণেও বুযুর্গগণ মাঝে মাঝে হাদিয়া গ্রহণে অসম্মত হন। ইহাতে হাদিয়াকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হইয়াছে ভাবিয়া হাদিয়াদাতার মনক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হযরত হাতেম আছাম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। একদা এক ব্যক্তি তাঁহাকে একটি টাকা দিতে চাহিলে তিনি প্রথমে উহা লইতে অসম্মত হন। পরে অনেক পীড়াপীড়ি করার পর তিনি টাকাটি গ্রহণ করিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলঃ "যদি টাকাটি লওয়া হারাম ছিল, তবে কেন

লইলেন ? আর হালাল হইলে প্রথমে লইলেন না কেন ?" তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ "টাকাটি লওয়া যদিও ফতওয়ার অনুকূলে ছিল কিন্তু তাকওয়ার পরিপন্থী। তাই আমি প্রথমে অস্বীকার করিয়াছি। পরে যখন দেখিলাম, গ্রহণ না করিলে তাহার অপমান ও আমার ইজ্জত বহাল থাকিবে এবং গ্রহণ করিলে আমার অপমান ও তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, তখন আমি নিজের ইজ্জত অপেক্ষা মুসলমান ভাইয়ের সম্মান বৃদ্ধিকেই উত্তম মনে করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

বন্ধুগণ ! বুযুর্গগণ যদি কখনও হাদিয়া গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের নিয়ত এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের গ্রহণ করা বা না করা কোনটির উপরই প্রতিবাদ করিতে নাই। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রকৃত বুযুর্গ হওয়া চাই। "বুযরুগ" (ভণ্ড) না হওয়া চাই। কেননা ঃ

اینکـه می بینی خلاف آدم انـد ــ نیسـتـنـد آدم غلاف آدم انـد

(ইঁ কেহ্ মী বীনী খেলাফে আদম আন্দ + নীস্তান্দ আদম গেলাফে আদম আন্দ)

"যাহাদিগকে মনুষ্যত্ববিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত দেখ, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নহে; বরং তাহারা মানুষের আবরণে আবৃত মাত্র।"

অনেক মানুষ আকারে আকৃতিতে মানুষ হইলেও প্রকৃতপক্ষে মানুষ নহে, শয়তান। যিনি পুরাপুরী শরীঅতের অনুসারী, শাগরেদদের প্রতি দয়াশীল, নিষিদ্ধ কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকেন এবং যাঁহার সংসর্গে বসিলে দুনিয়ার আসক্তি হ্রাস পায়, তিনিই প্রকৃত বুযুর্গ, তাঁহার যাবতীয় কাজকর্মই এখলাছে পরিপূর্ণ।

আমি যে কয়টি কাহিনী বলিলাম, সবগুলি স্মরণ রাখুন। এরূপ ব্যক্তিদের সংসর্গ ভাগ্যে জুটিলে সুবর্ণ-সুযোগ ভাবিয়া তাহা দ্বারা উপকৃত হউন। তখন আপনিও এসব বিষয় পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই ওয়াযে আমি এখলাছের স্বরূপ, তরীকা ও উহা লাভ করিবার উপায় বর্ণনা করিলাম। এখন এইগুলি পালন করা আপনাদের কর্তব্য। খোদার নিকট দো'আ করুন, তিনি যেন আমল করার তওফীক দান করেন। আমীন!

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

— ■ —

www.almodina.com

# ধর্মের ব্যাখ্যা

■

(এই ওয়াযের মূল আলোচ্য বিষয় ঈমান ও আমল। ২৩ শে মোহর্‌রম ১৩৩১ হিজরীতে গাজীপুর জামে মসজিদে শহরবাসীদের অনুরোধে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা তিন ঘন্টা ৪৩ মিনিটে শেষ হয়। মাওলানা ছায়ীদ আহ্‌মদ থানভী ইহা লিপিবদ্ধ করেন, হযরত মাওলানা যফর আহমদ ওসমানী সাহেব পাণ্ডুলিপি ব্যাখ্যাসহ ইহাকে সাজাইয়া লেখেন।)

প্রত্যেক শক্তিই সীমাবদ্ধ, তেমনি মানুষের বিবেকও সীমাবদ্ধ। যে পর্যন্ত বিবেক কাজ দিতে পারে, সে পর্যন্ত উহা দ্বারা কাজ নিন। যেখানে উহা কার্যক্ষম নহে, সেখানে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া শরীঅতের হুকুমের অনুসরণ করুন। শরীঅতের ব্যাপারে বিবেক শুধু মূলনীতি বুঝার কাজে সহায়ক হয়। শাখা মাসআলাসমূহে বিবেক একা কার্যক্ষম নহে। সেখানে ওহীর সাহায্য গ্রহণ করুন। নতুবা স্মরণ রাখিবেন, আপনি সারা জীবনেও সঠিক পথের সন্ধান পাইবেন না। কেননা, 'সামইয়্যাহ্‌' অর্থাৎ, বিবেক-বহির্ভূত বিষয়সমূহে রাসূল (দঃ)-এর অনুসরণ করা অত্যাবশ্যকীয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

আয়াতের অনুবাদ—"নিশ্চয়ই, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, অচিরে দয়াময় আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করিবেন।"

## ভূমিকা

বন্ধুগণ! গতকল্য এই আয়াত সম্বন্ধেই বর্ণনা করা হইয়াছিল। আয়াতের বিষয়বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ভাগ সম্বন্ধে গতকল্য বিস্তারিত বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের বর্ণনা

বিস্তারিত না হইলেও মোটামুটি যে হয় নাই তাহা নহে। ঐ বর্ণনা যদিও পুরাপুরি তৃপ্তিদায়ক নহে, তবুও উহাকে যথেষ্ট মনে করা চলে। এমন কি এই সম্বন্ধে অদ্য বর্ণনা না করিলে চলিত। কেননা, এই বিষয়ে একটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতি বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তা সত্ত্বেও এখন সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি বিষয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

"কিঞ্চিৎ" বলার কারণ এই যে, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য এই রকম একটি সভা যথেষ্ট নহে। হুযূর (দঃ) দীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই কাজের জন্য হুযূর (দঃ)-এর এন্তেকালের পরও আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে ধর্মের বাহক পয়দা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদাই ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। "খায়রুল কুরূন" অর্থাৎ, তৃতীয় যুগে—যাহা তাবে' তাবেঈনের যুগ—মুজতাহিদ ইমামগণ এই যুগেই পয়দা হইয়াছিলেন। এই যুগ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাখ্যাও চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। (সুতরাং যে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, উহাকে একটি মাত্র সভায় কিরূপে পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়?)

**"তাফরী" (বিকেন্দ্রীকরণ) ও "তাজদীদ" (সংস্কার)-এর স্তরঃ** মুজতাহিদগণের পর দুইটি স্তর বাকী রহিয়াছে। একটি মাসআলাসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থাৎ, তাঁহাদের নির্ধারিত নিয়ম-কানূন অনুসরণ করিয়া নিত্যনূতন খুঁটিনাটি মাসআলাসমূহের সমাধান বাহির করা। এই কাজটি এল্‌ম ও জ্ঞান বৃদ্ধি সাপেক্ষ। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ এজতেহাদের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার কারণ এই নয় যে, তাঁহার অনুগ্রহ ধারা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে (মা'আযাল্লাহ্); বরং কোন জিনিসের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়াই তাঁহার চিরন্তন রীতি। এজতেহাদকারী মনীষীবৃন্দের এন্তেকালের পর এজতেহাদের প্রয়োজনও শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি উহা আর বাকী রাখেন নাই। তবে বিকেন্দ্রীকরণের আবশ্যকতা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে। তাই মুজতাহেদীনের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী খুঁটিনাটি মাসআলাসমূহ বাহির করার উপযোগী জ্ঞানও কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকিবে। এই কারণে প্রত্যেক যুগেই এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন জ্ঞানী লোকের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা নূতন নূতন মাসআলাসমূহের সমাধান বাহির করেন। তাঁহারা এ ব্যাপারে মুজতাহেদীনের নির্ধারিত নিয়ম-কানূন অবলম্বন করিয়াই এই প্রকার এজতেহাদ করিয়া থাকেন।

তাছাড়া প্রত্যেক যুগে সত্যকে অসত্য হইতে পৃথককরণের প্রয়োজনও বাকী রহিয়াছে। কারণ, নবুওতের যমানা ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া পড়ার ফলে মানুষের মন হইতে প্রায়ই সত্য ও অসত্যের পরিচয় লোপ পায়। ইহা জনসাধারণের অজ্ঞতা কিংবা স্বার্থপর আলেমদের কারণে হইয়া থাকে। এমনি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা একজন সর্বজনমান্য মনীষী আবির্ভূত করেন। তিনি সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করত 'ছেরাতুল মোস্তাকীম' (সোজা পথ) দেখাইয়া দেন। ইহাই সংস্কারের স্তর। এ সম্বন্ধে হাদীসে নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছেঃ

اِنَّ اللهَ يَبْعَثُ فِىْ اُمَّتِىْ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِأَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا *

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে প্রতি শতাব্দীর পর একজন মনীষী প্রেরণ করেন। তিনি ধর্মের সংস্কার সাধন করেন।" অর্থাৎ, হককে বাতেল হইতে পৃথক করিয়া দেন।

হযরত (দঃ)-এর পর প্রতি শতাব্দীতেই কোন না কোন মুজাদ্দেদ (সংস্কারক) আগমন করিয়াছেন।

উপরোক্ত দুইটি স্তর (তাফরী ও তাজদীদ) এখনও কার্যক্ষম আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। এই দুইটি পৃথক পৃথক কাজ। হাঁ, যদি কেহ উভয় গুণেই গুণান্বিত হন, তবে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ বৈ কিছুই নহে।

**ব্যাখ্যার স্তর ঃ** বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যার স্তর এমনভাবে বর্ণনা করা যায়, যাহা বোধগম্য নহে। তবে ইহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই। কারণ, যাহা সকলে বুঝিতে না পারে, তাহা নিরর্থক বৈ কিছুই নহে। অপর দিকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহা একটি মাত্র সভায় সম্ভব হইতে পারে না। তাই আমি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার কথা বলিয়াছি। অদ্য আমি যে ব্যাখ্যা দিতে মনস্থ করিয়াছি, উহাকে পূর্ণ ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিলে মোটামুটি ব্যাখ্যা বলা চলে। আবার আমার পূর্বেকার বর্ণনার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ইহাকে ব্যাখ্যা আখ্যা দেওয়া যাইবে। এই কারণেই আমি গতকল্যকার বর্ণিত আয়াতখানিকেই আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। গতকল্যকার মোটামুটি বর্ণনা হয়তো অদ্য কাহারও মনে না-ও থাকিতে পারে। তাই উহা আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। গতকল্য দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন বন্ধুত্বের বুনিয়াদ ঈমান ও নেক আমলের উপর রাখিয়াছেন। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকেই আমি উহা লাভ করার উপায় বলিয়াছিলাম। ধর্মীয় জ্ঞান দুই প্রকারে অর্জন করা যায়। (১) শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ দ্বারা; কিংবা (২) আলেমদের সহিত মেলামেশা করত তাহাদের উপদেশাবলী শ্রবণ দ্বারা। সুতরাং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গতকল্য বিস্তারিত বর্ণনা না হইলেও এমন পন্থা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদ্দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা লাভ করা যাইতে পারে। এই দিক দিয়া আমার গতকল্যকার বর্ণনা পূর্ণাঙ্গই ছিল। কারণ, অবোধ্য বর্ণনা উহাকে বলে—যাহাতে বক্তব্য পরিস্ফুট হয় না। আমার বর্ণনা এরূপ ছিল না। উহাতে আসল বক্তব্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অদ্য বর্ণনা না করিলেও আলোচ্য বিষয়ের কোন অংশ অবোধ্য থাকিত না। হাঁ, আয়াতের প্রথম অংশটির ন্যায় দ্বিতীয় অংশটির ব্যাখ্যা হয় নাই। খোদা তা'আলা যখন সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন, তখন ইহারও ব্যাখ্যা করিয়া দিতে চাই। আজিকার বক্তব্যের ইহাই সারাংশ। ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক কাম্য বস্তুর মধ্যেই দুইটি বিষয় নিহিত থাকে। একটি স্বয়ং কাম্য বস্তু ও অপরটি উহা লাভ করার উপায়। উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধুত্বের বুনিয়াদ ঈমান ও নেক আমলের উপর রাখিয়াছেন। এখানেও দুইটি বিষয় আছে। একটি কাম্যবস্তু। আয়াতের سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا অংশে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অপরটি উপায়। অর্থাৎ, ঈমান ও নেক আমল। ইহার বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অংশে নিহিত আছে। গতকল্যকার আলোচনায় কাম্য বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। অদ্য উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা হইবে। কাম্যবস্তু স্বয়ং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিষয় অর্থাৎ বন্ধুত্ব। ইহার সমুদয় প্রকারভেদ বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। আমরা খোদার বন্ধু হইয়া যাইব—এতটুকু মনে করিয়া লইলেই যথেষ্ট। যে খোদার বন্ধু হইয়া যায়, সে সৃষ্ট জগতের বন্ধু হইয়া যায়। যাক, এই আলোচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ছিল না। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ পারলৌকিক ফলাফলের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই কারণে আমি বিষয়টি বিস্তারিত-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি।

**ধর্মের অমর্যাদা ঃ** টাকা-পয়সা লাভ হওয়াই সাধারণ লোকের মতে বড় লাভ। জনৈক কর্মচারী তাহার নামাযী স্ত্রীকে বলিত, "তুমি নামায পড়িয়া কি পাইলে?"

www.almodina.com

কথিত আছে, কবি সওদা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিতে লাগিল, "তুমি নামায কি উদ্দেশ্যে পড়?" স্ত্রী বলিল, "জান্নাত লাভের জন্য।" ইহা শুনিয়া সওদা বলিল, দূর বাউলী, তুই সেখানেও গরীব, মোল্লা, তালেবে এল্‌ম ও জোলাদের সাথে থাকিবে। দেখ, আমি জাহান্নামে যাইব। সেখানে বড় বড় বাদশাহ্, উযীর, নাযীর ও আমীরগণ থাকিবেন। যেমন, ফেরআউন, হামান, নমরূদ, শাদ্দাদ, কারূণ প্রভৃতি।

ইহা শুধু সওদারই কথা নহে, আজকাল গভীরভাবে যাচাই করিলে দেখা যায় যে, মানুষের অন্তরে এক হাজার টাকার যে পরিমাণ মর্যাদা উহার অর্ধেকও ধর্মের মর্যাদা নাই। পারলৌকিক ফলাফলের মোটেই গুরুত্ব নাই। অথচ ইহার মূল্য অপরিসীম। কবি বলেনঃ

قیمت خود هر دو عالم گفتۂ ـ نرخ بالا کن که ارزانی هنوز

(কীমতে খোদ হারদু আলম গুফতায়ী + নরখ বালা কুন কেহ্ আরযানী হনূয)

অর্থাৎ, উহার মূল্য হিসাবে উভয় জাহানও খুব কম। ইহাতে বুঝা যায় যে, পারিশ্রমিক লইয়া তারাবীহ্‌র নামাযে যাহারা কোরআন শুনায় ইহাতে শাস্ত্রগত গোনাহ্ ব্যতীত অবমাননাও কতটুকু যে, তাহারা খোদার অমূল্য কালাম সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুনাইয়া ফিরে। বলিতে কি, সস্তায় পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা কোরআনকে তেমন মর্যাদা দেই না। এই অমূল্য ধন লাভ করিতে আমাদের বেশী কিছু খরচ করিতে হয় না। মাওলানা রূমী বলেনঃ

اے گراں جاں خوار دیدستی مرا ـ زانکه بس ارزاں خریدستی مرا

(আয় গেরাঁ জাঁ খার দীদাস্তী মরা + যাঁকেহ্ বস্ আরযাঁ খরিদাস্তী মরা)

"কোরআন নিজেই বলে—আমাকে লাভ করিতে তোমাদের কিছুই মূল্য দিতে হয় নাই, এই কারণেই তোমরা আমাকে অমর্যাদার চোখে দেখিয়া থাক।"

হযরত ইব্‌রাহীম ইবনে আদ্‌হাম (রঃ) কোন ফকিরকে দারিদ্র্যের অভিযোগ করিতে শুনিলে বলিতেন, মিয়া! তুমি দারিদ্র্যের মূল্য কি বুঝিবে? ঘরে বসিয়া বিনা কায়ক্লেশে ইহা লাভ করিয়াছ কিনা? ইহার মূল্য আমাকে জিজ্ঞাসা কর, বিরাট সাম্রাজ্যের বিনিময়ে আমি ইহা ক্রয় করিয়াছি।

আমরাও পিতা-মাতার নিকট হইতে ঈমানরূপ ধন লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের মোটেই পরিশ্রম করিতে হয় নাই। ফলে আমরা ইহাকে তেমন মর্যাদা দেই না। নতুবা খোদার নামের সম্মুখে সারা জাহানও অতি নিকৃষ্ট। কেননা, ইহার বদৌলতেই জান্নাতের রাজত্ব লাভ হইবে। জান্নাতের রাজত্বের মোকাবেলায় দুনিয়ার হাজার রাজত্বও মূল্যহীন ধুলিকণার ন্যায়। দুঃখের বিষয়, আজকাল দুই পয়সার বরাবরও খোদার নামকে মূল্য দেওয়া হয় না। উপরোক্ত অফিসার ব্যক্তি কর্তৃক আপন স্ত্রীকে 'নামাযে কি লাভ হইল' জিজ্ঞাসা করার কারণ ইহাই। তাহার মতে টাকা-পয়সা লাভ হওয়াই একমাত্র লাভ হওয়া।

জনৈক অফিসার ব্যক্তি দেদার ঘুষ খাইতেন। আবার নামাযের প্রতিও তাহার নিষ্ঠার অন্ত ছিল না। ফজরের নামাযের পর এশরাক পর্যন্ত তিনি ওযীফা পাঠ করিতেন। মকদ্দমায় জড়িত লোকদের সহিত ঘুষের পরিমাণ সাব্যস্ত করার সময়ও ছিল ইহাই। সংশ্লিষ্ট লোকগণ তাহার নিকট আসিলে ইশারা ইঙ্গিতে ঘুষের কথাবার্তা চলিত। কেননা, তাহার পীর তাহাকে ওযীফা পাঠকালে কথাবার্তা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি ইশারায় একশত টাকা বলিলে তিনি দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া দিতেন। অর্থাৎ, দুই শত টাকা লইব। শেষ পর্যন্ত ইশারাতেই কোন একটি

www.almodina.com

অঙ্ক সাব্যস্ত হইয়া গেলে তিনি জায়নামাযের কোণ উঠাইয়া দিতেন। অর্থাৎ, টাকা এখানে রাখিয়া দাও। এই ব্যক্তি চলিয়া গেলে অন্য ব্যক্তি আসিত এবং এইরূপে ইশারায় কথাবার্তা চলিত। এরূপে এশরাকের নামায পর্যন্ত তিনি কয়েক শত টাকা লইয়া জায়নামায ত্যাগ করিতেন।

সত্য বলিতে কি, আজকাল পাওয়া বলিতে ইহাই বুঝায়। ওযীফাও এই কারণেই পড়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেহ কেহ কোরআন পাঠকালে কথা বলিয়া ফেলে, কিন্তু ওযীফা পাঠ করার সময় কথা বলাকে খুবই পাপ কাজ মনে করে। তাহাদের মতে কোরআনের গুরুত্ব (নাঊযুবিল্লাহ্) ওযীফারও সমান নহে। কোরআনের একি অমর্যাদা!

এই অজ্ঞানতার আরও একটি লক্ষণ এই যে, তাহাদের ধারণায় হাদীস ও কোরআনে বর্ণিত দো'আসমূহের ঐ মর্যাদা নাই, যাহা পীর-তনয়দের তৈরী দো'আর রহিয়াছে। আমি যখন হজ্জে গিয়াছিলাম, তখন কানপুর মাদ্রাসায় আমার স্থলে পড়াইবার জন্য আমারই জনৈক বাল্যকালীন উস্তাদ তশরীফ আনিয়াছিলেন। তথায় এক দিন এক ব্যক্তি তাহাকে ঋণমুক্তির জন্য ওযীফা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটি দো'আ বলিয়া দিলেন। লোকটি খুব আগ্রহ সহকারে উহা মুখস্থ করিল। আগ্রহ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উস্তাদ সাহেব আরও বলিয়া দিলেন যে, এই দো'আটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার এই এই ফযীলত। ইহা শুনা মাত্রই লোকটির মুখ অরুচিতে ভরিয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, "জনাব, আমি এমন ওযীফা চাই, যাহা আপনি অন্তর পরম্পরায় (সিনা ব-সিনা) প্রাপ্ত হইয়াছেন। হাদীসের দো'আ তো সকলেই জানে এবং পাঠ করিয়া থাকে।" এইরূপেই আজকাল মানুষ অবহেলা করিয়া থাকে।

এক ব্যক্তি স্বয়ং আমাকে জানাইয়াছে যে, তাহার নামায মাঝে মাঝে কাযা হইয়া যায়; কিন্তু পীরের দেওয়া ওযীফা কখনও কাযা হয় না। চরম আশ্চর্যের ব্যাপার বটে। একে তো ধর্মের প্রতি মনোযোগই নাই, যা আছে, তাহাও আবার এমনি রূপধারী।

পূর্ব বর্ণিত অফিসার ব্যক্তিকে তাহার পীর ওযীফার সময় কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই কারণে ওযীফার সময় কথা বলা তাহার মতে খুবই অন্যায় কার্য ছিল; কিন্তু ঘুষ গ্রহণ একেবারেই অন্যায় ছিল না। সম্ভবতঃ বেশী পরিমাণে ঘুষ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি ওযীফা পাঠ করিতেন। ঘুষের জন্য না হইলেও আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়া লাভের নিমিত্ত ওযীফা পাঠ করা হয়। মালে বরকত, চাকুরী লাভ, ঋণমুক্তি ইত্যাদি কারণে ব্যাপকভাবে ওযীফা পাঠ করা হয়। খুব কম লোকই খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ওযীফা পড়ে। দুনিয়া লাভের জন্য ওযীফা পাঠ করা না-জায়েয—আমি একথা বলি না। তবে আমি একথা নিশ্চয়ই বলিব যে, দুনিয়া লাভের জন্য যদি ৪০ বার ওযীফা পাঠ কর, তবে আখেরাতের জন্য অন্ততঃ ৪ বারই কোন ওযীফা পড়িয়া লও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আখেরাতের মোটেই চিন্তা নাই।

**দো'আ ও ওযীফার পার্থক্যঃ** আপনারা যখন ধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিবেন, তখন আমি বলিবঃ

از خدا غیـر خدا را خواسـتـن ـ ظن افـزونـی ست کلی کاسـتـن

(আয খোদা গায়র খোদা রা খাস্তান + যন্নে আফযূনীস্ত কুল্লী কাস্তান)

অর্থাৎ, খোদার নিকট খোদা ব্যতীত অন্য বস্তু যাচ্ঞা করা প্রকৃতপক্ষে নীচতা। সুতরাং খোদার নিকট দুনিয়া চাওয়া নিঃসন্দেহে নীচ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। তবে দুই উপায়ে দুনিয়া

www.almodina.com

চাওয়া যাইতে পারে। (১) দো'আর মাধ্যমে দুনিয়া চাওয়া ইহা নিন্দনীয় নহে; বরং ইহাতে দাসত্বের শান প্রকাশ পায়। (২) ওযীফার মাধ্যমে দুনিয়া তলব করা। ইহা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। দো'আর মাধ্যমে চাওয়ায় দীনতা ও হীনতার ভাব ফুটিয়া উঠে। এই ভাবটি বন্দা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অনুকূলে। বন্দা সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ "একমাত্র এবাদতের জন্যই আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি" আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ "দো'আ এবাদতের মূল বস্তু।" এবাদতকে 'আসল উদ্দেশ্য' বলিতে যাইয়া আমি 'আসল' শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়াইয়াছি। নতুবা দুনিয়ার অন্যান্য কাজ কারবার না-জায়েয বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত। অথচ উহা শুধু জায়েযই নহে; বরং প্রকারান্তে উদ্দেশ্যও বটে। তবে আসল উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার অধীন।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। মনে করুন, কোন খাদ্য পাকাইতে পাঁচ টাকা খরচ লাগে। এক টাকার ঘি, এক টাকার আটা, এক টাকার মাংস, আট আনার মসলা, চারি আনার খড়ি, চারি আনা বাবুর্চির মজুরী ইত্যাদি। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, খড়ি খাদ্যবস্তু নহে। সুতরাং ইহাকে খাদ্যের তালিকায় উল্লেখ করা হইল কেন? এমতাবস্থায় আপনি কি উত্তর দিবেন? নিশ্চয়ই ইহাই বলিবেন যে, খড়ি যদিও উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যের অধীন। এই কারণে ইহাকেও উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য করা হইবে। আখেরাতের সহিত দুনিয়ার সম্বন্ধও এই প্রকার। সুতরাং দুনিয়ার কাজ কারবার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও আসল হিসাবে নহে; বরং অধীন হইয়া।

সুতরাং কেহ শুধু দুনিয়া উপার্জনের মধ্যেই লাগিয়া থাকিলে তাহাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় মনে করা হইবে—যে খড়ি আনিয়া ঘর বোঝাই করিতেছে, কিন্তু খাদ্য পাকায় না এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ও করে না। এরূপ ব্যক্তিকে কেহ বুদ্ধিমান বলিবে কি? কখনই নহে। অতএব, শুধু দুনিয়া উপার্জনেই মগ্ন থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। আবার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর খড়ি যোগাড় না করিলে যেমন খাওয়া যায় না, তদ্রূপ শুধু ধর্মকর্মে মশ্‌গুল থাকা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে দুনিয়ার চিন্তা না করাও কাম্য নহে। ধর্মকে যথাযথ বুঝিয়া উহাতে বেশী মনোযোগ দেওয়া এবং দুনিয়ারও সামান্য খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন, বৎসরে যে পরিমাণ জিনিস-পত্রের প্রয়োজন, তাহা যোগাড় করিয়া লওয়া উচিত। কেননা, কথায় বলে, اَلضَّرُوْرَةُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَتِ "প্রয়োজন, প্রয়োজন মাফিক মিটাইতে হয়।" এক বৎসরের জিনিস-পত্র দ্বারা প্রয়োজন মিটিয়া যায়। অতএব, এর বেশী চিন্তা করা উচিত নহে।

লোকে বলে, মৌলবী সাহেবান দুনিয়া ত্যাগ করিতে বলেন। ইহা নিছক ভুল। তাঁহারা দুনিয়া ত্যাগ করিতে বলেন কোথায়; বরং তাঁহারা তো দুনিয়াকে ধর্ম লাভের উপায় বলিয়া থাকেন। ব্যবধান এতটুকু যে, আপনারা দুনিয়াকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করিয়া লইয়াছেন। আমি ইহাকে প্রয়োজনের বেশী জরুরী মনে করি না। সুতরাং বুঝা গেল, আসল উদ্দেশ্য আখেরাত এবং দুনিয়া ইহার অধীন। এই কারণেই আমি "আমি" শব্দটি বাড়াইয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য এবাদত বলিয়াছিলাম।

এখন বুঝুন, দীনতা ও হীনতা প্রকাশ দো'আর বৈশিষ্ট্য। এই কারণে দুনিয়া লাভের জন্য ইহা জায়েয। পক্ষান্তরে ওযীফার মধ্যে এই বিষয়টি নাই। ফলে ইহা নিন্দনীয়।

দো'আর স্বরূপ অর্থাৎ, হীনতা ও দীনতা প্রকাশ এবাদতের প্রাণ। কোন সরল প্রাণ ব্যক্তি কোন বাদশাহ্ বা আমীরকে দো'আ করিতে দেখিলে এবং তাহার মুখনিঃসৃত বিনয় ও দীনতাসূচক

বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকে না যে, এত বড় বাদশাহ্ হইয়াও সে কত অভাবগ্রস্ত!

কথিত আছে, বাদশাহ্ আকবর একদা শিকারে রাস্তা ভুলিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া যান। তথায় জনৈক গ্রাম্য জমিদার বসবাস করিত। সে বাদশাহ্‌কে চিনিতে না পারিলেও স্বীয় ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিল। ইহাতে আকবর খুবই প্রীত হইলেন। কিছুক্ষণ পর লস্করও বাদশাহ্‌কে তালাশ করিতে করিতে তথায় পৌঁছিয়া গেল। লস্কর দেখিয়া গ্রাম্য জমিদারের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আগন্তুক ব্যক্তি স্বয়ং বাদশাহ্ আকবর। বিদায়-কালে আকবর তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া বলিলেন, "ইহা শেষ হইয়া গেলে দিল্লীতে আমার নিকট চলিয়া যাইও।" এদিকে বাদশাহ্ দারোয়ানদিগকেও এই ব্যক্তিকে বাধা দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

একবার এই ব্যক্তি দিল্লী পৌঁছিলে তাঁহাকে বাদশাহ্‌র মহলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। ঘটনাক্রমে বাদশাহ্ তখন নামাযে রত ছিলেন। বাদশাহ্‌কে নামায পড়িতে দেখিয়া গ্রাম্য ব্যক্তির বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এত বড় বাদশাহ্ হইয়াও তিনি কাহার সম্মুখে মাথা নত করেন। নামাযান্তে বাদশাহ্ যখন হাত উঠাইয়া দো'আ করিতে লাগিলেন, তখন গ্রাম্য ব্যক্তি আরও আশ্চর্যান্বিত হইল। তিনি কাহার নিকট ভিক্ষা চাহেন। দো'আ সমাপ্ত হইলে বাদশাহ্ তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "হুযূর, আপনি কাহার সম্মুখে নত হইয়াছিলেন এবং জোড়হাতে ভিক্ষা মাগিতেছিলেন?" আকবর বলিলেন, "আমি খোদার এবাদত করিতেছিলাম এবং তাঁহাকে আপন অভাব অভিযোগ জানাইতেছিলাম।" ইহা শুনামাত্রই গ্রাম্য ব্যক্তি ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া বলিতে লাগিল, "খোদা আপনার অভাব পূর্ণ করিতে পারিলে কি আমার অভাব পূর্ণ করিতে পারিবেন না? কাজেই আমি আপনার নিকট কিছুই চাহিব না। যাহা চাহিবার খোদার নিকটই চাহিব।"

বন্ধুগণ, এই হইল দো'আর স্বরূপ। ইহাতে পরিষ্কার দীনতা ও হীনতা ফুটিয়া উঠে; ওযীফায় ইহা নাই। (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওযীফা পাঠকারী মনে করে যে, ওযীফার জোরেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় দীনতা ও নম্রতা কোথায়? সুতরাং দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে ওযীফা পাঠ করা ও দো'আ করা উভয়টি সমান নহে।)

**দো'আর নিয়ম ঃ** "আমাকে একশত টাকা দাও" এই বলিয়া কেহ খোদার নিকট দো'আ করিলে তাহাও জায়েয হইবে এবং ইহাতেও আখেরাতের জন্য দো'আ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাইবে। কারণ, এক্ষেত্রেও দীনতা ও হীনতার ভাব বিদ্যমান আছে। তবে না-জায়েয কাজের জন্য দো'আ না করা চাই। দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন দো'আই জায়েয হইবে এরূপ নহে। যেমন, না-জায়েয চাকুরীর জন্য দো'আ করা জায়েয নহে। যে দো'আ শরীঅতসম্মত, শুধু তাহাই জায়েয।

উদাহরণতঃ, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তহ্‌শীলদারী চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করা এবং ডাকাতির অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত করা উভয় দরখাস্তই কি সমান? ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং যে কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, উহার জন্য তাঁহার নিকট দরখাস্ত এবং তাঁহাকে ইহা লাভের মাধ্যম বানানও নিষিদ্ধ হইবে। তেমনি যেসব দো'আ শরীঅতের গণ্ডীর বাহিরে, উহা তো পছন্দনীয়ই নহে, আবার উহা খোদার দরবারে পেশ করা কিরূপে জায়েয হইতে পারে? দুঃখের বিষয়, দো'আ শরীঅতসম্মত কিনা, আজকাল সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করা হয় না।

বাস্তবিকই আমরা খুব উদাসীনতার মধ্যে পড়িয়া আছি। ইহার প্রধান কারণ অশিক্ষা। মাঝে মাঝে আমরা খোদার অপছন্দনীয় বিষয় খোদার নিকট যাচ্ঞা করি। বর্তমানে অনেক না-জায়েয চাকুরী প্রচলিত আছে। এইগুলি লাভ করার জন্যও দো'আ করানো হয়। লাভ হওয়ার পর মোবারকবাদ দেওয়া হয়। আফসোস, কত বিষয়ের সংশোধন করা যায়।

تن همه داغ داغ شد پنبه كجا كجا نهم *

সারা শরীরই ক্ষত-বিক্ষত, পট্টি কোথায় দিব?

বিপদ এই যে, না-জায়েয চাকুরীর জন্য বুযুর্গদের নিকট যাইয়া দো'আ করানো হয়। আরও সর্বনাশা ব্যাপার এই যে, মৃতব্যক্তিদের কবরে যাইয়া বলা হয়, "আপনি আমার অমুক কাজটি করিয়া দিন।" কোনকিছু করার সমস্ত ক্ষমতা যেন তাহাদের হাতেই।

হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান সাহেবকে একদা এক ব্যক্তি বলিল, " হুযূর, আমার এই কাজটি করিয়া দিন।" শাহ্ সাহেব রাগান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন, এই মোশ্‌রেককে এখান হইতে তাড়াইয়া দাও। সে আমাকে কাজ করিয়া দিতে বলে। আরে মিয়া, তোমার কাজ করিয়া দেওয়ার কি অধিকার আমার আছে? আজকাল মানুষের ধারণা যে, যাহারা তাস্‌বীহ্‌র মালা জপ করে, তাহারা খোদার আত্মীয়, তাহারা কোনকিছু বলিয়া দিলে তাহা অখণ্ডনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ *

"হে গ্রন্থধারিগণ! ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না।" ইহাতে ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং খোদার ওলীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা যদিও জরুরী এবং ইহা ধর্মীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহাতে এমন বাড়াবাড়ি করা যাহাতে খোদার মানহানি ও শির্‌ক হইতে পারে কিছুতেই উচিত নহে।

মনে করুন, ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে পৌঁছিয়া সেরেস্তাদারকেও সালাম করিলে তেমন দোষের কথা হইবে না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত যাহা বলা উচিত, তাহা সেরেস্তাদারের সহিত বলিলে গুরুতর অন্যায় হইবে। যেমন, কেহ বলিল, "সেরেস্তাদার সাহেব, বস্, আপনার হাতেই সবকিছু, আপনি যাহা চাহেন, করিতে পারেন।" এরপর ম্যাজিস্ট্রেটকে যেরূপ সম্মান করা উচিত সেরেস্তাদারকেও সেইরূপ সম্মান করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করি, ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কি? নিশ্চয়ই, তাহাকে দরবার হইতে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবেন। সেরেস্তাদার সাহেবও তাহার এই সম্মান প্রদর্শন পছন্দ করিবেন না। (কোন সেরেস্তাদার ইহা পছন্দ করিলে, সে-ও দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইবে।)

এখন বলুন, খোদার সহিত যে ব্যবহার করা উচিত, তাহা অন্যের সাথে করা কিরূপে শোভনীয় হইতে পারে? খোদা অবশ্যই ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। যে বুযুর্গের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হয়, তিনিও অসন্তুষ্ট না হইয়া পারেন না। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও মানুষ বুযুর্গদের মাযারে পৌঁছিয়া অনর্থক আবদার জানাইয়া তাঁহাদিগকে দুঃখিত করে। না-জায়েয চাকুরীর জন্য জীবিত ও মৃত উভয় প্রকার বুযুর্গদিগকে বিরক্ত করে। জীবিতদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। তিনি মুখের উপর বলিয়া দেন যে, তিনি না-জায়েয চাকুরীর জন্য দো'আ করিবেন না। এরূপ বুযুর্গকে 'বদমিযাজ' 'কঠোর প্রকৃতি' ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। অধিকাংশ বুযুর্গ চরিত্র

www.almodina.com

প্রদর্শন হেতু দো'আর ওয়াদা করেন। তাঁহাদিগকে খুবই চরিত্রবান গণ্য করা হয়। আজকালকার বিবেকপূজারীদের মতে আলেমদের আচরণ এরূপই হওয়া উচিত। ইহার অর্থ তো তাহাই হইল যে, আলেমগণ সত্য প্রকাশ হইতে বিরত থাকেন।

এই শ্রেণীর বুযুর্গ স্বীয় চরিত্র গুণে অস্পষ্ট ওয়াদা করেন। তাঁহারা আসলে কি দো'আ করেন, তাহা অন্যেরা জানে না। নির্জনে তাঁহাদের দো'আ শুনিলেই ইহা বুঝা যাইবে; কেহ কেহ নির্জনে খোদার সম্মুখেও সদাচার প্রদর্শন পূর্বক অস্পষ্ট দো'আ করেন। কিন্তু ইহারা মুহাক্কেক নহেন। অধিকাংশ বুযুর্গই নির্জনে এইরূপ দো'আ করেন—"হে খোদা! এই চাকুরী যদি শরীঅতসম্মত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, তবে উহা তাহাকে মিলাইয়া দাও। অন্যথায় কখনও দিও না।"

একবার মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান সাহেবের খেদমতে এক ব্যক্তি আরয করিলঃ "হুযূর আমার মোকদ্দমার জন্য দো'আ করুন।" ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতিপক্ষও উপস্থিত হইয়া দো'আর দরখাস্ত পেশ করিল। এখন এই উভয় সংকটের সমাধান যে কেহ করিতে পারে না। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়াই এক পক্ষকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও অপর পক্ষকে ওয়াদা দান অসঙ্গত ছিল, আর উভয় পক্ষের জন্য ওয়াদা করার উপায় বাকী ছিল? হাঁ, খোদা যাহাকে আধ্যাত্মিক নূর দান করেন, তিনিই এ সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। শাহ্ সাহেব তৎক্ষণাৎ এইরূপ দো'আ করিলেনঃ হে খোদা! "হকদারকে তাহার হক পৌঁছাইয়া দাও।" এইভাবে উভয় পক্ষের বাসনা পূর্ণ হইয়া গেল।

শাহ্ সাহেব প্রকাশ্য মজলিসে দো'আ করিলেন। অন্যান্য বুযুর্গগণও প্রকাশ্যে যে ওয়াদাই করুন না কেন, নির্জনে তাঁহারা উপরোক্তরূপ দো'আই করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা শরীঅত-বিরুদ্ধ না হইলে তাহা পূর্ণ করিয়া দাও, নতুবা পূর্ণ করিও না। কারণ, তাঁহারা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কাজেই খোদার পছন্দের খেলাফ কোন দো'আ তাঁহারা কিরূপে করিতে পারেন? সাধারণ লোক খোদার সম্মুখে অনেকটা খোলাখুলিভাবে আরয করিতে পারে। (যেমন, অনেক গ্রাম্য ব্যক্তি পদস্থ অফিসারদের সহিত অকপট হইয়া কথাবার্তা বলিয়া ফেলে।) কিন্তু বুযুর্গগণ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। না-জায়েয কাজের জন্য দো'আ করা দূরের কথা— জায়েয কাজের দো'আ করার বেলায়ও তাঁহাদের অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপঃ

أُحِبُّ مُنَاجَاةَ الْحَبِيْبِ بِأَوْجُهٍ ـ وَلٰكِنَّ لِسَانَ الْمُذْنِبِيْنَ كَلِيْلُ

"প্রেমাস্পদের সহিত বহু প্রকারে কানাকানি করিতে চাই; কিন্তু পাপের কারণে রসনা বিকল হইয়া পড়ে।"

বুযুর্গগণ খোদার নিকট বহু কিছু আরয করিতে চান; কিন্তু আপন পাপরাশির কল্পনা মানস-পটে উদয় হওয়ার কারণে মুখ হইতে কিছুই বাহির হয় না। মাগ্ফেরাতের দো'আ পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এই দো'আর বেলায়ও পাপের কল্পনায় তাহাদের জিহ্বা অচল হইয়া পড়ে। শরীঅতে দো'আ করার নির্দেশ আছে বলিয়াই তাঁহারা দো'আ করেন। তাঁহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেনঃ "খোদার সহিত লজ্জা কিসের? আমরা নাপাক এ কারণে তাঁহার দরবারে কোনকিছু আরয করিবার উপযুক্ত নহি—ইহাই হইতেছে লজ্জার কারণ। কিন্তু দূরে দূরে থাকিলে পাক হইবে কিরূপে? তাঁহার দরবারে হাযির না হইলে পাক হওয়া অসম্ভব। আগে

পাক হইয়া পরে দরবারে হাযির হওয়া অবান্তর ধারণা বৈ কিছুই নহে। এই কারণে বুযুর্গগণ লজ্জাশরম ত্যাগ করিয়া মনের উপর জোর দিয়া দো'আ করিয়া থাকেন।

মাওলানা রূমী (রঃ) একটি গল্প লিখিয়াছেনঃ জনৈক ব্যক্তি শরীরে নাজাছাত লাগা অবস্থায় নদীর পাড় দিয়া যাইতেছিল। নদী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আস, আমার ভিতরে চলিয়া আস।" সে উত্তর দিল, "আমি নাপাক আর তুমি পাক ছাফ। আমি তোমার নিকট কিরূপে আসিতে পারি? পাক হইয়া পরে আসিব।" নদী হাসিয়া বলিল, "ওহে বোকা, এই অবস্থায়ই আমার নিকট চলিয়া আসিলে তুমি পাক হইতে পারিবে। আমা হইতে দূরে থাকিয়া তুমি কিছুতেই পাক হইতে পারিবে না। একবার নাপাক অবস্থায়ই চলিয়া আস পরে পাক হইয়াও আসিতে পারিবে।" যে ব্যক্তি প্রথমে পাক হইয়া পরে পানির নিকট যাইবার অপেক্ষায় থাকে—সারা জীবনও পানির কাছে যাওয়া ভাগ্যে জুটে না।

**শয়তানী ধোঁকাঃ** বন্ধুগণ! খোদার দরবারে আসার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। সাংসারিক ঝামেলা হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে খোদার দরবারে আসার অপেক্ষায় থাকিলে সারা জীবন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না। ইহা শয়তানের ধোঁকা বৈ কিছুই নহে। সে জ্ঞানের আবরণ দ্বারা অজ্ঞানতায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। শয়তান সাধারণ লোকদিগকে এই নীতিকথা শিখাইয়া রাখিয়াছে যে, ছেলেমেয়ের বিবাহ-শাদী করাইয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে মনোনিবেশ করিও। এখন অন্তর দুনিয়ার আবর্জনায় কলুষিত। ইহা হইতে পবিত্র হওয়ার পর এই পথে পা বাড়ানো উচিত। এই শ্রেণীর লোকের ভাগ্যে আজীবন খোদার স্মরণ জুটে না। কারণ, খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপন না করা পর্যন্ত সাংসারিক মোহ ছিন্ন হইতে পারে না। দুনিয়ার কাজকর্মের অবস্থা হইল لَايَنْتَهِىْ اِرَبٌ اِلَّا اِلٰى اِرَبٍ অর্থাৎ, কোথাও ইহার শেষ নাই। এক কাজ শেষ হইলে অন্য কাজের সূচনা হইয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকদের অবস্থা হইলঃ

هرشبے گویم که فردا ترک ایں سودا کنم — باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم

(হর শবে গোইয়াম কেহ্ ফরদা তরকে ঈঁ সওদা কুনাম
বায চুঁ ফরদা শাওয়াদ ইমরূয রা ফরদা কুনাম)

"প্রতিদিন বলি যে, আগামী কল্য এই কাজ আর করিব না। কিন্তু আগামী কল্য আসিলে আবার ঐ কাজে লিপ্ত হইয়া যাই।" বন্ধুগণ! আপনারা বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন, ঐ অবস্থায়ই চলিয়া আসুন। নাপাক চলিয়া আসাই পাক হওয়ার নিয়ম। তাই কবি বলেনঃ

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ — گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
ایں درگه ما درگه نومیدی نیست — صد بار اگر توبه شکستی باز آ

(বায আ, বায আ, হার আঁচে হাস্তী বায আ + গর কাফের ও গব্রুও বুতপরস্তী বায আ
ঈঁ দরগাহে মা দরগাহে নাউম্মেদী নীস্ত + ছদ বার আগর তওবা শেকাস্তি বায আ)

"ফিরিয়া আস, ফিরিয়া আস। তুমি যাহাকিছুই হও ফিরিয়া আস। যদি কাফের, অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজারীও হও তবুও ফিরিয়া আস। আমার এই দরবার নৈরাশ্যের দরবার নয়। যদি একশত বারও তওবা লঙ্ঘন করিয়া থাক, তবুও ফিরিয়া আস।" ইনশাআল্লাহ্ খোদার দরবারে হাযির

www.almodina.com

হইলে এই আবর্জনার স্তূপ ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে এবং একদিন নৌকা কূলে পৌঁছিয়া যাইবে। অনেকে এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া বুযুর্গদের নিকট যায় না যে, দুনিয়ার এই পায়খানা লইয়া গেলে তাঁহারা কি মনে করিবেন?

বন্ধুগণ! এইরূপ কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান দিবেন না। বুযুর্গগণ খোদার চরিত্রে চরিত্রবান। তাঁহারা কোন আগন্তুককে নিকৃষ্ট মনে করেন না। তাঁহারা দোষ গোপনকারী ও উদার প্রাণ। নিজদিগকেই তাঁহারা সবচেয়ে বেশী নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা অন্যকে কিরূপে হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। আপনি সমস্ত নাপাকী লইয়া তাঁহাদের নিকট চলিয়া আসুন।

জনৈক ব্যক্তির অবস্থা যদিও আমি পছন্দ করিতে পারি নাই; কিন্তু উহার ভিত্তি অত্যন্ত চমকপ্রদ মনে হইয়াছে। লোকটি জৌনপুর হইতে আমার কাছে মুরীদ হইতে আসিয়াছিল। গোড়ালির নীচ পর্যন্ত পাজামা পরিহিত, দাড়ি মুণ্ডানো ও দীর্ঘগোঁপ অবস্থায় সে আমার নিকট পৌঁছিয়া নিজের সমুদয় অবস্থা আমাকে খুলিয়া বলিল। এর পর মুরীদ হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইল। আমি তাহাকে মাগরেবের পর সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম। সে দিন ছিল শুক্রবার। ভদ্রলোক সেদিনও উস্‌কো খুস্‌কো ক্ষৌরকার্য করিল। কিছু যে দাড়ি গজাইয়াছিল তাহাও মুণ্ডাইতে কসুর করিল না। আমার কাছে পৌঁছিয়াও সে পাপ কাজ ত্যাগ করিল না দেখিয়া আমি মনে খুব বিরক্তি অনুভব করিলাম। কিন্তু জুমার নামাযের পর সে এই কার্যের যে ভিত্তি বর্ণনা করিল, তাহাতে আমি উল্লসিত না হইয়া পারিলাম না। সে বলিতে লাগিল, "বোধ হয়, আমার দাড়ি মুণ্ডানো আপনার মনে বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছে।" আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই।" সে আবার বলিল, আমারও এই ধারণাই ছিল। কিন্তু আমি চিকিৎসকের সম্মুখে স্বীয় রোগের আসল অবস্থা খুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলাম। এই কারণে আমি এই আকৃতিতে নিজকে পেশ করিয়াছিলাম। এখন আপনি আমার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। আমি সর্বান্তঃকরণে হাযির আছি।

**দৃঢ়তার আবশ্যকতাঃ** আগন্তুকের কাজ বিরক্তিজনক হইলেও উহার ভিত্তি পছন্দনীয় ছিল। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে, তাহার উপর সততার প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তবে অজ্ঞানতার কারণে অবাঞ্ছিত পন্থায় উহার বিকাশ ঘটিয়াছে। তা সত্ত্বেও আমি তাহার সততার সম্মান করিলাম। হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদী (রঃ) ও একদা জনৈক চোরের প্রতি এমনি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হযরত জুনাইদ (রঃ) জনৈক ব্যক্তিকে শূলীতে ঝুলন্ত দেখিয়া নিকটের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যক্তিকে শূলীতে চড়ানো হইল কেন?" উত্তরে বলা হইল, "হুযূর, লোকটি অতিশয় পাকা চোর ছিল। প্রথমবার চুরি করিলে তাহার ডান হাতটি কাটিয়া ফেলা হয়। ইহাতেও সে চুরি হইতে নিরস্ত্র হয় নাই। দ্বিতীয়বার চুরি করিলে তাহার বাম পাটি কর্তন করা হয়, সে তবুও বিরত হয় নাই। ফলে তাহাকে জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু সে জেলখানায়ও চুরি করে। এক্ষণে বিচারক তাহাকে শূলীর নির্দেশ দিয়াছেন।" ইহা শুনামাত্রই হযরত জুনাইদ দৌড়িয়া লোকটির পদচুম্বন করিলেন। বাহ্যদর্শী লোকগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল, "আপনি বুযুর্গ ব্যক্তি হইয়া একজন পাকা চোরের পদচুম্বন করিলেন কেন?" জুনাইদ বলিলেন, "আমি চোরের পদচুম্বন করি নাই; বরং তাহার দৃঢ়তার পদচুম্বন করিয়াছি। সে যাহাই হউক—আপন সঙ্কল্পে অটল ছিল। তাহার প্রেমাস্পদ যদিও কতই নিকৃষ্ট ছিল, তবুও সে তাহার পিছনে প্রাণ দিয়া দিয়াছে।" তাহার অবস্থা হইলঃ

www.almodina.com

دست از طلب ندارم تا کام من برآید  یا تن رسد بجاناں یا جاں ز تن برآید

(দস্ত আয তলব নাদারম তা কামে মান বর আয়াদ
ইয়া তন রসদ বজানাঁ ইয়া জাঁ যেতন বর আয়াদ)

"যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য হাছিল না হয়, সেই পর্যন্ত অন্বেষণে বিরত হইব না। আমার দেহ প্রেমাস্পদের নিকট চলিয়া যাইবে, না হয় আমার প্রাণ দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে।"

ভাইগণ, সত্যের উপর কায়েম থাকার বেলায়ও যদি আমরা এরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারি, তবে নিঃসন্দেহে আমরা উদ্দেশ্যে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিব। এখানে প্রকাশ স্থল যদিও মন্দ ছিল, তবুও হযরত জুনাইদ চোরের এই দৃঢ়তার সম্মান করিলেন। তেমনি আগন্তুক ব্যক্তি দাড়ি মুণ্ডাইয়া যদিও একটি অবাঞ্ছিত কাজ করিয়াছিল, তথাপি উহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া আমি উহার সম্মান করিয়াছি। (কেননা, সত্যবাদী লোকের বেলায় পুরাপুরি আশা করা যায় যে, তাহারা মুরীদ হওয়ার সময় যে অঙ্গীকার করিবে, পরে উহার বিরোধিতা করিবে না।)

এই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া আজীবন দাড়ি মুণ্ডায় নাই। ফলে তাহার দাড়ি এত লম্বা হইয়াছিল যে, তাহাকে পূর্বেকার দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া চিনা যাইত না। (আসলে উত্তম গুণাবলী সর্বাবস্থায়ই উত্তম। কেহ উত্তম গুণে গুণান্বিত থাকিলে যদিও এক সময় সে নিকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সংশোধন হইলে পুরাপুরি সংশোধন হইয়া যায়।)

যাক, আমার কথা হইল উপরোক্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনিও যাবতীয় ময়লাসহ দুরবস্থায় নিজকে কোন বুযুর্গের হাতে সোপর্দ করিয়া দিন। এ ধারণা করিবেন না যে, এই অবস্থায় আমি কিরূপে বুযুর্গদের নিকট যাইব।

**দো'আর স্থানঃ** আমি বলিতেছিলাম বুযুর্গগণ মাগ্ফেরাতের দো'আ করিতেও লজ্জাবোধ করেন, তাসত্ত্বেও মনকে বুঝাইয়া শুনাইয়া মনের ময়লা ধৌত করার নিয়তে তাঁহারা দো'আ হইতে বিরত থাকেন না। সুতরাং জায়েয বিষয়ের দো'আ করিতেও যখন তাঁহারা লজ্জা করেন, (যদিও শেষ পর্যন্ত দো'আ হইতে বিরত না থাকেন) তখন আপনার না-জায়েয কাজের জন্য দো'আ করিতে তাঁহারা কিরূপে সাহস করিতে পারেন? অতএব, জীবিত কিংবা মৃত বুযুর্গদের দ্বারা এই ধরনের দো'আ চাওয়া নিরর্থক। ইহাতে তাঁহাদিগকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছুই লাভ নাই।

না-জায়েয দো'আ ব্যতীত সমস্ত জায়েয দো'আ সাক্ষাৎ এবাদত, যদিও তাহা দুনিয়া লাভের নিমিত্ত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ الدعاء مخ العبادة 'দো'আ এবাদতের সারবস্তু।' দো'আর মধ্যে দীনতা ও হীনতা প্রকাশ পায়। দো'আকারী ব্যক্তি নিজেকে হীন ও মুখাপেক্ষী মনে করিয়াই দো'আ করে।

পক্ষান্তরে ওযীফা পাঠকারী ব্যক্তি নিজেকে হীন মনে করে না। তাহার বাহ্যিক অবস্থা হইতে দাবীর ভাব ফুটিয়া উঠে। সে মনে করে, ওযীফা পাঠ করিলে সাফল্য অনিবার্য। তাহাদের কথাবার্তা শুনিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। তাহারা এই ধরনের কথাবার্তা বলেঃ "হুযূর, কোন অব্যর্থ ওযীফা বলিয়া দিন।" কোন ওযীফা সম্বন্ধে "ইহা পরীক্ষিত"—এই কথা লিখিয়া দিলে ইহার উপর এত ভরসা করে, যেন ইহার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। ইহাতে ভাব নিহিত থাকায় এইসব ওযীফা পছন্দনীয় নহে। দুঃখের বিষয়, আজকাল অধিকাংশ লোক দো'আর পরিবর্তে ওযীফা পাঠ করে। ইহা যদিও জায়েয (শরীঅত-বিরুদ্ধ কোন কিছু না থাকিলে) কিন্তু ইহাতে ছওয়াব মোটেই

হইবে না। কেননা, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিয়ত গুণেই ছওয়াব পাওয়া যায়।' ওযীফায় ছওয়াবের নিয়ত থাকে না; বরং দুনিয়া লাভের নিয়তে পাঠ করা হয়। কাজেই বিন্দুমাত্রও ছওয়াব হইবে না। দো'আ আসলেই একটি এবাদত। ইহাতে দুনিয়া চাহিলেও শরীঅত ইহাকে এবাদত আখ্যা দিয়াছে। দুনিয়ার নিয়ত করা দো'আর পরিপন্থী নহে। কেননা, হাদীসে দুনিয়ার নিয়তেও দো'আর নির্দেশ রহিয়াছে।

উদাহরণতঃ এক হাদীসে উক্ত হইয়াছেঃ وَاسْئَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ "খোদার নিকট স্বাস্থ্যের জন্য দো'আ কর।" তদ্রূপ অন্ন, ধনাঢ্যতা, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির জন্যও হুযূর (দঃ) দো'আ শিক্ষা দিয়াছেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, দুনিয়ার প্রত্যেক সুখের জন্য এবং প্রত্যেক বিপদাপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হাদীসে দো'আ মওজুদ রহিয়াছে। সুখ ও বিপদাপদ ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারের জন্যও হুযূর (দঃ) একটি না একটি দো'আর নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন, ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হইতে বাহিরে যাওয়া, নিদ্রা, জাগরণ, উঠা, বসা, রোগী দেখা, মসজিদে যাওয়া ও বাহির হওয়া, বাজারে যাওয়া, সফর শুরু করা, সফরে কোথাও অবস্থান করা, দেশে প্রত্যাবর্তন করা, পায়খানায় যাওয়া, তথা হইতে বাহির হওয়া, আনন্দদায়ক কিংবা কষ্টদায়ক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা, চাঁদ দেখা ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য হাদীসে পৃথক পৃথক দো'আ বর্ণিত আছে। সুতরাং দুনিয়ার নিয়তে দো'আ করাও এবাদতের শামিল। পক্ষান্তরে ওযীফা আখেরাতের নিয়তে হইলে এবাদত, নতুবা নহে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ওযীফা অপেক্ষা দো'আ বেশী করা দরকার। কিন্তু বর্তমানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত করা হইতেছে। এখন ওযীফাকে দো'আ হইতে এমন কি কোরআন হইতেও বেশী মূল্যবান মনে করা হয়। কোরআন পাঠ অবস্থায় বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলা হয়। কিন্তু ওযীফার সময় কথা বলা হারাম বলিয়া গণ্য করা হয়। যেমন, পূর্ব বর্ণিত অফিসার সাহেব ওযীফা পাঠ করার সময় শুধু হুঁ হুঁ করিতেন এবং ইঙ্গিতে ঘুষের পরিমাণ নির্ধারিত করিতেন। এশরাকের নামায পর্যন্ত তাঁহার জায়নামাযের নীচে কয়েক শত টাকা আসিয়া যাইত। ইহাই ছিল তাঁহার নামাযের মূল্য। আজকাল ইহাকেই বলে পাওয়া, এই অর্থেই উক্ত দ্বিতীয় অফিসার সাহেব তাঁহার বিবিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "নামায পড়িয়া তুমি কি পাইলে?"

আজকাল পারলৌকিক ফলাফলকে ফলাফলই মনে করা হয় না। এই কারণে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই গতকল্য আমি ইহার একটু বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। নতুবা আসল বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ছিল না। কারণ, ধর্মপথ অবলম্বন করিয়া খোদার প্রিয়পাত্র হওয়াই ইহার সারমর্ম। ইহা আয়াতের একাংশ। গতকল্য ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের অপর অংশ অর্থাৎ, উপায়ের বিশদ ব্যাখ্যা আজ বর্ণিত হইবে। সম্ভবতঃ অদ্যকার বর্ণনা গত কল্যকার বর্ণনার ন্যায় বিস্তারিত ও দীর্ঘ হইবে না। কারণ, এখন শরীরে ক্লান্তি বোধ হইতেছে। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অংশ ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই বর্ণিত হইবে। এই বর্ণনা কিছুটা বিস্তারিত হইবে, যাহাতে বিষয়টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা কিছুটা দূরীভূত হইয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—উদ্ধৃত আয়াতের আলোচ্য বিষয় দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ কাম্যবস্তু ও অপর ভাগ উহা লাভ করিবার উপায়। কাম্যবস্তু সম্বন্ধে গতকল্য বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। উপায়ও দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ঈমান ও (২) নেক আমল। খোদার প্রিয়পাত্র হওয়ার উপায় হিসাবে আয়াতে শুধু এই দুইটি বিষয়

উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, এইগুলি ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কাদি বন্দাকে মুক্তি দিতে পারিবে না। উদাহরণতঃ শুধু কোন বুযুর্গের সন্তান হওয়া বা কোন বুযুর্গের 'তাবার্‌রুক' (পবিত্র বস্তু প্রসাদ) নিজের কাছে থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নহে।

**তাবার্‌রুক সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** বন্ধুগণ! আমি বুযুর্গদের তাবার্‌রুক অস্বীকার করি না; ইহার স্বরূপ কি তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চাই। ধর্মীয় ব্যাপারে দুনিয়ার উদাহরণ দিতে লজ্জা হয়; কিন্তু কি করি, আজকাল সাধারণ লোকের রুচিই বিগড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা দুনিয়ার ব্যাপারাদিকে যতটুকু মূল্য দেয়, খোদার ব্যাপারাদিকে ততটুকু দেয় না। ফলে কোন ধর্মীয় ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের সহিত তুলনা দিয়া বুঝাইলে তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। এই কারণে আমি লজ্জাভারাক্রান্ত অবস্থায় তাবার্‌রুকের কার্যকারিতার একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি।

মনে করুন, দুই ব্যক্তি বি এ পাশ করিয়া চাকুরীর দরখাস্ত করিল, তন্মধ্যে এক ব্যক্তির পরিবার সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় ব্যক্তির এরূপ কোন বৈশিষ্ট্য নাই। এক্ষেত্রে যাহার পরিবার সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী সে-ই সর্বাগ্রে চাকুরী পাইবে। যদি উভয় ব্যক্তিই চাকুরী পায়, তবে প্রথম ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ করিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিম্নপদ পাইবে। মোটকথা, অগ্রে চাকুরী দেওয়ার বেলায়ই হউক কিংবা উচ্চপদ দেওয়ার বেলায়ই হউক, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকের প্রতি বিশেষ নযর দেওয়া হয়। কেননা, সে সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারের সহিত সম্পর্ক রাখে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি শুধু হিতাকাঙ্ক্ষী পরিবারের লোক হয় এবং বি, এ পাশ না করে—উপরন্তু কোন মূর্খ ও বদমায়েশ হয়, তবে চাকুরীর বেলায় پدر من سلطان بود "আমার পিতা বাদশাহ্ ছিলেন" বলা কোন কাজে আসিবে না; বরং সে অপরাধ করিলে অন্যের তুলনায় তাহাকে বেশী শাস্তি দেওয়া হইবে। কারণ হিসাবে বলা হইবে, তুমি সরকারী আইন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিলে, তোমার পরিবারের প্রত্যেকের মুখে সরকারের অনুগ্রহের কথা আলোচিত হইত, তা সত্ত্বেও তুমি সরকারী আইনের বিরোধিতা করিতে উদ্যত হইলে কেন? এই হিসাবে তাহার উপর এমন শক্ত মামলা কায়েম হওয়া বিচিত্র নহে, যাহা একজন ধূপী কিংবা জোলার অপরাধের বেলায়ও হইতে পারে না। সে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বেশী ঘৃণার্হ হইয়া যাইতে পারে। অনেক ঘটনা এই বিষয়ের সাক্ষ্য দান করে।

অনুরূপভাবে বুযুর্গদের সহিত কাহারও বংশগত সম্পর্ক থাকিলে এতটুকু উপকার নিশ্চয়ই হয় যে, ঈমান ও নেক আমল করিলে সে অন্যের তুলনায় দ্রুত সাফল্য অর্জন করিতে পারে; কিংবা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই ব্যক্তি নাফরমানীতে লিপ্ত থাকিলে শুধু বংশগত মর্যাদা তাহার কোন উপকারে আসিবে না।

এক্ষণে একটি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমার উস্তাদ মরহুমের একটি উক্তি মনে পড়িল। প্রথমে হাদীসটি শুনাইয়া দেই—হুযূর (দঃ)-এর যমানায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই নামক জনৈক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল মুনাফিকদের সর্দার; কিন্তু তাহার ছেলে খাঁটি ঈমানদার ছিল। মুনাফিক সর্দারের এন্তেকাল হইলে তাহার পুত্র হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা এন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার কাফনের জন্য আপনি স্বীয় কোর্তা প্রদান করুন।" (ইহার বরকতে হয় তো খোদা তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন।) হুযূর (দঃ) আপন কোর্তা দিয়া দিলেন এবং তাহার জানাযায় শামিল হইলেন; এমন কি জানাযার নামাযও তিনিই পড়াইবেন মনস্থ করিলেন।

www.almodina.com

ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তিনি হুযূর (দঃ)-এর চাদর ধরিয়া বলিলেন, আপনি কাহার নামায পড়াইতে চাহিতেছেন? যে মুনাফিক সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেনঃ

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ‌*

"আপনি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন (উভয়ই সমান)। আপনি তাহাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।" "আপনি কি সেই মুনাফিকের নামায পড়িতে অগ্রসর হইতেছেন?" হুযূর (দঃ) বলিলেনঃ "আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে নিষেধ করেন নাই। যদি আমি জানিতে পারি সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন, তবে আমি নিশ্চয়ই সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করিব।" এই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক উত্তর শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) চুপ হইয়া গেলেন এবং হুযূর (দঃ) মুনাফিক সর্দারের জানাযার নামায পড়াইয়া দিলেন।

বাস্তবিক হযরত (দঃ)-এর দয়ারও পারাপার নাই। শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। বন্ধুগণ, এমন দয়াল নবীর উম্মত হইতে পারায় আমরা বাস্তবিকই ভাগ্যবান। আমরা তাঁহার নিকট হইতে বহু কিছু আশা করিতে পারি।

نماند بعصیاں کسے در گرو — که دارد چنیں سید پیشرو

(নামানাদ বএছইয়াঁ কাসে দর গেরু + কেহ দারদ চুনি সাইয়্যেদ পেশরু)

"যাহাদের এমন এক সর্দার আছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ গোনাহ্‌র কারণে বন্দী হইয়া থাকিবে না।" শত্রুর প্রতি যিনি এত মেহেরবান, তিনি আপন গোলামদের প্রতি কতটুকু মেহেরবান হইতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, হুযূর (দঃ) জানাযার নামায পড়াইলেন, দাফনেও শরীক হইলেন। লাশ কবরে রাখা হইলে তিনি আপন পবিত্র থুথু তাহার মুখে দিলেন। এই ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইলঃ

وَلَاتُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖۤ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ‌*

হে মোহাম্মদ! "মুনাফিকদের কেহ মারা গেলে কখনও তাহার জানাযার নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন না। তাহারা আল্লাহ্‌ ও তদীয় রাসূলকে অবিশ্বাস করে এবং ফাসেক পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।" এই আয়াতে মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়িতে এবং দাফন ইত্যাদিতে শরীক হইতে পরিষ্কার নিষেধ করা হইয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ "আমি হযরত (দঃ)-কে তাঁহার কাজে বাধাদান করিয়া যে দুঃসাহসিক ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া পরবর্তীকালে খুবই অনুতপ্ত হইয়াছিলাম।" (আমার কি-ই বা মর্যাদা ছিল। তিনি তো প্রত্যেক বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।)

যাক, এই হইল ঘটনা। ইহাতে প্রশ্ন হয় যে, لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ "আল্লাহ্‌ কস্মিনকালেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না" নাযিল হওয়া সত্ত্বেও হযরত (দঃ) এই মুনাফিকের নামায কেন পড়াইলেন? ইহা ছাত্রসুলভ প্রশ্ন। ছাত্রগণ নিজেরাই ইহার সমাধান বাহির করিতে পারিবে। এই ঘটনার মধ্যে আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা এই যে, হুযূর (দঃ) এই মুনাফিককে আপন কোর্তা কেন পরাইলেন এবং থুথু মোবারক তাহার মুখে কেন দিলেন?

www.almodina.com

হাদীসের টীকাকারগণ লিখিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) মুনাফিক সর্দারের খাঁটি ঈমানদার পুত্রের মন রক্ষার্থে এসব করিয়াছেন। [যাহাতে সে মনে করিতে পারে যে, হযরত (দঃ) তাহার মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি দো'আ করিয়াছেন, নামায পড়াইয়াছেন, তাবার্‌রুকও (কোর্তা ও থুথু) দান করিয়াছেন। এর পরও মুক্তি না পাইলে উহা তাহার নিজস্ব কৃতকর্মের জন্যই।] কেহ বলিয়াছেন, এই মুনাফিক সর্দার বদর যুদ্ধের সময় হযরতের পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে একটি কোর্তা পরাইয়াছিল। উহার প্রতিদানে হযরত (দঃ) তাহাকে মৃত্যুর পর আপন কোর্তা পরাইয়া দিলেন।

টীকাকারদের এই সমস্ত ব্যাখ্যা আমার নিকট তত মনঃপূত নহে। এক্ষেত্রে উস্তাদ (রঃ)-এর উক্তিই আমার কাছে পছন্দনীয় মনে হয়। তিনি বলেন, মৃত মুনাফিকের সহিত হযরত (দঃ)-এর উপরোক্তরূপ ব্যবহারের কারণ এই যে, তিনি উম্মতকে একটি জরুরী বিষয় জানাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা হইল—কাহারও ঈমান না থাকিলে যদিও তাহার সহিত লক্ষ লক্ষ তাবার্‌রুক থাকে, রাসূলের ন্যায় মর্যাদাবান ব্যক্তি তাহার জানাযার নামায পড়ায়, রাসূলের কোর্তা তাহার কাফন হইয়া যায় এবং রাসূলের পবিত্র থুথু তাহার মুখে দেওয়া হয়, তথাপি তাহার মুক্তি হইতে পারে না। অতএব, শুধু তাবার্‌রুকের ভরসায় থাকা উচিত নহে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাছে তাবার্‌রুক থাকিলেও আসল সম্পদ ঈমান ছিল না। কাজেই তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "নিশ্চয়ই, মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করিবে।" সেখানকার আযাব সবচেয়ে বেশী কঠিন।

**বংশগত সম্পর্কের ফলঃ** কেহ কেহ বলে, "আমরা অমুক বুযুর্গের বংশধর। তিনি খোদার সহিত চুক্তি করিয়াছেন যে, তাহার বংশের কেহ দোযখে যাইবে না।" বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ঈমানের পুঁজি না থাকিলে তাহাদের এই দাবী কোন কাজে আসিবে না।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"আপনি আপনার নিকট-আত্মীয়দিগকে দোযখের ভয় প্রদর্শন করুন।" এই আয়াত নাযিল হইলে হুযূর (দঃ) আপন আত্মীয়বর্গকে একত্রিত করিলেন এবং অন্যান্য সকলের সহিত আদরের দুলালী হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ لَااُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا

"হে মোহাম্মদ তনয়া ফাতেমা! দোযখের অগ্নি হইতে নিজেই আত্মরক্ষা কর। খোদা পাকড়াও করিলে আমি তোমার কোন উপকারে আসিব না।"

অতঃপর আপন ফুফীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللهِ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ لَااُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا

"হে রাসূলের ফুফী ছাফিয়্যা! দোযখের অগ্নি হইতে নিজেই আত্মরক্ষা করুন। খোদা পাকড়াও করিলে আমি আপনার কোন উপকারে আসিব না।"

এইরূপে সকল আত্মীয়কেই আহ্বান জানাইয়া তিনি বলিলেন, "নিজেরাই জাহান্নাম হইতে নিজদিগকে রক্ষা করুন। কারণ, আমি আপনাদের কোন কাজে আসিব না।" অর্থাৎ, শুধু আমার

ভরসায় থাকিলে আমি কোন উপকার করিতে পারিব না। হাঁ, নিজেও পুঁজি যোগাড় করিলে আমি উপকার করিতে পারিব।

সুতরাং বংশগত সম্পর্ক ও তাবার্‌রুকের কার্যকারিতা এতটুকুই যে, নিজের আমল ব্যতীত শুধু ইহাতে কোন লাভ নাই। অবশ্য নেক আমলসহ হইলে ইহার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। তাবার্‌রুক আদৌ উপকারী না হইলে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ইহার প্রতি মনোযোগ দিতেন না। অথচ তাঁহারা এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। স্বয়ং হযরত (দঃ) আপন তাবার্‌রুক বিলাইয়াছেন। একবার তিনি জনৈক ছাহাবীকে আপন চাদর মোবারক দিয়া দেন। হজ্জের সময় তিনি আপন কেশ মোবারক বণ্টন করেন। অন্যান্য আরও ঘটনাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাবার্‌রুক বাস্তবিকই উপকারী। তবে শুধু তাবার্‌রুক কোন কাজে আসে না। আসল পুঁজির সহিত ইহা যোগ হইলে উপকার অনেক বাড়িয়া যায়।

যেমন, খাদ্যের সহিত চাটনী, মোরব্বা ইত্যাদি থাকিলে খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়া যায়। তাই বলিয়া কেহ যদি বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণকরত দস্তরখানে শুধু চাটনী ও মোরব্বা পরিবেশন করে, তবে ইহাকে নিমন্ত্রণ বলা হইবে না; বরং রসিকতা বলা হইবে।

তদ্রূপ যে সমস্ত বিষয় অতিরিক্ত, উহাদের উপর উদ্দেশ্য সিদ্ধি নির্ভরশীল নহে। তবে আসল বিষয়ের সহিত যোগ হইলে উহারা উপকারী হইয়া থাকে।। দাওয়াতের দস্তরখানে চাটনী মোরব্বা না থাকিলেও উহা দাওয়াত বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু শুধু চাটনী মোরব্বা থাকিলে এবং খাদ্য না থাকিলে উহাকে দাওয়াত বলিয়া গণ্য করা হইবে না। আর যদি উভয়টি মওজুদ থাকে, তবে উহা সুস্বাদু ও উচ্চমানের দাওয়াত হইবে।

**তাবার্‌রুক উপকারী হওয়ার তাৎপর্যঃ** তাবার্‌রুক অবশ্যই উপকারী। তবে ইহার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। (অর্থাৎ, ঈমান ও নেক আমল) সরকার আপন অনুগতদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। কিন্তু কখন? যখন তাহারা বিদ্রোহ কিংবা অপরাধের প্রশ্রয় না লয় এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সরকারের আনুগত্য করে। এমতাবস্থায় অন্যের তুলনায় তাহাদের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। এই কারণে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বুযুর্গদের নেক সন্তানের সর্বদাই সম্মান করিয়াছেন। ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং বুযুর্গগণও আপন সন্তানদিগকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

আমার জনৈকা ফুফী বালিকাদিগকে পড়াইতেন। আমাদের পরিবারে বালিকাদিগকে বাড়ীতেই লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। তাহাদের জন্য পৃথক কোন বালিকা-বিদ্যালয় নাই। থাকা সঙ্গতও নহে। (ইহাতে অনেক অনর্থ দেখা দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশঃই ইহা প্রমাণিত হইতেছে।) আমার ফুফী সাহেবাও তদ্রূপ বাড়ীতেই মেয়েদিগকে পড়াইতেন এবং এজন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। একবার তাঁহার নিকট জনৈকা সৈয়দ বংশীয়া বালিকা পড়িতে আসে। ফুফী বলেনঃ ঐ রাত্রিতেই আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিতেছেনঃ "ওমদাতুন্নেছা, আমার এই মেয়েটিকে আদর করিয়া পড়াইবে।"

এমনি ধরনের আরও অনেক স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বুযুর্গগণ আপন সন্তানদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা বুযুর্গদের সন্তানদিগকে বুযুর্গদের সমমর্যাদায় উন্নীত করিয়া দিবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

"যাহারা ঈমান আনে এবং তাহাদের বংশধরগণও তাহাদের অনুসরণ করিয়া ঈমান আনে, (অর্থাৎ, কাফের কিংবা ফাসেক না হয়) আমি তাহাদের বংশধরদিগকেও তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিব। (অর্থাৎ, উভয়ের আমল সমান না হইলেও উভয়কে সমান মর্যাদা দিয়া দিব)" যেমন, কোন বাদশাহ্ পুত্রসহ কোথাও মেহমান হইলে পুত্র পিতার সহিত একই স্থানে অবস্থান করে।

এক্ষণে সমমর্যাদা দানের অর্থ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারে যে, উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে নীচে আনা হইবে কিংবা তাঁহার মর্যাদা সামান্য হ্রাস করা হইবে এবং নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদা বাড়াইয়া উভয়কে গড়ে সমমর্যাদা দেওয়া হইবে। এই সন্দেহ খণ্ডনের নিমিত্ত আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَمَآ اَلَتْنَا لَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

"আর আমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির আমল বিন্দুমাত্র হ্রাস করিব না।" অতএব, বুঝা গেল যে, যাহারা কম আমল করিবে, তাহাদের আমল বাড়াইয়া দিয়া পূর্ণ আমলকারীদের সহিত মিলাইয়া দেওয়াই সমমর্যাদা দানের তাৎপর্য।

ইহা শুনিয়া হয়তো কেহ আনন্দিত হইবে যে, তবে আমাদের আমল করার প্রয়োজন নাই। তাই সঙ্গেসঙ্গেই এই ধারণার খণ্ডন করিয়া বলেনঃ

كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

"প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্ব আমলের সহিত জড়িত থাকিবে।" সুতরাং আমলের প্রয়োজন আছেই। আমল ব্যতীত সমমর্যাদা লাভ হইবে না।

**বংশমর্যাদার মূল্যঃ** বংশমর্যাদা উপকারী কিনা, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি চলিতেছে। অনেকে বংশমর্যাদাকেই বড় মূলধন মনে করিতেছে। আবার অনেকে ইহাকে 'কিছুই নহে' বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতেছে। যাহারা উচ্চ বংশধর নহে, সাধারণতঃ তাহারাই ইহাকে উড়াইয়া দেয়। বলিতে কি, উভয় পক্ষই অহংকারের বশবর্তী হইয়া এরূপ করিতেছে। যাহারা ইহাকে প্রকৃত মূলধন মনে করে, তাহারা ইহা দ্বারা অন্যের কাছে এই বলিয়া বড় হইতে চায় যে, আমরা এতবড় মর্যাদার অধিকারী। কাজেই আমাদিগকে বড় মনে কর। অপরপক্ষে যাহারা ইহাকে উড়াইয়া দেয়, তাহারাও মনে মনে এইরূপ দাবী করে, আমরা সম্ভ্রান্ত লোকদের তুলনায় কোন অংশে হেয় নহি। কারণ, বংশমর্যাদা কোন জিনিসই নহে। এই দ্বন্দ্বের ফলে অনেকে বংশমর্যাদাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। আবার অনেকে টানা-হেঁছড়া করিয়া নিজদিগকে সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

আমি এক জায়গায় গিয়াছিলাম। সেখানকার নীচ জাতিরা নিজদিগকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। (১) শায়খ, (২) সৈয়দ, (৩) মোগল ও (৪) পাঠান। তাহারা আপন মহল্লার নামও পাল্টাইয়া দিয়াছিল। আমি এই মহল্লার নাম প্রকাশ করিতে চাই না। তথায় পৌঁছিলে মহল্লাবাসীরা আমাকে কিছু বয়ান করিতে অনুরোধ করিল। ঘটনাক্রমে আমি বংশমর্যাদা সম্বন্ধেই বর্ণনা আরম্ভ করিলাম। (অথচ আমি তখন পর্যন্ত উপরোক্ত ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। কেহ আমাকে জানায়ও নাই।) আমার বর্ণনা শুনিয়া তাহারা যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "এছাড়া কি অন্য কোন আলোচ্য বিষয় ছিল না?" তাহাদের ধারণা ছিল, তথাকার শায়খ বংশের লোকেরা ফরমায়েশ করিয়া এই বিষয়টি বর্ণনা করাইয়াছে। ফলে শায়খের প্রতিও তাহারা

ভীষণ চটিয়া গেল। অথচ ফরমায়েশী বিষয়বস্তু বর্ণনা করার অভ্যাস আমার আদৌ নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা উদয় হয়, তাহাই বর্ণনা করিয়া দেই।

মোটকথা, বংশমর্যাদা সম্পর্কে উপরোক্তরূপ বাড়াবাড়ি চলিতেছে। ইহার কারণ অহঙ্কার ছাড়া কিছুই নহে। যাহারা শক্তিমান, তাহাদের অহঙ্কার পরিষ্কার ফুটিয়া উঠে। আর যাহারা দুর্বল, তাহাদের ব্যবহারে ইহা ধরা পড়ে।

একদা আমি কান্ধলা নামক একটি ছোট শহরে গিয়াছিলাম। তথায় জনৈক নাপিত প্রকাশ্য মজলিসে আমাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, যাহারা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিলে ক্ষেপিয়া উঠে—তাহারা কেমন? যাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লোকটি প্রশ্ন করিল, তাহারাও মজলিসে উপস্থিত ছিল। প্রশ্ন শুনিয়া তাহাদের কপালে ঘর্ম দেখা দিল। না জানি কি ফতওয়া লাগে। আমি বলিলাম, "যাঁহারা এরূপ করে, নিঃসন্দেহে তাহারা মন্দ লোক। কিন্তু যাহারা পারস্পরিক সাম্যতা বুঝাইবার নিয়তে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'কে লম্বা করিয়া লাঠির ন্যায় ছুড়িয়া মারে, তাহারা আরও অধিক মন্দ লোক। ছোটরা বড়দিগকে সালাম করার নিয়ম নম্রতা সহকারে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা। লাঠির ন্যায় ছুড়িয়া মারা উচিত নহে। পিতাপুত্রের সালামের ন্যায় সালাম করিলে কেহ ক্ষেপিবে না।"

প্রশ্নকারী চলিয়া গেলে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত লোকগণ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বস্ জনাব, আপনি এদের আসল রোগ ধরিতে পারিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহারা সাম্যতা প্রদর্শনার্থে লাঠি ছোড়ার ন্যায় সালাম করে। ইহা আমাদের কাছে খুবই বিরক্তিকর মনে হয়। ভদ্রতার সহিত সালাম করিলে ক্ষেপার কোন কারণ নাই।" সুতরাং ধনীদিগকে অহঙ্কারী বলা হইলেও গরীবরা এ ব্যাপারে পশ্চাতে নহে।

ইহার বিপরীতে আরও একটি গল্প মনে পড়িল। জনৈক নাপিত কাহারও চিঠি লইয়া এক ছোট শহরে পৌঁছিল। তথায় শায়খ পরিবারের লোকদিগকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলায় তাহারা তাহাকে ধরিয়া খুব প্রহার করিল। বেচারা মার খাইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "হুযূর! তবে কি বলিব?" তাহারা বলিল, "হযরত সালামত" বলিবে। এরপর জুমুআর নামাযে ইমাম যখন 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলিলেন, তখন ঐ নাপিত সজোরে বলিতে লাগিল, "হযরত সালামত ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্, হযরত সালামত ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।"

ইমাম সাহেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ "একি অদ্ভুত কথা!" সে বলিল, "হুযূর! আগে আমার কাহিনী শুনিয়া লউন। আমি এখানকার বিশিষ্ট লোকদিগকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলায় তাহারা আমাকে বেদম প্রহার করিয়াছে। অবশেষে তাহারাই আমাকে সালামের স্থলে "হযরত সালামত" বলিতে শিখাইয়া দিয়াছে। নামাযের মধ্যে আমার আশঙ্কা হইল যে, ফেরেশতারাও যদি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিলে রাগান্বিত হয়, তবে আমার সর্বনাশ। কারণ, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যুর ফেরেশতাও রহিয়াছেন। তিনি আমার প্রাণ বাহির করিয়া তবে ছাড়িবেন। এই কারণে আমি নামাযের মধ্যেও সালামের পরিবর্তে 'হযরত সালামত' বলিয়াছি।" এরপর ইমাম সাহেব তথাকার বিশিষ্ট লোকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "একি বাজে কথা, আপনারা সুন্নত পালন করিতেও নিষেধ করিতেছেন।" মোটকথা, কিছু সংখ্যক লোক এমনও আছে।

আরও একটি গল্প মনে পড়িল। কানপুরে অবস্থান কালে গ্রাম হইতে জনৈক কাজী সাহেব আমার নিকট আসিলেন। তিনি আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া নিকটেই বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ

পর বলিলেন, "কিছু আরয করিতে চাই।" আমি বলিলাম, "স্বচ্ছন্দে বলুন।" কাজী সাহেব অভিযোগের ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের এলাকায় ভদ্র ও সাধারণ একেবারে বরাবর হইয়া গিয়াছে। এত দিন 'আস্সালামু আলাইকুম'-এর একটি পার্থক্য ছিল। কিন্তু এখন মৌলবীরা ইহাও উঠাইয়া দিয়াছে। সকলের জন্য একই 'আস্সালামু আলাইকুম'। আমি বলিলাম, কাজী সাহেব! ভদ্র ও সাধারণের পার্থক্য ধর্মীয় বিষয়ে, না সাংসারিক বিষয়ে? যদি ধর্মীয় বিষয়ে হয়, তবে গ্রামে যাইয়া সাধারণ লোকদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন যোহ্র, আছর ও এশার নামায তিন রাকাআত করিয়া পড়ে। (এবং মাগরেবে দুই ও ফজরে এক রাকআত পড়ে।) তাহারা ইহাতে স্বীকৃত না হইলে আপনারা চারি রাকাআতের স্থলে পাঁচ এবং তিন-এর স্থলে চারি রাকাআত করিয়া পড়িতে আরম্ভ করুন। ইহাতে ভদ্র ও সাধারণের সাম্য বাকী থাকিবে। ইহা শুনিয়া কাজী সাহেব চুপ হইয়া গেলেন।

আমি আরও বলিলাম, বলুন তো, 'আস্সালামু আলাইকুম' ধর্মীয় কাজ, না সাংসারিক কাজ? জানা কথা, ইহা ধর্মীয় কাজ। তবে ইহাতে বড় ছোট-এর পার্থক্য থাকিবে কেন? সাংসারিক ব্যাপারে পার্থক্য করিলে আমরা বাধা দেই না। আপনারা মজলিসের সম্মুখে বসেন আর দরিদ্ররা পিছনে বসে—এই পার্থক্যই যথেষ্ট। কোন সাধারণ ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বড়দের সারিতে বসিতে চাহিলে আমরা তাহাকে অবশ্যই বিরত রাখিব।

মোটকথা, বংশগত সম্পর্কের ব্যাপারে উভয় পক্ষ হইতে বাড়াবাড়ি হইতেছে। একদল ইহাকেই যথাসর্বস্ব মনে করে এবং অপর দল ইহাকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেয়। এই কারণে আমি উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করি, বর্তমানে যাহারা সমাজে সম্ভ্রান্ত এবং নিজদিগকে ছিদ্দীকী, ফারূকী ও সৈয়দ আখ্যায় আখ্যায়িত করে, তাহারা বলুক, তাহাদের পূর্ববর্তিগণ সম্ভ্রান্ত হইলেন কিরূপে? উত্তর হইবে, তাহারা পূর্ণ ধার্মিক ছিলেন। এই কারণে এখন তাহাদের সহিত সম্পর্ক থাকাও সম্ভ্রান্ত হওয়ার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধার্মিক ও ঈমানদার হওয়াই সম্ভ্রান্ত হওয়ার আসল কারণ। আমাদের পূর্ববর্তিগণও এই কারণেই সম্ভ্রান্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সম্পর্কের ফলে আমরাও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত। অবশ্য তৎসঙ্গে তাঁহাদের বংশও উচ্চ ছিল। তবে শুধু উচ্চ বংশ হওয়াই সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণ নহে। যেমন, আবু জাহ্ল ও আবু লাহাবও উচ্চ বংশোদ্ভুত ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতে কেহই রাযী হইবে না; বরং ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের সাথে সম্পর্কিত হওয়াতে শরাফত আসিয়া গিয়াছে। তবে বংশগত মর্যাদা একেবারে অসার নহে। শরীঅতের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়স্থলে ইহা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

হাদীস শরীফে 'কুফূ' অর্থাৎ বংশ, পেশা ও ধনদৌলত সমতুল্য ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে। এইভাবে দুনিয়াতে বংশমর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। শরীঅতের দৃষ্টিতে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা অসম্ভ্রান্ত পুরুষের সমতুল্য নহে। আখেরাতের বেলায়ও যে ব্যক্তি এরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সন্তান হইবে, সে ঈমান আনিলে ও নেক আমল করিলে অন্যের অপেক্ষা বেশী সওয়াব পাইবে এবং আপন পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সমপরিমাণ আমল না থাকিলে সে জান্নাতে তাঁহাদের স্তরে অবস্থান করিবে। এই উপকারটি শুধু সাধারণের নিকট সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ব্যক্তিদের জন্যই নহে; বরং কোন জোলাও খোদার ওলী হইলে তাহার

www.almodina.com

ছেলেও এইরূপ উপকার প্রাপ্ত হইবে। মোটকথা, আভিজাত্যে আখেরাতেরও উপকার আছে। তবে ইহা পারিভাষিক অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং যে কেহ খোদার প্রিয়পাত্র হইবে, তাহার সহিত সম্পর্ক থাকাই উপকারী হইবে।

সুতরাং বংশমর্যাদার উপকার অস্বীকার করা নিতান্ত ভুল। আখেরাতে অভিজাত ও অনভিজাতের মধ্যে উপরোক্তরূপ পার্থক্য হইবে। দুনিয়াতেও এতদুভয়ের পার্থক্য বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশমান। তাছাড়া, (জ্ঞান বুদ্ধি) তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন ইত্যাদির দৃষ্টিতেও অভিজাত ও অনভিজাতের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

তাই বলিয়া অন্যকে হেয় জ্ঞান করিবেন না। এই পার্থক্যটিকে ছোট ভাই ও বড় ভাই, পিতা ও পুত্র এবং রাজা ও প্রজার পার্থক্যের ন্যায় মনে করিবেন। বড় ভাই ছোট ভাইকে কিংবা পিতা পুত্রকে কখনও হেয় মনে করিতে পারে? বংশমর্যাদার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে এই হইল মীমাংসা।

ইহা একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা হইয়া গেল। আসলে আমার বক্তব্য ছিল যে, শুধু বংশগত সম্পর্কই যথেষ্ট নহে; বরং তৎসঙ্গে ঈমান ও নেক আমলও থাকিতে হইবে। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিও ঈমানের ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে,' আয়াত হইতেও এই বক্তব্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। সুতরাং আমরা বুযুর্গদের সন্তান, আমাদের নিকট তাঁহাদের তাবার্‌রুক আছে ইত্যাদি বলিয়া কাহারও আত্ম-তুষ্টি লাভ করা উচিত নহে; বরং ঈমান ও নেক আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। তাহা হইলেই বংশগত সম্পর্ক কাজে আসিবে—নতুবা নহে।

এই বক্তব্যটি اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○ 'নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করিয়াছে, আল্লাহ্‌ সত্বরই তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেন' এই আয়াত হইতেও বুঝা যায়। ইহাতে ঈমান ও নেক আমলকেই বন্ধুত্ব প্রাপ্তির বুনিয়াদ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই দুইটি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই মূল বুনিয়াদ নহে; বরং অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে গণ্য। মোটকথা, আয়াতের প্রথমাংশেই উদ্দেশ্য হাছিলের পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। উহা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ঈমান ও অপরটি নেক আমল। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি নেক আমলেরই ব্যাখ্যা করিতে চাই। ঈমানের ব্যাখ্যার জন্য আকায়েদের অধ্যায় দেখা দরকার। যাবতীয় আকায়েদের ব্যাখ্যা করিলে এইরূপ একটি সভা যথেষ্ট নহে। তবুও আমি আকায়েদের পূর্ণ ব্যাখ্যা না করিয়া ইহার কয়েকটি প্রাথমিক প্রকার বর্ণনা করিয়া দিতেছি। আজকাল মানুষ এগুলির মধ্যেই অধিকতর বিভ্রান্ত হইতেছে।

**আকায়েদের ভুল-ভ্রান্তিঃ** আজকাল আকায়েদের ব্যাপারে দুই প্রকার ভ্রান্তি হইতেছে। একদল লোক শুধু ঈমান ও আকায়েদকেই জরুরী মনে করে। তাহারা আমলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। তাহাদের সাধারণ বিশ্বাস— مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই কলেমা উচ্চারণ করে এবং তওহীদ ও রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে জান্নাতে যাইবে। তাহার পক্ষে আমল করার প্রয়োজন নাই।

অপর একদল লোক ঈমানের মধ্যেও ছাটাই করিয়া ফেলিয়াছে। ঈমানের আসল স্বরূপ হইল— اَلتَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'হযরত (দঃ) যে যে বিষয়সহ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা সমস্তই সর্বান্তকরণে মানিয়া লওয়া। তিনি বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্‌ এক। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। আমলের ওযন সত্য। হিসাব-নিকাশ সত্য। জান্নাত ও দোযখ সত্য।

www.almodina.com

তক্‌দীর সত্য। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সত্য, পুলসিরাত অতিক্রম করা সত্য। এতদ্ব্যতীত নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়া সত্য। এগুলি যদিও আমলের অন্তর্ভুক্ত, তাসত্ত্বেও এইগুলি ফরয বলিয়া স্বীকার করা ঈমানের অঙ্গ। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত যদিও আমলের সহিত সংশ্লিষ্ট; কিন্তু ইহা ফরয বলিয়া বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। এই বিশ্বাস ব্যতীত ঈমানের অস্তিত্বই হইতে পারে না।

এই সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান। কিন্তু একদল লোক এগুলির মধ্যে ছাটাই করিয়া আমল ওযনের প্রতি বিশ্বাস করা জরুরী মনে করে না। কেহ পুলসিরাত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকে ঈমানের অঙ্গ মনে করে না। আবার কেহ তক্‌দীর ইত্যাদিকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও নিজকে মুসলমান বলিয়া দাবী করে।

কিছুদিন পূর্বেও এই সমস্ত আকায়েদে মতভেদ ছিল না। তবে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ ছিল। মতভেদ দুই প্রকার। (১) যে সব বিষয়ে মতভেদ করার সুযোগ আছে—উহাতে মতভেদ করা। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নহে—এরূপ শাখা-প্রশাখায় এই প্রকার মতভেদ হইয়া থাকে। যেমন, মুজতাহিদগণ ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে এই প্রকার মতভেদ হইয়াছে। এ সমস্ত মতভেদ শুধু আমলের ক্ষেত্রে হইয়াছে, আকায়েদের ক্ষেত্রে সকলেই ছিলেন একমত। আকায়েদেও মতভেদ হইয়া থাকিলে তাহা অপ্রধান শাখা-প্রশাখায় হইয়াছে। পূর্বে যে সব বিষয়ে সন্দেহও ছিল না, দুঃখের বিষয়, এই যুগে ঐ সব বিষয়েও মতভেদ শুরু হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে নব্য শিক্ষার বদৌলতে এবং ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে প্রধান আকায়েদেও মতদ্বৈধতা হইতেছে। ধর্মের প্রতি মহব্বত ও আলেমদের সংসর্গ না থাকাও ইহার অন্যতম কারণ।

**অনিষ্টের কারণঃ** আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে যদিও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাপক ছিল না এবং তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ২।৪।১০ জন লোকই আলেম ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত উপকারী দুইটি গুণ ছিল। একটি ধর্মের প্রতি মহব্বত ও অপরটি আলেমদের সংসর্গ লাভ। বর্তমান যুগের মুসলমান ভাইগণ ধর্মীয় শিক্ষা বর্জন করার সঙ্গেসঙ্গে এই দুইটি গুণও বর্জন করিয়াছেন। বলিতে কি, ইহাই আমাদের যাবতীয় অনিষ্টের মূল। চিকিৎসকের কাছে না গেলে কেহ আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুস্থতা লাভের আকাঙ্ক্ষী, সেই চিকিৎসকের কাছে যায়। আজকাল মুসলমান ভাইদের মনে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের প্রতিই টান নাই। এই কারণে তাহারা ধর্মীয় চিকিৎসকদের কাছে যায় না। ফলে তাহাদের ঈমান ও ধর্ম বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে, অথচ তাহারা মোটেই টের পাইতেছে না। রোগী আপন রোগ টের পায় না, ইহার ন্যায় মারাত্মক অনিষ্ট আর কি হইতে পারে? এই প্রকার রোগী যদি সুস্থ ব্যক্তিকে রোগী মনে করে, তবে ইহা আরও সর্বনাশের কথা। জনৈক নাক-কান কাটা ব্যক্তি নাকবিশিষ্ট লোকদিগকে 'নাকী' বলিয়া ডাকিত। মুসলমান ভাইদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাহারা প্রাচীন কামেল ঈমানদার ব্যক্তিদিগকে সুস্থ তো মনে করেই না; উপরন্তু তাঁহাদের নামে বিভিন্ন অপবাদ রটনা করে, যদ্দরুন তাহাদিগকে এইসবের খণ্ডনে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অদ্ভুত উল্টা যমানা বটে!

বন্ধুগণ! প্রাচীন লোকদের মধ্যে যে গোনাহ্‌গার ও ফাসেক ছিল না এমন নহে। তবে তাহারা আলেমদের সম্মুখে মাথা নত করিয়া ফেলিত। পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলে তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িত। তাহারা নিজদিগকে ধর্ম বিষয়ে মতামতের অধিকারী মনে করিত না। ফলে তাহাদের ঈমান নিরাপদ ছিল। অপর পক্ষে যেখানে নব্যশিক্ষার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে এবং

www.almodina.com

শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে, সেখান হইতে ঈমান বিদায় নিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের মনে না ধর্মের প্রতি টান আছে, না ধার্মিকদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। প্রত্যেকেই ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেকে মতামতের অধিকারী মনে করে। মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে তাহারা আলেমদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয়। হাঁ, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি যদি ধর্মের প্রতি টান রাখে এবং বুযুর্গদের সহিত উঠাবসা করে, তবে তাঁহার ঈমানের কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টির সমাবেশ ঘটে। এই প্রকার মহব্বত ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কবি বলেনঃ

دریں زمانه رفیقے که خالی از خلل است ـ صراحی مے ناب وسفینه غزل است

(দরীঁ যমানা রফীকে কেহ খালী আয খলল আস্ত + ছোরাহী মায়ে নাব ও সফিনায়ে গযল আস্ত)
"এই যমানায় নির্দোষ সঙ্গী হইল খোদার মহব্বত ও দ্বীনী শিক্ষা।"

صراحی مے ناب 'দ্বারা মহব্বত বুঝান হইয়াছে।' ইহা কবির নিজস্ব পরিভাষা। سفینه غزل বলিয়া ধর্মীয় শিক্ষা বুঝান হইয়াছে। ইহা লাভ করার এক উপায় হইল মাদ্রাসায় পড়া। ইহা সম্ভব না হইলে বুযুর্গদের সহিত উঠাবসা করা। ইহাও সম্ভব না হইলে ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করা। তবে আলেমদের সংসর্গে থাকিয়া দৈনন্দিন পাঠ হিসাবে না পড়িলে শুধু পুস্তক পাঠ করিয়াই ধর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা যায় না; যদিও তাহা উর্দু বা বাংলা ভাষায় লিখিত থাকে। যেমন, চিকিৎসকের নিকট না পড়িয়া কেহ শুধু উর্দু বা বাংলা ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক পাঠ করিয়া প্রকৃত চিকিৎসক হইতে পারে না।

বর্তমান যুগের মানুষ এত বিভিন্ন ধরনের পুস্তক পাঠ করে যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যে কোন বিষয়ের পুস্তক চোখের সম্মুখে পড়ুক, অমনি তাহা পাঠ আরম্ভ করিয়া দেয়। লেখক সুবিজ্ঞ, কি অবিজ্ঞ সে দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না। বিভিন্ন জনের লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া আবার তাহারাই ইহার সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেয় যে, এই বিষয়টি অমুক অপেক্ষা অমুকে ভাল লিখিয়াছে। আরও বিপদ এই যে, তাহারা নিজেদের এই সিদ্ধান্তকে নির্ভরযোগ্যও মনে করে। জিজ্ঞাসা করি, সরকারী আইন না জানিয়াই যদি কেহ মোকদ্দমার ফয়সালা দেয়, তবে তাহার ফয়সালা নির্ভরযোগ্য হইবে কি? কখনই নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদার আইন-কানূন সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহার সিদ্ধান্তকে নির্ভরযোগ্য মনে করা বিস্ময়ের কথা বটে। এরূপ হইলে উকিল ব্যারিষ্টারের কোন প্রয়োজন থাকিত না। প্রত্যেকেই আইনের পুস্তক দেখিয়া মোকদ্দমার ফয়সালা করিতে পারিত। এক্ষেত্রে সকলেই একমত যে, সরকারী আইন বুঝা সকলের কাজ নহে; বরং যে ব্যক্তি রীতিমত ইহা অধ্যয়ন করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, একমাত্র তাহারই অভিমত নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খোদার আইন-কানূনের বেলায় কোন পরীক্ষা বা ডিগ্রী লাভ করা প্রয়োজনীয় মনে করে না। যে কেহ এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে। উর্দু ভাষায় লিখিত দুই চারিটি পুস্তক পাঠ করিয়াই তাহারা শরীঅতের ব্যাপারে মত প্রকাশে প্রস্তুত হইয়া যায়। কোন ব্যাপার বিবেকের আওতায় না পড়িলেই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে। বিবেকই হইল তাহাদের মতে একমাত্র মাপকাঠি। যেমন, জনৈক উস্তাদ তাহার একজন নির্বোধ শিষ্যকে শিখাইয়া দিয়াছিলঃ "তোমাকে কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে যদি জানা থাকে, বলিয়া দিও। আর জানা না থাকিলে 'ইহাতে মতভেদ আছে' বলিয়া দিও। (এইরূপে মূর্খতা প্রকাশ পাইবে না।) জিজ্ঞাসাকারী মনে করিবে যে, তুমি মাসআলা জান, কিন্তু মতভেদের কারণে

একদিক নির্দিষ্ট করিতেছ না। যেহেতু প্রচুর সংখ্যক মাসআলার মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে, এই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমার এই উত্তর নির্ভুল হইবে।" কিন্তু শিষ্যটি নিরেট বোকা হওয়ার কারণে কতক সর্ব-বাদিসম্মত মাসায়েলের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত উত্তর দিল। ফলে শেষ পর্যন্ত তাহার নির্বুদ্ধিতা গোপন রহিল না।

**আত্ম-প্রীতি দোষঃ** তেমনি মুসলমান ভাইগণও একটি নীতি মুখস্থ করিয়া লইয়াছে। অর্থাৎ, কোন ব্যাপার বোধগম্য না হইলেই উহাকে বিবেক বহির্ভূত আখ্যা দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ফলে তাহারা কোরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করিতে দ্বিধা করে না। তাহাদের মতে পুলসিরাত ও অন্যান্য যাবতীয় মো'জেযা বিবেক বহির্ভূত। এইভাবে তাহারা আকায়েদের অধ্যায়ে ছাটাই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মতানুযায়ী ঈমানের পূর্বোল্লিখিত অর্থ শুদ্ধ নহে; বরং ঈমানের অর্থ হইল হযরত (দঃ)-এর বর্ণিত ঐ সমস্ত বিষয় মানিয়া লওয়া, যাহা তাহাদের বিবেকের আওতাধীন।

আমি তাহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতেছিঃ শরীঅতে যে সমস্ত বিষয় বিবেক বিরুদ্ধ রহিয়াছে, উহা কাহার বিবেকের বিরুদ্ধ? আপনাদের, না সকল বুদ্ধিমান চিন্তাবিদদের? সমস্ত চিন্তাবিদদের বিবেকের বিরুদ্ধ হওয়া স্বীকার করি না। কেননা, প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন আলেমগণ এইগুলিকে বিবেক-বিরুদ্ধ আখ্যা দেন না। তাঁহারা সর্বকালেই এই সমস্ত বিষয় হুবহু শরীঅতের বর্ণনা অনুযায়ী স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাই ছাহাবা, তাবেয়ীন ও অন্যান্য জ্ঞানী মনীষিগণ প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী ঐগুলি বিশ্বাস করিয়াছেন। অপর পক্ষে যদি বলেন যে, আপনাদের বিবেকের বিরুদ্ধে, তবে ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু আপনাদের বিবেকের বিরুদ্ধে হইলে ঐ সমস্ত বিষয় ভুল ও অগ্রহণীয় হইবে, তাহা স্বীকার করা যায় না। কেননা, অনেক সরকারী আইন আপনাদের বিবেক বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আইনবিদদের উপর নির্ভর করিয়া আপনারা তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

আমি আরও জিজ্ঞাসা করি, মায়ের গর্ভ হইতে আপনারা যেভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ আপনাদের বিবেকের আওতাধীন? তবে যেহেতু দিবারাত্র আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি, এই কারণে আমরা ইহাতে বিস্ময় বোধ করি না। দিবারাত্র প্রত্যক্ষ না করিলে এবং শুধু বর্ণনা মারফত বিষয়টি বুঝিলে তাহা কখনও বোধগম্য হইত না।

বিষয়টি এইভাবে পরীক্ষা করা যায়ঃ কোন একটি নবজাত শিশুকে এইভাবে প্রতিপালন করুন, যাহাতে সে মায়ের গর্ভ হইতে শিশুর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারটি ঘুনাক্ষরেও জানিতে বা দেখিতে না পারে। অতঃপর তাহাকে শিশুর জন্মগ্রহণ পদ্ধতি বাদ দিয়া অন্যান্য যাবতীয় দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় যত ইচ্ছা শিক্ষা দিন। সে বি, এ; এম, এ পাশ করিয়া ফেলিলে এক দিন তাহাকে বলুন, মিয়া, তুমি কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিতে পার কি? প্রথমে তোমার পিতা তোমার মাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। ফলে কয়েক ফোঁটা বীর্য তোমার মায়ের গর্ভাশয়ে পতিত হয়। যেখানে থাকা অবস্থায় উহা প্রথমে রক্ত অতঃপর জমাট রক্ত ও পরে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর মাংসপিণ্ডে অস্থি গঠিত হইয়া পূর্ণদেহে রূপান্তরিত হয়। এরপর উহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত উহা গর্ভাশয়ে রক্ত দ্বারা প্রতিপালিত হয়। নয় মাস পরে তুমি মায়ের লজ্জাস্থান দিয়া ধরাধামে আগমন করিয়াছ। অতঃপর গর্ভাশয়ের রক্ত দুধের আকৃতি ধারণ করিয়া মায়ের বক্ষে প্রবাহিত হইয়াছে এবং উহা পান করিয়া তুমি দুই বৎসর পর্যন্ত প্রতিপালিত হইয়াছ।

www.almodina.com

এইরূপ বলিলে এই জ্ঞানী ছেলেটি প্রাণপণে ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিবে, "ইহা হইতে পারে না। এক ফোঁটা বীর্য হইতে এরূপ সুন্দর সুঠাম দেহ গঠিত হওয়া ও মায়ের অপ্রশস্ত লজ্জাস্থান দিয়া বাহির হইয়া আসা বিবেক বহির্ভূত কথা।"

বলুন, বিবেক বহির্ভূত হইলেই তাহা ভুল এই নীতি মানিয়া লইলে মায়ের উদর হইতে জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারটিও ভুল হইয়া যায় নাকি? আসল কথা এই যে, আপনারা অভ্যাসবিরুদ্ধ ব্যাপারকেই বিবেকবিরুদ্ধ আখ্যা দিয়া বসেন। উপরোক্ত ছেলেটির ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছে। সে যেহেতু শিশুর জন্মগ্রহণ ব্যাপারটি কখনও দেখে নাই ও শুনে নাই, এই কারণে সে উহাকে বিবেক বিরুদ্ধ আখ্যা দিয়াছে। আপনি এ ব্যাপারে অভ্যস্ত, তাই আপনি ইহাকে বিবেক বিরুদ্ধ বলেন না। অভ্যস্ত না হইলে আপনিও ছেলেটির ন্যায় বলিয়া বসিতেন। ইহা জানা কথা যে, বিবেক বিরুদ্ধ বিষয় বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না। অথচ আপনি অনেক চাক্ষুষ ও বাস্তব বিষয়কেও বিবেক বিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন। সুতরাং আসলে উহা বিবেক বিরুদ্ধ নহে।

**অভ্যাস বিরুদ্ধ ও বিবেক বিরুদ্ধের পার্থক্য ঃ** প্রকৃতপক্ষে অভ্যাস বিরুদ্ধ কাজকেই বিবেক বিরুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়। কোন বিষয় যথার্থ হওয়ার পক্ষে অভ্যাস বিরুদ্ধ হওয়া ক্ষতিকর নহে। ইহা অবান্তর হওয়ারও প্রমাণ নহে। নতুবা পূর্বোক্ত ছেলেটি যে মাতার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করা অস্বীকার করে, তাহাও নির্ভুল মানিয়া লইতে হইবে। এ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় আমরা কিছুদিন পূর্বেও অসম্ভব মনে করিতাম; কিন্তু এখন তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহাও ভুল বলিতে হইবে। (যেমন, রেলগাড়ীর ঘণ্টায় ৬০ মাইল অতিক্রম করা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে লণ্ডন হইতে তারযোগে সংবাদ আসা ইত্যাদি।)

দুনিয়াতে আরও বহু বিষয় অভ্যাস বিরুদ্ধ দেখা যায়। আমি একটি চারি পা বিশিষ্ট মুরগীর বাচ্চা দেখিয়াছিলাম। (কিছুদিন পূর্বে দিল্লীর প্রদর্শনীতে দুইটি বালিকা আসিয়াছিল। তাহাদের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পৃথক পৃথক ছিল; কিন্তু দুইজনের কোমর একত্রে সংযোজিত ছিল। প্রস্রাবের পথও পৃথক পৃথক ছিল, কিন্তু দুইজনের এক পথেই প্রস্রাব বাহির হইত।) কাজেই অভ্যাস বিরুদ্ধ বিষয়ে এমন কোন নিয়ম নাই যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন বিষয় স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং অভ্যাস বিরুদ্ধ হইলেই তাহা অস্বীকার করা যায় না। আপনার নাস্তি হইতে অস্তিত্বে আসাও একটি অভ্যাস বিরুদ্ধ বিষয়। কেননা, অভ্যাসের চাহিদা হইল প্রত্যেক বিষয় স্ব স্ব অবস্থায় থাকা। যাহা অস্তিত্বহীন তাহা অস্তিত্বহীন থাকা এবং যাহা বিদ্যমান তাহা লয় প্রাপ্ত না হওয়া। কিন্তু আমরা দিবারাত্র এই চাহিদার বিরুদ্ধে কাজ হইতে দেখিতেছি। হাজার হাজার অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বিদ্যমান বস্তু লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং কোন বিষয় অভ্যাস বিরুদ্ধ হইলেই তাহা অস্বীকার্য হইয়া যায় না।

আপনি অভ্যাস বিরুদ্ধ ও বিবেক বিরুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করেন না। ইহা নিতান্তই ভুল। শুনুন, আমি এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছি। যে সমস্ত বিষয় বিবেকের দৃষ্টিতে সম্ভবপর কিন্তু আমাদের চোখের সম্মুখে তাহা ঘটে না বলিয়া কঠিন ও অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাহা অভ্যাস বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে যাহা বিবেকের দৃষ্টিতেই সম্ভবপর নহে এবং উহার অসম্ভবপরতা সম্বন্ধে বিবেকের কাছে সুনির্দিষ্ট যুক্তি আছে, উহাকে বিবেক বিরুদ্ধ বলা হয়।

সুতরাং যাহারা আখেরাতের বিষয় তথা পুলসিরাত, আমল ওযন করা ইত্যাদিকে বিবেক বিরুদ্ধ মনে করে, তাহারা উহাদের অসম্ভব হওয়ার পক্ষে সুনির্দিষ্ট যুক্তি উপস্থিত করুক। ইহা নিশ্চিত

www.almodina.com

কথা যে, তাহারা এরূপ কোন যুক্তি উপস্থাপিত করিতে পারিবে না। বেশীর বেশী ইহাই বলিবে, এগুলি কিরূপে হইবে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে, ইহাদের কোন নযীর দেখাও ইত্যাদি। বস্, আজকালকার লোকদের যাবতীয় সন্দেহের সার হইল এই যে, কোন নযীর পাওয়া যায় না; কাজেই বিষয়টি অসম্ভব। অদ্ভুত যবরদস্তির যুগ বটে! সত্য বলিতে কি, কোন বিষয় প্রমাণিত হওয়ার তাৎপর্যই তাহাদের জানা নাই। নতুবা নযীর পাওয়া যাওয়ার উপর প্রমাণিত হওয়া নির্ভরশীল মনে করিত না। (আমি বলি, যে সকল আশ্চর্যজনক বস্তু আজকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিছুদিন পূর্বে ইহাদের কোন নযীর কাহারও নিকট ছিল কি? যদি বলেন, ছিল না, তবে তখন উহা বিবেক বিরুদ্ধ ও অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় পরে তাহা বাস্তবরূপ লাভ করিল কিরূপে? অতএব, নযীর পাওয়া যাওয়ার উপর কোনকিছুর প্রমাণ নির্ভরশীল নহে।) নযীর পেশ করার উদ্দেশ্য একমাত্র ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবতার দাবী করে, নযীর পেশ করা তাহার পক্ষে মোটেই জরুরী নহে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এই বলিয়া দাবী করে যে, ইহা অভ্যাস বিরুদ্ধ মো'জেযা হিসাবে ঘটিয়াছে কিংবা কিয়ামতের দিন এইরূপ অভ্যাস বিরুদ্ধ কাজ হইবে, তাহার পক্ষে নযীর পেশ করা কোন মতেই জরুরী হইতে পারে না। (কেহ অভ্যাস সম্মত বিষয়ের দাবী করিলে তাহার পক্ষে নযীর পেশ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায়। আর যাহা অভ্যাসগত নহে বলিয়া দাবী করা হয়, তাহার নযীর চাওয়া বিস্ময়কর বটে।)

**বাস্তবতার স্বরূপঃ** এক্ষণে আমি বাস্তবতার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি। ইহা জানা না থাকার ফলেই আজকালের মানুষের রুচি বিগড়াইয়া গিয়াছে। ফলে আজকাল আলেমদিগকে মে'রাজ ও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নযীর পেশ করিতে বলা হয়। কোন সংবাদের সত্যতা বা কোনকিছু ঘটা যে নযীরের উপর নির্ভরশীল নহে, তাহা সর্ববাদী সম্মত বিষয়। যুক্তির সহিত যাহাদের সামান্যও পরিচয় আছে, তাহারা ইহা ভালভাবেই জানে। দাবীকারী নযীর বর্ণনা করিয়া দিলে উহা তাহার অনুগ্রহ। হাঁ, সংবাদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুইটি বিষয় জরুরী। প্রথমতঃ, সংবাদটি সম্ভবপর হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদদাতা সত্যবাদী হওয়া। যাবতীয় মো'জেযা ও আখেরাতের বিষয়াদির বেলায় উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণ করিয়া দিলেই আমাদের দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। এরপর এইসব বিষয় অস্বীকার করার অধিকার কাহারও থাকিবে না।

এখন আমরা মে'রাজ, পুলসিরাত, আমল ওযন করা ইত্যাদি বিষয়ের দলীল উপস্থিত করিতেছি। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, এগুলি বাস্তবপক্ষে সম্ভবপর। কাহারও ঐ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে সে অসম্ভব হওয়ার প্রমাণ উপস্থিত করুক। সম্ভবপরতা প্রমাণ করা আমাদের জন্য জরুরী নহে। কারণ, সম্ভবপর হওয়ার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন নাই; বরং অসম্ভব হওয়ার দলীল না থাকাই সম্ভবপর হওয়ার দলীল।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সংবাদের সংবাদদাতা সত্যবাদী, উহার বাস্তবতায় সন্দেহ করা যায় না। (উপরোক্ত বিষয়সমূহের সংবাদ একজন সত্যবাদী ব্যক্তি দিয়াছেন।) কাজেই এইগুলি বাস্তব ও প্রমাণিত। আমাদের এই দুইটি কথায় কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে উহার জওয়াব দেওয়া আমাদের কর্তব্য; কিন্তু ইহাদের নযীর পেশ করার দায়িত্ব আমাদের নহে।

উদাহরণতঃ, যদি কেহ বলে, পুলসিরাতের উপর দিয়া চলা বিবেক বিরুদ্ধ ব্যাপার। আমি ইহার উত্তরে বলিব, কেন, বিবেক বিরুদ্ধ ইহার কারণ দর্শাও। ইহা অসম্ভব হইল কিরূপে? কোন সূক্ষ্ম বস্তুর উপর পা রাখা অসম্ভব নহে। তদুপরি একজন সত্যবাদী ব্যক্তি ইহার সংবাদ দিয়াছেন।

www.almodina.com

এমতাবস্থায় ইহা অস্বীকার করার কারণ কি? কেহ প্রমাণসহ অস্বীকার করিলে কিংবা সত্যবাদী ব্যক্তির সংবাদ নহে বলিয়া প্রমাণ করিলে আমরা তাহার প্রমাণ শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইয়া গেলে পর নযীর পেশ করা আমাদের-দায়িত্ব নহে। নযীর জানা থাকিলেও আমরা তাহা বর্ণনা করিব না। আপনাকে সব বিষয় বলিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

**পুলসিরাতের স্বরূপ**ঃ প্রথমে পুলসিরাতের স্বরূপ বুঝা দরকার। কিন্তু আগেই বলিয়া দিতেছি যে, এ সম্পর্কিত বর্ণনা অকাট্য নহে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুলসিরাতের স্বরূপ অবগত হওয়া জরুরী নহে; বরং কার্যতঃ এ সম্পর্কে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করাই আসল কর্তব্য। তবে অনেকের মনের দুর্বলতা দূরীকরণার্থে আমি এই আলোচনার অবতারণা করিতেছি। তাহারা এইভাবেও পুলসিরাতের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে তাহাতে ক্ষতির কিছু নাই।

পুলসিরাতের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে চারিটি প্রাথমিক নীতি জানিয়া লওয়া দরকারঃ (১) আমাদের এই জড়জগৎ ছাড়া আরও একটি জগৎ আছে। (২) জগৎ পরিবর্তন হওয়ার ফলে কতক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, এই পৃথিবীর মধ্যেই আঞ্চলিক ব্যবধানের কারণে বিভিন্ন অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। (উদাহরণতঃ এখন এক অঞ্চলে রাত্রি কিন্তু অন্য অঞ্চলে দিন। আমাদের দেশে এখন গ্রীষ্মকাল, কিন্তু কোন কোন দেশে এখন শীতকাল। আমাদের এখানে ২৪ ঘণ্টায় একদিন হয়; কিন্তু কোন কোন এলাকায় ছয় মাসে দিন ও ছয় মাসে রাত্রি হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোরআনে বর্ণিত এক হাজার বৎসরের সমান একদিনের কথা শুনিয়া যাহারা উপহাস করে, তাহারা নির্বোধ বৈ কিছুই নহে। ইহা মোটেই অবিশ্বাস্য নহে। জড়জগতেই যখন বিভিন্ন অঞ্চলের দিবারাত্রির পরিমাণ বিভিন্ন হইতে দেখা যায় যে, কোন স্থানে ৬ মাসেও ১ দিন হয়, তখন জগৎ পরিবর্তন হওয়ার পর পরকালে এক হাজার বৎসরের সমান একদিন হইলে তাহাতে আশ্চর্যের কি থাকিতে পারে? (৩) পরিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। ইহা আয়ত্তেও নহে। (৪) জড়জগতে যাহা বস্তু নহে, আখেরাতে তাহা বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। যেমন আজকাল বিশেষ যন্ত্রাদি দ্বারা উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি ওযন করা হয়। অথচ পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকগণ এগুলিকে এমন অবস্তু বলিয়া জানিতেন, যাহার কোন ওযন বা পরিমাণ হইতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এগুলিও ওযনশীল বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেই আমি বলি যে, যতই নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই আখেরাতের বিষয়াদি বুঝা সহজ হইতেছে। কিয়ামতের দিন হাত-পা খোদার কাছে সাক্ষ্য দিবে—ইহার বড় দলীল হইতেছে, বর্তমান যুগের গ্রামোফোন। গ্রামোফোনের আত্মা নাই, তা সত্ত্বেও ইহা কথা বলিতে পারে। সুতরাং মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আত্মার মিশ্রণ আছে—উহা কথা বলিলে আশ্চর্য কি?

নাসায়ী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—রাসূলে খোদা (দঃ) একদা সূর্যগ্রহণের নামাযান্তে বলিলেনঃ "আমি মসজিদের প্রাচীরের নিকট বেহেশত ও দোযখ দেখিতে পাইয়াছি।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ হাসিতে শুরু করে যে, বেহেশত ও দোযখ যমীন ও আসমান অপেক্ষা অনেক বড় বলা হয়। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদের প্রাচীরে ইহাদিগকে কিরূপে দেখিলেন? খোদা তা'আলা ফটো ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করাইয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ফটোর মধ্যে বৃহত্তম জিনিসও ক্ষুদ্রতম আকারে দেখানো যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম

বস্তুও পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকৃতিতে দেখানো সম্ভব। সুতরাং খোদা আপন কুদরতের বলে জান্নাত ও দোযখের ফটো মসজিদের দেওয়ালে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং হযরত (দঃ)-এর দৃষ্টিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি পয়দা করিয়া দিয়াছেন—যাহাতে তিনি ছোট ফটো-গুলিকে উহাদের আসল আকৃতিতে দেখিতে পান। হাদীসে ব্যবহৃত শব্দও এদিকে ইঙ্গিত করে। হযরত (দঃ) এরূপ বলেন নাই যে, জান্নাত ও দোযখ পৃথিবীতে চলিয়া আসিয়াছিল; বরং তিনি বলিয়াছিলেনঃ مُثِّلَتْ لِىَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ অর্থাৎ, "জান্নাত ও দোযখের প্রতিকৃতি আমাকে দেখানো হইয়াছে।"

উপরোক্ত কারণেই নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইলে আমি আনন্দিত হই। কেননা, ইহাতে শরীঅতের ব্যাপারে দুর্বোধ্য ধারণার নিরসন হয়। উত্তাপ ও শৈত্য পরিমাপ করা এ যুগের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার বটে! এই ঘরে কত ডিগ্রী উত্তাপ আছে এবং কত ডিগ্রী শৈত্য আছে, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা জানা যায়। (থার্মোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে জ্বরাক্রান্ত রোগীর শরীরের উত্তাপ পরিমাপ করা হয়।) উত্তাপ ওযন করার কথা কোন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে জানাইলে সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইবে যে, উত্তাপও কি ওযন হইতে পারে! বস্তু নহে—এমন জিনিসের পরিমাপ যখন দুনিয়াতেই শুরু হইয়াছে, তখন আখেরাতে এগুলিই বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলে তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে?

একটি গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি লইয়া ওযন করিলে যে পরিমাণ হইবে, গরম পানি লইয়া ওযন করিলে সেই পরিমাণ হইবে না। অথচ গ্লাসে পানির উচ্চতা উভয় অবস্থায়ই সমান ছিল। এমতাবস্থায় ওযনের এই তারতম্য কেন? ইহাতে বুঝা যায় যে, উত্তাপ ও শৈত্যের নিজস্ব ওযন আছে—যদিও তাহা পানির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ধরা যায়। সুতরাং ইহকালে যাহা বস্তু নহে, উহা আখেরাতে বস্তুতে পরিণত হইয়া যাওয়া আশ্চর্যজনক নহে।

চিকিৎসকদের মতে পিত্ত প্রধান ব্যক্তি প্রায়ই স্বপ্নে অগ্নি দেখিতে পায়। এখানে পিত্তের উত্তাপ যাহা বস্তু নহে—স্বপ্নলোকে অগ্নি তথা বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আখেরাতেও এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

উপরোক্ত চারিটি ভূমিকার পর এখন পুলসিরাতের স্বরূপ বুঝুন। অবশ্য ইহা বর্ণনার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ থাকা চাইঃ

حدیث مطرب و مے گو و راز دهر کمتر جو

که کس نکشود و نکشاید بحکمت ایں معما را

(হাদীসে মুতরিব ও মায় গো ও রাযে দহর কমতর জো
কেহ্ কস্ নাকাশুদ ও নাকুশায়াদ বহেকমত ইঁ মোআম্মা রা)

অর্থাৎ, 'খোদাপ্রেমিক ও প্রেমের কথা বল। সৃষ্টি-রহস্যের পিছনে পড়িও না। কেননা, কেহ জ্ঞান দ্বারা এই ধাঁধার সমাধান করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না।'

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা বর্ণনা করা আমার দায়িত্ব নহে। তবে তৃপ্তি লাভের নিমিত্ত অনুগ্রহস্বরূপ বলিয়া দিতেছি। পুলসিরাতের স্বরূপ হইল শরীঅত। ইহাই দুনিয়াতে পুলসিরাতের নযীর। পার্থক্য এই যে, এখানে ইহা অবস্তুবাচক বিষয় এবং আখেরাতে ইহাই বস্তুর রূপ ধারণ করিবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ইহা পুলসিরাতের পূর্ণাঙ্গ নযীর।

www.almodina.com

**শরীঅতের পথঃ** পুলসিরাত যেমন চুল হইতেও সূক্ষ্ম এবং তলোয়ার হইতেও ধারাল হইবে, তদ্রূপ শরীঅতের পথও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঙ্কটপূর্ণ। ইহার উপর দৃঢ়তা বজায় রাখিয়া চলা সকলের পক্ষে সহজ নহে। কারণ, এল্‌ম ও আমল এই দুইটি বিষয় লইয়া শরীঅত গঠিত। সুতরাং এই পথে চলিতে হইলে প্রথমে দুইটি শক্তির প্রয়োজন। (১) জ্ঞানশক্তি ও (২) কর্মশক্তি। জ্ঞানশক্তির সম্পর্ক বিবেকের সহিত এবং কর্মশক্তির সম্পর্ক ইচ্ছার সহিত। কর্ম কতক উপকারী ও কতক অপকারী। সুতরাং ইহাতে কখনও উপকার লাভ করা এবং কখনও অপকার দূর করার প্রয়োজন হয়। যে ইচ্ছা উপকার লাভের সহিত সংশ্লিষ্ট, উহাকে কামনাশক্তি বলা হয় এবং যে ইচ্ছা অপকার দূর করার সহিত সম্পর্কযুক্ত, উহাকে ক্রোধশক্তি বলা হয়। অতএব, শরীঅতের উপর পূর্ণরূপে আমল করিতে হইলে মোটামুটি তিনটি শক্তির প্রয়োজন। (১) জ্ঞানশক্তি, (২) কামনাশক্তি ও (৩) ক্রোধশক্তি।

এইগুলিকেই চরিত্রের মূলনীতি আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাদের প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া স্তর আছে। (১) বাহুল্য, (২) স্বল্পতা ও (৩) মধ্যবর্তিতা। তন্মধ্যে মধ্যবর্তিতাই হইতেছে শরীঅত। শরীঅতে জ্ঞান বা বিবেকের বাহুল্য ও স্বল্পতার স্থান নাই; বরং ইহাতে মধ্যবর্তিতা সর্বতোভাবে প্রয়োজন। ইহাই হেকমত বা জ্ঞান। বিবেকের বাহুল্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। বিবেক প্রাধান্য লাভ করিলে সবকিছুতেই সন্দেহ দেখা দেয়। ফলে মানুষ সন্দেহপরায়ণ হইয়া পড়ে।

দার্শনিকদের মধ্যে 'লা আদরিয়া' নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহারা বলে, "অনেক সময় আমরা দূর হইতে কোন আকৃতি দেখিয়া উহাকে মানুষ মনে করি, কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায়, উহা মানুষ নহে, গাধা। একজনকে অনেকে সুশ্রী মনে করে, আবার অনেকেই তাহাকে কুশ্রী বলিয়া জানে। এক বস্তুকে কেহ মিষ্ট আখ্যা দেয়, আবার জ্বরাক্রান্ত রোগী উহাকেই তিক্ত বলে। তদ্রূপ কোন যুক্তিকে একদল বিশুদ্ধ বলিলে অন্যদল উহাকে ভুল আখ্যা দেয়। সুতরাং আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এত তফাৎ ও ভুলভ্রান্তি থাকা অবস্থায় ইহার উপর কিরূপে ভরসা করা যায়? আমাদের ইন্দ্রিয় যে বস্তুকে মানুষ বলিবে, উহা যে মানুষই হইবে, গাধা হইবে না, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। আমরা যাহাকে জমিন বলি, উহা জমিনই হইবে আসমান হইবে না, তাহাও জোর গলায় দাবী করা যায় না। কারণ, আমাদের দৃষ্টি ভুল করিতে পারে।" এইরূপ মতবাদের ফলে তাহারা প্রত্যেক বিষয়েই সন্দেহ পোষণ করে। বলিতে কি, সন্দেহের ব্যাপারেও তাহারা সন্দেহ করে।

فَهُوَ شَاكٌّ وَشَاكٌّ فِىْ اَنَّهٗ شَاكٌّ

**বিবেকের সীমাঃ** বন্ধুগণ! বিবেক সীমাতিরিক্ত বাড়িয়া গেলে অশেষ পেরেশানী পোহাইতে হয়। জীবনকেও ধ্বংস করিয়া দেয়। বড় বড় দার্শনিকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ইহাই কারণ। তাহারা বিবেকের আওতা বহির্ভূত বিষয়েও বিবেককে কাজে লাগাইয়াছে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে প্রত্যেক বিষয়ই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

আমি প্রায়ই বিবেকের একটি উদাহরণ দিয়া থাকি। আমাদের পক্ষে বিবেক পর্বতারোহীর পক্ষে ঘোড়ার ন্যায়। কেহ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া পর্বতের নিকট পৌঁছার পর যদি ঘোড়ায় চড়িয়াই পর্বতের উপরিভাগে যাইতে চায়, তবে তাহা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। কারণ, এই ব্যক্তি কোন খাড়া ঢালু পথে পৌঁছামাত্রই ঘোড়াসহ সজোরে নীচে পতিত হইবে। অপর পক্ষে যদি কেহ পর্বতে ঘোড়া দ্বারা কোন কাজ চলিবে না ভাবিয়া সমতল সড়কেও উহা ব্যবহার না করে এবং

পায়ে হাঁটিয়াই বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া যায়, তবে সে-ও পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত সে পর্বতারোহণে সমর্থ হইবে না। সুতরাং উল্লিখিত দুই ব্যক্তিই ভ্রান্ত। প্রথম ব্যক্তি ঘোড়াকে এত কার্যক্ষম মনে করে যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহাকে কাজে লাগাইতে চায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি উহাকে একেবারে বেকার ভাবিয়া পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছিতেও উহার সাহায্য লয় না। এখানে নির্ভুল কথা হইল এই যে, পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছিতে ঘোড়া কার্যক্ষম, কিন্তু পাহাড়ে আরোহণের পক্ষে সম্পূর্ণ বেকার। উহার জন্য অন্য কোন যানবাহনের প্রয়োজন।

বিবেকের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহাকে কোন কাজে না লাগানো নির্বুদ্ধিতা, তেমনি ইহাকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানোও ভুল। শুধু তওহীদ ও রেসালাতকে বুঝার বেলায় বিবেককে কাজে লাগান। খোদার কালাম যে খোদারই কালাম তাহাও বিবেক দ্বারা বুঝান। এর পর ধর্মের শাখা-প্রশাখায় বিবেক খাটানো উচিত নহে। সেক্ষেত্রে খোদা ও রাসূলের নির্দেশের সম্মুখে মাথা নত করিয়া দেওয়া কর্তব্য—অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝুন বা না বুঝুন।

রাষ্ট্রীয় আইন স্বীকৃত করানোর বেলায় প্রথমে এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, উদাহরণতঃ ইনি বাদশাহ্ পঞ্চম জর্জ। অতঃপর যাবতীয় আইন-কানূন সম্বন্ধে বলিয়া দেওয়া হয় যে, এইসব বাদশাহ্রই আইন-কানূন; কাজেই মানিতে হইবে। এই উপায়ে আইন স্বীকৃত করানো সহজ। জ্ঞানিগণ এই উপায়ই অবলম্বন করেন। কিন্তু কেহ পঞ্চম জর্জকে বাদশাহ্ স্বীকার করিয়া তাহার প্রত্যেক আইন-কানূনে বিতর্ক উত্থাপন করিয়া উহা মানিতে অস্বীকার করিলে সে সর্বত্র লাঞ্ছিত হইবে নাকি? এক্ষেত্রে জ্ঞানিগণ ইহাই বলিবেন যে, বাদশাহ্কে বাদশাহ্ বলিয়া এবং তাঁহার আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন জানার পর উহা স্বীকার না করার কোন কারণ নাই; বরং ইহাকে স্বীকৃতি দিতেই হইবে—বুঝে আসুক বা না আসুক।

অতএব, রাষ্ট্রপতিকে চিনিবার বেলায় বিবেক দ্বারা কাজ লওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু এর পর বিবেক খাটানোর অনুমতি নাই। কাজেই ধর্মীয় ব্যাপারে আপনি শেষ পর্যন্ত বিবেক খাটাইতে চান কোন্ যুক্তিতে? ইহা নিতান্তই ভুল। লাঞ্ছনা ভোগ করা ছাড়া ইহাতে কোন লাভ নাই। খোদাকে স্বীকার করিলে তাঁহার রাসূলকেও রাসূল বলিয়া এবং তাঁহার কালামকেও কালাম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এর পর খুঁটিনাটি নির্দেশসমূহে বিতর্ক উত্থাপন করার কোন অধিকার আপনার নাই। এরূপ করিলে সকলেই আপনাকে বোকা মনে করিবে এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আপনি হেয় প্রতিপন্ন হইবেন। সত্য এই যেঃ

عزیـــزیکـه از درگہش سر بتـافت ـ بہـر در که شد هیـچ عزت نیافت

(আযীযে কেহ্ আয দরগাহশ সর বতাফ্ত + বহর দর কেহ্ শোদ হীচ ইয্যত না ইয়াফ্ত)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সে যে কোন দরবারেই যাক না কেন, কোন ইয্যতই পাইবে না।"

মোটকথা, যে পর্যন্ত বিবেক কাজ দিতে পারে, ঐ পর্যন্ত উহা দ্বারা কাজ নিন। যেখানে উহা কার্যক্ষম নহে, সেখানে পরিত্যাগ করুন এবং নির্দেশের অনুসরণ করুন। বিবেকেরও একটি সীমা আছে। কারণ ইহা একটি শক্তি মাত্র। যেমন দৃষ্টি একটি শক্তি। ইহার জন্য সীমা নির্দিষ্ট আছে। সীমার বাহিরে সে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখিতে পায় না। শরীঅতের ব্যাপারে বিবেকও তদ্রূপ। শুধু মূলনীতি পর্যন্ত কাজে আসে এরপর শাখা-প্রশাখায় একা ইহা দ্বারা কাজ হয় না। সেখানে

www.almodina.com

ওহীর দূরবীনের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। আমাদের কানও একটি শক্তি। ইহা নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে আওয়ায ধরিতে পারে। সীমার বাহিরে হইলে টেলিফোনের আশ্রয় লইতে হয়। পদযুগলের কার্যক্ষমতারও একটি সীমা আছে। সীমাতিরিক্ত কাজ নিতে হইলে যানবাহন ছাড়া চলে না। অতএব, সকল শক্তিই সীমাবদ্ধ। কাজেই বিবেক শক্তিও সীমাবদ্ধ না হইয়া পারে না। সীমার বাহিরে ওহীর সাহায্য নিতে হয়, অন্যথায় স্মরণ রাখিও যে, আজীবন রাস্তা পাইবে না। ওহীর নির্দেশের ব্যাপারে বিবেক কোন কাজে আসে না। সেখানে রাসূলের অনুসরণ ব্যতীত গতি নাই।

কবি বলেনঃ

خلاف پیمبر کسے رہ گزید ـ کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

(খেলাফে পয়াম্বর কাসে রাহ্ গুযীদ + কেহ্ হরগিয বমন্‌যিল নাখাহাদ রসীদ)

"যে কেহ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নাতের বিপরীত রাস্তা অন্বেষণ করিবে, সে কিছুতেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবে না।"

**তক্‌লীদের আবশ্যকতাঃ** বন্ধুগণ, দুনিয়াতেও আপনারা অনেক ক্ষেত্রে বিবেককে পরিত্যাগ করত একজন না একজনের অনুসরণ করেন। আপনি যখন অসুস্থ হন, তখন কোন্ চিকিৎসক পারদর্শী ও অভিজ্ঞ এবং কে অপারদর্শী ও অনভিজ্ঞ, বিবেক দ্বারা শুধু তাহাই জানিয়া লন। কোন চিকিৎসক অভিজ্ঞ বলিয়া পছন্দ হইয়া গেলে আপনি তাহার নিকট যান। সে নাড়ী দেখিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেয়। তখন আপনি কি তাহাকে এইরূপ বলেন যে, এই ঔষধটি কেন লিখিলেন, অমুকটি লিখিলেন না কেন? কিংবা এই ঔষধটি মাত্র চার মাষা লিখিলেন কেন, ছয় মাষা লিখিলেন না কেন? কোন রোগী ডাক্তারের সহিত এইরূপ তর্ক করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কেহ করিলে বুদ্ধিমান মাত্রই তাহাকে বোকা আখ্যা দিবে। চিকিৎসকও পরিষ্কার বলিয়া দিবে, "মিয়া, যদি আমাকে চিকিৎসক মনে করিয়া এখানে আসিয়া থাক, তবে আমার ব্যবস্থাপত্রে কোনরূপ প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নাই। করিলে ইহার অর্থ হইবে যে, তুমি আমাকে চিকিৎসক মনে কর না, তবে আমার কাছে কেন আসিয়াছ?" চিকিৎসকের এই উত্তর জ্ঞানী মাত্রই সঠিক মনে করিবে।

অতএব, রাসূলকে রাসূল এবং কোরআনকে খোদার কালাম মানিয়া লওয়ার পরে 'বিবেকসম্মত নহে' এই দোহাই দিয়া কথায় তর্কের অবতারণা করা এবং বিবেককে উহার অনুগত করা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? বন্ধুগণ, রাসূলকে রাসূল মানিয়া লওয়ার পর তাঁহার প্রত্যেক কথাই বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে হইবে। একথা বলিবার অধিকার নাই যে, ইহা বিবেকসঙ্গত নহে। অন্যথায় অর্থ এই হইবে যে, আপনি রাসূলকে রাসূল এবং কোরআনকে খোদার কালাম মনে করেন না। পরিতাপের বিষয়, সাংসারিক ব্যাপারে আপনি বিবেকের সীমা স্বীকার করেন এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে বিবেক খাটানো অন্যায় মনে করেন; কিন্তু আখেরাতের বিষয়সমূহে বিবেকের সীমা স্বীকার করিতে চান না।

সাহেবান! নির্দিষ্ট সীমার পর বিবেককে ত্যাগকরত অন্যের অনুসরণ ব্যতীত যদি দুনিয়ার কাজকারবার চলিতে না পারে, তবে আখেরাতের কাজ চলিবে কিরূপে? দুনিয়ার কাজকারবার চোখে দেখা যায়। ইহাতে বিবেককে কিছু না কিছু কাজে লাগানো যাইতে পারে। তা সত্ত্বেও

www.almodina.com

ইহাকে ত্যাগ করিয়া পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করা হয়। অপরপক্ষে আখেরাতের বিষয়াদি লোক-চক্ষুর অন্তরালে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণ না করিয়া উপায় আছে কি ? এক্ষেত্রে বিবেক খাটাইলে তাহা "অন্ধের বক্র খীরের" ন্যায় হইবে।

ঘটনা এইরূপ ঃ একটি ছেলে জনৈক অন্ধ হাফেয সাহেবকে খীরের দাওয়াত করিতে আসিল। হাফেয সাহেব ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খীর কেমন জিনিস ?" ছেলে বলিল, "সাদা"। অন্ধের নিকট সাদা কালো সবই সমান। তাই তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, "সাদা কেমন ?" উত্তর হইল, "বকের ন্যায়"। হাফেয সাহেব বলিলেন, "বক কেমন" ? ছেলেটি আপন হাত বকের ঘাড়ের মত বক্র করিয়া বলিল, "এমন"। হাফেয সাহেব হাত বাড়াইয়া ছেলেটির হাতে হাত বুলাইয়া আকৃতিটি বুঝিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'আরে ভাই' খীর তো বড্ড বক্র জিনিস দেখা যাইতেছে, ইহা তো আমার গলায় আটকাইয়া যাইবে।

দেখুন, চোখে যাহা দেখা যায় না, তাহাতে বিবেক খাটাইলে এইরূপ পরিণতি দাঁড়ায়, যে খীর চিবাইতে ও গিলিতে মোটেই কষ্ট হয় না, তাহা এখন গলায় আটকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তবিকই অন্ধকে কেহ সাদা রং বুঝাইতে পারিবে না। হাফেয সাহেব সারা জীবন চেষ্টা করিলেও ইহা বুঝিতে পারিবেন না। এ ব্যাপারে কোন হিতাকাঙ্ক্ষী চক্ষুষ্মান ব্যক্তির অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

আপনি কোন বিলাতী লোককে আমের স্বাদ বুঝাইতে চাহিলে সে কিছুতেই বুঝিবে না। কারণ, সে কোন দিন আম খায় নাই। আপনি হয়তো বলিবেন, আম মিষ্ট। সে বলিবে, আমরা রোজই গুড় খাই। আম বোধ হয় গুড়ের মতই হইবে। বিলাতীকে বুঝাইবার একমাত্র পন্থা এই যে, তাহাকে একটি আম খাওয়াইয়া দিন। নতুবা তাহার উচিত আপনার কথা মানিয়া লওয়া এবং বিবেক খাটাইয়া উহার নযীর বাহির করার চেষ্টা না করা।

আখেরাতের বিষয়াদি পূর্ণরূপে বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে ইহার পন্থা এই যে, মৃত্যুর অপেক্ষা করুন। মৃত্যুর পর পুলসিরাত, আমল ওযন করা ইত্যাদি সবকিছুর স্বরূপ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। আর যদি দুনিয়াতে বুঝিতে চান, তবে কোরআন ও রাসূলের উক্তির অনুসরণ করুন এবং নযীর খোজাখুঁজির চেষ্টা হইতে বিরত থাকুন। নযীর দ্বারা আখেরাতের স্বরূপ বুঝার চেষ্টা হাফেয সাহেবের খীর বুঝার ন্যায় হইবে। এখন ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন যে, বিবেকের একটি সীমা আছে, উহা অতিক্রম করা খুবই ক্ষতিকর।

**বাহুল্য ও স্বল্পতার পরিণাম ঃ** বাহুল্য ও স্বল্পতা ক্ষতিকর বলিয়া চিকিৎসকগণও মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাকে রোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেননা, বিবেকের বাহুল্যের পরিণাম হইল অতিমাত্রায় সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠা। ইহার ফলে অন্তর ও মস্তিষ্ক উভয়ই দুর্বল হইয়া পড়ে।

জনৈক ব্যক্তি হালুয়া বিক্রয় করিত। দার্শনিক ফারাবী একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, كَيْفَ تَبْتَعُ الْحَلْوَاءَ "তুমি হালুয়া কিরূপে বিক্রয় কর ?" সে উত্তর দিল, كَذَا بِدَانِقٍ "এক দানেকে (মুদ্রায়) এই পরিমাণ।" ইহাতে ফারাবী বলিলেন, اَسْئَلُكَ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَتُجِيْبُنِىْ عَنِ الْكَمِّيَّةِ "আমি বিক্রয়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর তুমি পরিমাণ জানাইতেছ।" এই বলিয়া তিনি হালুয়া বিক্রেতার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া গেলেন।

ইহা হইল বিবেক বিসূচিকা যে, সর্বদাই ইহার পিছনে পড়িয়া থাকে, বিবেকের এই বাহুল্যের কারণেই দার্শনিকগণ পয়গম্বরদের সহিত মোকাবিলা করিয়াছেন। তাহারা শেষ পর্যন্ত পরাজয়

www.almodina.com

বরণ করিয়া নবুওত স্বীকার করিলেও সঙ্গেসঙ্গে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইনি মূর্খদের নবী, আমাদের জন্য নহে। আমাদের জন্য নবীর প্রয়োজন নাইঃ

نَحْنُ قَوْمٌ قَدْ هَذَّبْنَا نُفُوْسَنَا بِالْحِكْمَةِ *

"আমরা দর্শন দ্বারাই শিষ্টতা লাভ করিতে পারি।" ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ "তাহারা আপন জ্ঞানগরিমায় গর্বিত হইয়া পড়িয়াছে।" নবুওতের এল্‌ম যে, বিবেকের বহু ঊর্ধ্বে, তাহারা তাহা বুঝে নাই। 'ইলাহিয়্যাৎ' (খোদা ও আত্মা সম্বন্ধীয় দর্শন)-এর বর্ণনায় তাহারা বহু ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। আজকাল মুসলমানদের সাধারণ ছাত্রও উহা পাঠ করিয়া হাসি রোধ করিতে পারে না। ইহা হইল বিবেকের বাহুল্য সম্বন্ধে বর্ণনা। ইহার বিপরীতে আছে বিবেকের স্বল্পতা। উহাকে নির্বুদ্ধিতা বলা হয়। শরীঅতের দৃষ্টিতে এই উভয়টিই অকেজো ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে মধ্য পন্থাই কাম্য—যাহাকে হেকমত বলা হয়।

**শরীঅতের প্রাণঃ** বিবেক শক্তির ন্যায় কামনা শক্তির মধ্যেও তিনটি স্তর আছে। ইহাতে বাহুল্যের স্তরকে ফুযূর (পাপাচার) বলা হয়। ইহা শরীঅতে কিছুতেই কাম্য নহে। কারণ, ইহার পরিণতি হইল ফিস্‌ক (অবাধ্যতা)। কামনা শক্তির দ্বিতীয় স্তরের স্বল্পতায় মানুষ প্রয়োজনীয় উপকার লাভ হইতেও অকেজো হইয়া যায়। সুতরাং ইহাও শরীঅতে কাম্য নহে। ইহাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোপ পায়। অপর স্তর হইতেছে মধ্যবর্তিতার স্তর। ইহাকে ইফ্‌ফত (সাধুতা) বলা হয়। ইহাই শরীঅতে কাম্য।

এইরূপে ক্রোধশক্তির মধ্যেও তিনটি স্তর আছে। একটি বাহুল্যের স্তর। ইহাকে 'তাহাওওর' বলা হয়। ইহার অর্থ স্থান, কাল, পাত্র না দেখিয়া শুধু জোশ দেখানো। যেমন, আজকাল মানুষের মধ্যে ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়। যে কোন কাজে অন্ধের ন্যায় আমল করা হয়। লাভ বা ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করা হয় না। এই স্তরটি শরীঅতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নহে। ক্রোধশক্তির অপর স্তর হইল স্বল্পতার স্তর। ইহাকে ভীরুতা ও কাপুরুষতা বলা হয়। অর্থাৎ, প্রয়োজনের মুহূর্তেও সাহসিকতা প্রদর্শন না করা। উদাহরণতঃ কিছু সংখ্যক লোক ভীরুতা বশতঃ ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সম্মুখে আদব-তাহ্‌যীবের সহিত আপন প্রয়োজনের কথাও ব্যক্ত করিতে পারে না। এই স্তরটিও শরীঅতে কাম্য নহে। তৃতীয়ত, মধ্যবর্তিতার স্তর, ইহাকে 'শাজাআত' (বীরত্ব) বলা হয়। ইহাই শরীঅতে কাম্য। ইহার অর্থ যেখানে জোশ দেখানো প্রয়োজন এবং অপকারের চেয়ে উপকার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানেই জোশ দেখানো। অপর পক্ষে যেখানে জোশ দেখাইলে ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল, সেখানে জোশ প্রদর্শন হইতে বিরত থাকা।

অতএব, উত্তম চরিত্রের মূলনীতি তিনটি। (১) হিকমত, (২) সাধুতা ও (৩) বীরত্ব। এই তিনটির সমষ্টির নাম আদল (মধ্যপন্থা) ইহাই শরীঅতের সারবস্তু। কোরআনে বলা হইয়াছেঃ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا 'আমি তোমাদিগকে মধ্যবর্তী উম্মতরূপে পরিণত করিয়াছি।' এই আয়াতেও উপরোক্ত 'আদল' বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ, আমি (আদি-অন্ত ন্যায়নীতিতে পূর্ণ একটি শরীঅত দান করিয়া) এই উম্মতকে মধ্যবর্তী উম্মতে অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ উম্মতে পরিণত করিয়াছি।

আরও একটি নীতি লক্ষ্য করুনঃ মধ্যবর্তিতা দুই প্রকার। একটি যথার্থ ও অপরটি প্রচলিত। যথার্থ মধ্যবর্তিতা এমন একটি রেখা যাহা একেবারে মধ্যস্থল দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। ইহা

www.almodina.com

বিভাজ্য নহে। প্রচলিত মধ্যবর্তিতা হইতেছে যেমন বলা হয় যে, এই স্তম্ভটি ঘরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে স্তম্ভটি যথার্থ মধ্যবর্তী নহে। কারণ, ইহাকে বিভক্তকরত ইহার মধ্য হইতেও মধ্যবর্তী বস্তু বাহির করা যাইতে পারে।

সুতরাং শরীঅত এমন একটি মধ্যবর্তী বিষয়—যাহাতে বাহুল্য, স্বল্পতা ইত্যাদি কোন অংশ বাহির করা যায় না। এই যথার্থ মধ্যবর্তিতাই শরীঅতের প্রাণ এবং ইহাই পূর্ণত্ব। শরীঅতের এই প্রাণ কোনরূপে বিভাজ্য নহে। এরূপ মধ্যবর্তী পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা বাস্তবিকই সুকঠিন।

অতএব, বাহুল্য ও স্বল্পতা বর্জিত হওয়ার কারণে শরীঅত তলোয়ার হইতেও ধারাল এবং বিভাজ্য না হওয়ার কারণে চুল হইতেও সূক্ষ্ম। কারণ, চুলকেও কোন না কোনরূপে ভাগ করা যায়; কিন্তু শরীঅতের প্রাণ তথা যথার্থ মধ্যবর্তিতা কোনরূপেই বিভাজ্য নহে। কিয়ামত দিবসে এই যথার্থ মধ্যবর্তিতা বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া পুলসিরাত হইয়া যাইবে। মুসলমানদিগকে ইহার উপর দিয়া চলিতে বলা হইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সরলভাবে শরীঅতের উপর দ্রুততার সহিত চলিবে, সে আখেরাতেও পুলসিরাতের উপর দ্রুতগতিতে চলিতে পারিবে। কারণ, পুলসিরাত দুনিয়ার শরীঅতেরই ভিন্নরূপ। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরীঅতের উপর চলে নাই, কিংবা উদাসীনভাবে চলিয়াছে, সে আখেরাতেও পুলসিরাতের উপর চলিতে পারিবে না। কিংবা ধীর গতিতে চলিবে।

নিন, আমি পুলসিরাতেরও নযীর বর্ণনা করিয়া দিলাম। এখন বোধ হয় মনে কোনরূপ খটকা বাকী নাই। শুধু পুলসিরাত কেন শরীঅতের অন্যান্য বিষয়াদিরও আমাদের কাছে এমনি যুক্তিপূর্ণ নযীর আছে। তবে উহা বর্ণনা করা আমাদের আসল লক্ষ্য নহে। আমাদের আসল লক্ষ্য হইল ঃ

ماقصۂ سکندر و دارا نخوانده ایم — از ما بجز حکایت مهر و وفا مپرس

(মা কিছ্ছায়ে সেকান্দর ও দারা না খান্দায়েম + আয মা বজুয হেকায়েতে মোহর ও ওফা মপুর্স)

আমরা সেকান্দর ও দারার কাহিনী পড়ি নাই। খোদার অনুগ্রহ ও আনুগত্য কাহিনী ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

**তত্ত্ব ও রহস্যের মুখোস উন্মোচন ঃ** নমুনা হিসাবে উপরোক্ত বর্ণনার অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক বিষয়েরই উক্তরূপ তত্ত্বাদি আমাদের জানা আছে। ইহাতে আরও বুঝিতে পারিবেন যে, শরীঅত সম্পর্কিত বিদ্যার সম্মুখে দর্শনের কোন মূল্য নাই। মুসলমান আলেমদের কাছে খোদার ফজলে উপরোক্তরূপ আলোচনার প্রচুর উপকরণ মওজুদ রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে রিক্তহস্ত মনে করিবেন না, তবে ঃ

مصلحت نیست که از پرده بروں افتد راز

ورنه در مجلس رنداں خبرے نیست که نیست

(মাছলেহাত নীস্ত কেহ আয পরদা বেরুঁ উফতাদ রায
ওর্না দর মজলিসে রেন্দাঁ খবরে নীস্ত কেহ নীস্ত)

অর্থাৎ, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আশেকদের নিকট কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত নহে।

মাছলেহাত এজন্য নহে যে, প্রত্যেকেই তত্ত্বাদির আলোচনা শুনিবার যোগ্য নহে। আমরা যোগ্য ব্যক্তিদিগকেও বলি না। কারণ, এসব বিষয় বর্ণনা করা আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে।

www.almodina.com

(চিকিৎসকের দায়িত্ব শুধু ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। ঔষধের গুণাগুণ ও পরিমাণের হেতু বর্ণনা করা তাঁহার কাজ নহে।) হাঁ, কোন যোগ্য ব্যক্তি আমাদের সংসর্গে থাকিলে এবং আমাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করিলে ভাবাবেগে পড়িয়া অনেক সময় এগুলি তাহাকে বলিয়া দেই। আবার জিজ্ঞাসা করিলেও কাহাকে বলি না। কেননা, এগুলি তত্ত্ব কথা। ভাবের আতিশয্যে আপনা-আপনিই মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্তি আসে। যেমন, চিকিৎসক মাঝে মাঝে আনন্দের আতিশয্যে আপন ব্যবস্থাপত্রের প্রশংসা ও স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দেয়; কিন্তু রোগী জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্তি বোধ করে।

উদাহরণতঃ, বাদশাহ্ আপন অনুগত ও প্রিয় ব্যক্তিকে কোন সময় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আপন মহল দেখাইয়া দেন। ইহা ধনাগার, ইহা গোপন পথ, ইহা আমার বেগমদের বাসস্থান এবং ইহা বিশ্রামাগার। কিন্তু কেহ যদি বাদশাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করে, "হুযূর, আপনার বেগমদের বাসস্থান কোন্‌টি? ধনাগার কোথায়?" তবে বাদশাহ্ তাহাকে ধমক দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।

যাক্, আমি গুপ্ততত্ত্বের স্বরূপ ও উহা জানিবার উপায় বলিয়া দিলাম। কাহারও আগ্রহ থাকিলে সে এই উপায় অবলম্বন করুক। সত্য বলিতেছি, আপনি আমার নির্দেশানুযায়ী কাজ করিলে এ বিষয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন থাকিবে না। সমস্ত গুপ্ততত্ত্বের দ্বার আপনাআপনিই খুলিয়া যাইবে। তখন আপনার অবস্থা হইবে—

بینی اندر خود علوم انبیاء ـ بے کتاب و بے معید و استا

(বীনী আন্দর খোদ ওলূমে আম্বিয়া + বে কিতাব ও বে মুয়ীদ ও উস্তা)

উস্তাদ ও কিতাবাদি ছাড়াই নিজের মধ্যে পয়গম্বরদের এল্‌ম দেখিতে পাইবে। যাঁহারা গুপ্ত-তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র আমল ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তাহা লাভ করিয়াছেন।

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه ـ جز شکسته می نگیرد فضل شاه

(ফহম ও খাতের তেয করদান নীস্ত রাহ + জুয শেকাস্তা মী নাগিরাদ ফযলে শাহ্)

"বিবেক ও মেধা বৃদ্ধি করিয়া এইসব গুপ্ততত্ত্ব জানা যায় না; বরং বিনয় ও আনুগত্য দ্বারাই খোদার অনুগ্রহ লাভ করা যায়।" আরও বলেনঃ

هر کجا پستی است آب آنجا رود ـ هر کجا مشکل جواب آنجا رود
هر کجا دردے دوا آنجا رود ـ هر کجا رنجے شفا آنجا رود

(হরকুজা পস্তীস্ত আব আঁজা রাওয়াদ + হরকুজা মুশ্‌কিল জওয়াব আঁজা রাওয়াদ
হরকুজা দরদে দাওয়া আঁজা রাওয়াদ + হরকুজা রন্‌জে শেফা আঁজা রাওয়াদ)

যেখানে নিম্নভূমি সেখানেই পানি যায়। যেখানেই জটিলতা সেখানেই জওয়াবের আবির্ভাব হয়। যেখানে ব্যথা, সেখানেই ঔষধের আগমন। যেখানে বেদনা, সেখানেই আরোগ্য।

সুতরাং আনুগত্য ও দাসত্ব দ্বারা অনুগ্রহ লাভ হয়। নিজকে বিলীন করিয়া দিন। বিবেককে অযোগ্য ও অসম্পূর্ণ মনে করিয়া ত্যাগ করুন। মাওলানা বলেনঃ

سالها تو سنگ بودی دلخراش ـ آزموں را یك زمانے خاك باش

(সালহা তু সঙ্গ বূদী দিলখারাশ + আযমূঁ রা এক যমানে খাক বাশ)

www.almodina.com

বিবেকের আনুগত্যে বহুকাল তুমি পাষান-হৃদয় হইয়া রহিয়াছ; (কিন্তু বিবেক কিছুই বলিতে পারে নাই।) এখন কিছুদিন মাটি হইয়া দেখ তারপর কি হয়।

মাওলানা বলেনঃ

در بهاراں کے شود سر سبز سنگ ـ خاك شو تا گل برويد رنگ برنگ

(দরবাহারাঁ কায় শাওয়াদ সর সবয সঙ্গ + খাক শো তা গুল বরুইয়াদ রং বরং)

"বসন্তকালে পাথর কবে শস্য-শ্যামলা হইবে? মাটি হইয়া যাও রং বেরঙ্গের ফলফুল উৎপন্ন করিতে পারিবে।" অর্থাৎ, আনুগত্যের ফলে আপনার মধ্যে অভাবিত পূর্ণ জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। বন্ধুগণ, ইহাই হইল শরীঅতের উচ্চ জ্ঞান লাভের নিয়ম।

**বিবেক বিরোধঃ** আজকাল রুচি বিগড়াইয়া যাওয়ার ফলে প্রত্যেকেই বিবেকের সাহায্যে শরীঅতের উচ্চ জ্ঞান লাভে ব্রতী হইয়া যায়। অথচ আমি কাহার পুত্র, আমার পিতা কে? বিবেক দ্বারা এতটুকুও জানা যায় না।

কানপুরের জনৈক ভদ্রলোক একবার পিতার নিকট পত্র লিখিলেন, "আপনি আমার পিতা তাহা কিরূপে জানিব? ইহার যুক্তি কি?" বাস্তবিকই ভদ্রলোক যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। মূর্খের পুত্র মূর্খ হইবে ইহাই যুক্তিসঙ্গত। গণ্ড মূর্খের পুত্র দার্শনিক হইয়া যাইবে কোন্ যুক্তিতে তাহা প্রমাণিত হয় না। ভদ্রলোকের এই প্রশ্নের একমাত্র জওয়াব এই যে, প্রসবকালে যে ধাত্রী রমণী উপস্থিত ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে কিরূপে গর্ভবতী হইয়াছিল? অতএব, যে বিবেক দ্বারা পিতাকে পিতা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, উহা অকেজো ও অকর্মন্য নহে কি? ইহাই হইল বিবেকের অনুসরণের অনিষ্টতা। তাই সাধক কবি বলেনঃ

آزمودم عقل دور اندیش را ـ بعد ازیں دیوانه سازم خویش را

(আযমূদাম আকল দূর আন্দেশ রা + বাদ আযীঁ দেওয়ানা সাযম খেশ রা)

"বহুদর্শী বিবেককে যাচাই করার পর এখন পাগল সাজিয়া গিয়াছি।" 'পাগল' অর্থ এখানে বিনাদ্বিধায় চোখ বুজিয়া আনুগত্যকারী। কবির এই অবস্থা দেখিয়া কেহ বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিলে তাহার উত্তরে বলেনঃ

ما اگر قلاش وگر دیوانه ایم ـ مست آں ساقی و آں پیمانه ایم

(মা আগর কাল্লাশ ওয়াগর দিওয়ানায়েম + মস্তে আঁ সাকী ও আঁ পায়মানায়েম)

'অর্থাৎ, কেহ হাসিলে তাহাকে বলিয়া দাও—আমাদের পাগলামী তোমাদের বুদ্ধিমত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ।'

اوست دیوانه که دیوانه نشد ـ مر عسس را دید در خانه نشد

(উস্ত দিওয়ানা কেহ দিওয়ানা না শোদ + মর আসাসরা দীদ দরখানা না শোদ)

অর্থাৎ, "আমাদের মতে যে এরূপ পাগল নহে, সেই পাগল" কাজেই প্রত্যেক বিষয়কে বিবেকের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা বিকৃত রুচির পরিচায়ক বৈ কিছুই নহে। ইহার পরিণতি পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের ন্যায় না হইয়া পারে না। তিনি পিতার নিকটই পিতা হওয়ার যুক্তি চাহিয়া বসিলেন। খোদা ও রাসূলের সহিত যাহারা বিবেকের সাহায্যে বিরোধ উপস্থিত করে, তাহারা পিতার সহিত করিলে আশ্চর্যের কি আছে? তবে পিতার সহিত এরূপ করিলে পিতা অসন্তুষ্ট হয়।

www.almodina.com

সে এরূপ পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া দেয়। দুনিয়াবাসীও তাহাকে মন্দ বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খোদা ও রাসূলের নির্দেশাবলীর সহিত কেহ এরূপ করিলে পিতা তাহাকে বাধা দেয় না। দুনিয়াবাসীও এরূপ ব্যক্তিকে মন্দ বলে না; বরং সকলে মিলিয়া তাহাকে 'যুক্তিবাদী' উপাধিতে ভূষিত করে। বন্ধুগণ, ইনছাফ করুন—যে বিবেকের বিরোধ আপনি নিজের বেলায় সহ্য করিতে পারেন না, খোদা ও রাসূলের বেলায় তাহা কিরূপে সহ্য করা হয়?

আমি বলিতেছিলাম যে, কিছু সংখ্যক লোক বিবেকের সাহায্যে আকায়েদকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে। তাহাদের মতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-এর অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট। আখেরাতের অন্যান্য বিষয়সমূহের বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী নহে। কতিপয় লোক আরও সর্বনাশ করিয়াছে। তাহারা "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" অংশটিও ঈমান হইতে উড়াইয়া দিয়াছে। কারণ, হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ —'যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলিবে, সে জান্নাতে যাইবে।' ইহাতে "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" নাই। কাজেই তাহারা বলে যে, তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করার পর যে কোন ধর্মাবলম্বী হউক, মোহাম্মদ (দঃ)-এর রেসালত বিশ্বাসী হউক বা না হউক সে মুক্তি পাইবে ও জান্নাতে যাইবে। এক্ষেত্রে আমি এই দলের নাম উল্লেখ করিতে চাই না। তবে তাহাদের যুক্তিদৃষ্টে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল।

রামপুরে জনৈক ছাত্র কোন প্রয়োজনবশতঃ আমার নিকট একটি ওযীফা চাহিল। আমি বলিয়া দিলাম, খুব বেশী পরিমাণে 'লা হাওলা' পড়িতে থাক। কিছু দিন পর ঐ ছাত্রের সহিত আবার দেখা হইলে সে বলিল, "আমি রীতিমতই ওযীফা পড়িতেছি; কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উপকার পাই নাই।" আমি এমনিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ওযীফা পড়িতেছিলে? উত্তরে ছাত্রপ্রবর বলে, "আমি 'লা-হাওলা লা-হাওলা লা-হাওলা' এই ওযীফা পাঠ করি।" আমি বলিলাম, "তোমার এই লা-হাওলার প্রতিও লা-হাওলা।" যদি এই ছাত্রটির বুঝ ঠিক হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত দলের যুক্তিকেও ঠিক বলিতে হইবে। কিন্তু সকলেই জানে যে, লা-হাওলা বলিতে পূর্ণ একটি দো'আ বুঝায়। অর্থাৎ, لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ —তদ্রূপ বিসমিল্লাহ্ বলিলে একটি আয়াত এবং আলহামদু বলিলে একটি পূর্ণ সূরা বুঝায়। কুল হুয়াল্লাহ্ ও ইয়াসীন বলিলেও তেমনি এক একটি পূর্ণ সূরা বুঝায়।

নামাযে 'আলহামদু' পড়া ওয়াজিব এবং 'ইয়াসীন'-এর ছওয়াব দশ কোরআনের সমান বলিলে যদি কেহ ইহার অর্থ এইরূপ মনে করে যে, নামাযে শুধু আলহামদু শব্দটি পড়া ওয়াজিব এবং ইয়াসীন ইয়াসীন বলিতে থাকিলে দশ কোরআনের ছওয়াব পাওয়া যাইবে, তবে এরূপ ব্যক্তি বোকা নয় কি? এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বলিবে যে, আলহামদু ও ইয়াসীন শব্দগুলি পূর্ণ সূরারই পরিচয় প্রদান করে। তদ্রূপ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর হাদীসটি পূর্ণ কলেমার পরিচয় দেয়; বরং পূর্ণ শরীঅতের পরিচয় বহন করে। অতএব, হাদীসের অর্থ এই যে, যে মুসলমান হইবে, সে জান্নাতী।

**রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাঃ** এখন শরীঅতের অন্যান্য শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, মুসলমান হওয়ার জন্য মোহাম্মদ (দঃ)-এর রেসালত, জান্নাত ও দোযখ, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, তকদীর, পুলসিরাত, আমল ওযন, হিসাব-কিতাব ও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ফরয হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাও অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু এই সবগুলিকে বাদ দিয়া বিবেকের পূজারীরা উপরোক্ত ছাত্রের ন্যায় শুধু "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-কেই যথেষ্ট মনে করিয়া লইয়াছে।

www.almodina.com

বুলন্দ শহরের জনৈক পদস্থ কর্মচারীও এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি শুধু তওহীদে বিশ্বাসী হওয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। ইহা জানিতে পারিয়া আমি একদিন ওয়াযে বলিলাম, "যে ব্যক্তি রেসালতে বিশ্বাসী নহে, সে তওহীদেও বিশ্বাসী নহে।" রেসালত স্বীকার করা ব্যতীত তওহীদের কোন বাস্তব অর্থই হয় না। কারণ, তওহীদের অর্থ শুধু খোদাকে এক স্বীকার করিয়া লওয়া নহে; বরং তৎসহ তাঁহাকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত এবং সমুদয় খোদায়ী গুণে গুণান্বিতও মনে করিতে হইবে। সত্যবাদিতাও একটি গুণ। অতএব, খোদাকে এই গুণে গুণান্বিত ও মিথ্যা হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পবিত্র মনে করাও অত্যাবশ্যকীয় ফরয। অথচ যে ব্যক্তি রেসালত স্বীকার করে না, সে প্রকারান্তরে খোদাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। কেননা, খোদা স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ)-কে "রাসূলুল্লাহ্" (আল্লাহ্‌র রাসূল) বলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ ব্যাপারে খোদাকে সত্যবাদী মনে করে না। ফলে সে এক দোষে খোদাকে দোষী সাব্যস্ত করে। ইহা তওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং "রেসালতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি তওহীদে বিশ্বাসী হইতে পারে না।"

আমি আরও বলিলাম, "কেহ আমার এই যুক্তি খণ্ডন করিতে চাহিলে তাহাকে আমি দশ বৎসরের সময় দিতেছি।" শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত কর্মচারী আপন ভুল স্বীকার করিয়া তওবা করিয়াছিল। পরবর্তী সাক্ষাতের সময় তিনি ছহীহ্ আকীদায় অটল ছিলেন। অতএব, আকায়েদ হইতে যাহারা রেসালতকে বাদ দেয়, তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল।

কেহ কেহ আকায়েদ সংক্ষিপ্ত না করিলেও আমলে ছাটাই করিতে কসুর করে না। তাহাদের মতে মুসলমান হওয়াই মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আর তওহীদ ও রেসালত স্বীকার করিলেই মুসলমান হওয়া যায়। সুতরাং আমল ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের দলীল পূর্বোক্ত হাদীসঃ

من قال لا اله الا الله اى مع محمد رسول الله

**ধর্মের অন্যান্য অঙ্গসমূহের গুরুত্বঃ** বন্ধুগণ! এই বিষয়ের আলোচনা আসলে অনেক দীর্ঘ। কিন্তু এখন আমি একটি মোটা কথা আরয করিয়া দিতে চাই। শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্' কলেমাকে যথেষ্ট মনে করা এমন, যেমন কেহ ঈজাব কবূল করিয়া বিবাহ করিল, কিন্তু বিবি যখন খোর-পোষ চাহিল, তখন বলিতে লাগিল, "আমি তো তোমাকেই কবূল করিয়াছি, খোর-পোষ কবূল করিলাম কখন?" ইহা দেওয়া আমার কর্তব্য নহে। বলুন, এই ব্যক্তির এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইবে কি? কখনই নহে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বলিবে, আরে বোকা, বিবিকে কবূল করিলে তাহার প্রয়োজনীয় সবকিছু কবূল করা হয়। বন্ধুগণ, এমনিভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমা বলিলে ধর্মকে কবূল করা হয়। ইহাও শুধু ঈজাব-কবূলের ন্যায়, যাহাতে মযহাবের যাবতীয় অঙ্গের কবূল অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ভাইসব! এসব নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নহে। আসলে আজকাল ইচ্ছা করিয়া নির্বুদ্ধিতা করা হয়। নতুবা খোদা ও রাসূলের সাথে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা বিবি অথবা সমাজের লোকদের সহিত করা হয় না কেন? মানিলাম—আপনি এমনি সূক্ষ্মদর্শী যে, যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন কিছু মানেন না এবং পরিষ্কার কথায় কবূল না করিলে কোন কিছু পালনীয় মনে করেন না, তবে বিবাহের ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত কারণ তালাশ করেন না কেন এবং পরিষ্কার কথায় কবূল না করিয়াও খোর-পোষ দেওয়া বাধ্যতামূলক মনে করেন কেন? আসলে মানুষের সহিত কাজকারবার করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত কারণ জানিয়া লওয়া উচিত ছিল, খোদার সহিত নহে। কিন্তু হইতেছে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলের আদেশের ব্যাপারে ওযর-আপত্তি, কিন্তু

[illegible] বেরাদরের বেলায় সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ। সুতরাং উপরোক্ত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র হাদীস দ্বারা আমলের অনাবশ্যকতা প্রমাণ করা নিতান্তই ভুল। ইহারা তো ঐ দাখালাল জান্নাহ্‌ দলভুক্ত লোক যাহারা আকায়েদের ছাটাই করে এবং আমলকে জরুরী মনে করে না।

আজকাল আরও এক প্রকার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা আকায়েদ পুরাপুরিই মানে এবং আমলের আবশ্যকতাও অস্বীকার করে না; কিন্তু তাহারা আমলের মধ্যে ছাটাই করে। যেসব আমল তাহাদের কাছে সহজ মনে হয়, তাহারা উহা গ্রহণ করে এবং যেগুলিকে কঠিন মনে করে, সেইগুলি উড়াইয়া দেয়। এ ব্যাপারে তাহাদের সকলের স্বভাব এক রকম নহে। কেহ শারীরিক এবাদত সহজ ও আর্থিক এবাদত কঠিন মনে করে। তাহারা নামায, রোযা, তাস্‌বীহ্‌, নফল এবাদত ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া চেহারা-নমুনায় বুযুর্গ সাজিয়া যায়; কিন্তু ফরয হজ্জ আদায় করে না, যাকাতও দেয় না, কাজ কারবারে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তাহাদের লেন-দেনও অত্যন্ত খারাপ। আবার কিছু সংখ্যক লোকের মতে টাকা-পয়সা ব্যয় করা সহজ। তাহারা হজ্জ করে, যাকাত দেয়; কিন্তু শারীরিক এবাদত তাহাদের মতে অত্যন্ত কঠিন। ফলে নামায, রোযা হইতে গা বাঁচাইয়া চলে। আরও একদল লোক শারীরিক ও আর্থিক উভয় প্রকার এবাদত পূর্ণরূপে পালন করে; কিন্তু আন্তরিক আনুগত্য বর্জন করিয়া বসিয়াছে। বাহ্যতঃ তাহারা খুবই পবিত্র, কিন্তু অন্তর নানারূপ অহংকার, হিংসা, রিয়া ও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। তাহাদের মধ্যে নামে মাত্র খোদাভীতি আছে; কিন্তু উহাকেও তাহারা জরুরী মনে করে না। কিছু সংখ্যক লোক এসব বিষয়ে লক্ষ্য করিলেও তাহাদের সামাজিকতা অত্যধিক নোংরা। খোদার যিকর-আযকার করে বটে, কিন্তু অপরকে কষ্ট দিতে তাহাদের বাধে না।

মোটকথা, যে কাজকে সহজ দেখিয়াছে, সে উহাই গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাতে কিছু পরিশ্রম দেখিয়াছে, উহা ত্যাগ করিয়াছে। আজকাল বিজ্ঞানের যুগ। ফলে প্রত্যেক জিনিসের সার বাহির করার প্রবণতা দেখা যায়। মুসলমান ভাইগণ আমলেরও সার বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। বন্ধুগণ, সারের সার বাহির করা যায় না। অথচ ধর্ম সম্পূর্ণই সার, ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গই অপরিহার্য। ইহার সার বাহির করার অর্থ হইবে জরুরী অঙ্গ বাদ দেওয়া।

যেমন, কেহ মানুষের সারাংশ বাহির করার ইচ্ছায় যদি তাহার একটি হাত কাটিয়া ফেলে কিংবা একটি চক্ষু উপড়াইয়া ফেলে এবং একটি কর্ণ বন্ধ করিয়া দেয়, তবে ইহাকে সারাংশ বাহির করা বলা যাইবে কি? কখনই নহে। এক্ষেত্রে ইহাই বলা হইবে যে, মানুষটির জরুরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উড়াইয়া দিয়া তাহাকে বেকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান ভাইগণ ধর্মকেও এই অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে। কাহারও আমল খুবই ভাল; কিন্তু আকায়েদের বেলায় কোরআন ও হাদীস অগ্রাহ্য করিয়া বেদআতের আশ্রয় লইয়াছে। তাসত্ত্বেও নিজকে দ্বীনদার বলিয়া যাহির করে। আবার কাহারও আকায়েদ ঠিক; কিন্তু আমলের বেলায় ত্রুটির অন্ত নাই। তাহারাও সুন্নতের অনুসারী বলিয়া গর্ব করিতে কসুর করে না। মোটকথা, আমাদের মধ্যে উপরোক্তরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমার মতে এ সমস্ত অনিষ্টের আসল কারণ এই যে, তাহারা ধর্মের অঙ্গসমূহ সম্যক বুঝিতে পারে নাই।

**ধর্মের অঙ্গসমূহের বিবরণঃ** বন্ধুগণ! মনোযোগ দিয়া শুনুন! ধর্মের অঙ্গ পাঁচটি। (১) আকায়েদ। অর্থাৎ, অন্তরে ও মুখে এইরূপ স্বীকার করা যে, আল্লাহ্‌ ও তদীয় রাসূল আমাদিগকে যে যে বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সমস্তই তাহাদের বর্ণিত আকারে সত্য। (আকায়েদের কিতাব-

সমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।) (২) এবাদত। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। (৩) পারস্পরিক মোআমালা অর্থাৎ বিবাহ, তালাক, অন্যায়ের শাস্তি, কাফ্ফারা, বেচা কেনা, ইজারা, কৃষিকাজ ইত্যাদির হুকুম আহ্কাম। এই সব বিষয় ধর্মের অঙ্গ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শরীঅত কৃষিকার্যের নিয়মাবলী শিক্ষা দেয় বা কি কি জিনিসের ব্যবসা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেয়; বরং এসব ব্যাপারে শরীঅত আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, কাহারও প্রতি অন্যায়-অবিচার করিবে না, যেসব মোআমালায় ঝগড়ার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা করিবে না। মোটকথা, কোন্‌টি জায়েয ও কোন্‌টি না-জায়েয, তাহাই বলিয়া দেয়। (৪) সামাজিকতা। অর্থাৎ উঠাবসা, দেখাসাক্ষাৎ, মেহ্‌মান হওয়া কাহারও বাড়ীতে যাওয়া ইত্যাদি কাজ কিরূপে করিতে হইবে? স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, অপরিচিত ও চাকর-বাকর কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইত্যাদি। (৫) তাছাউফ। এই নামটি ভয়াবহ বটে। কারণ, আজকাল সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, তাছাউফের পথে গেলে বিবি বাচ্চা, বিষয়-আশয় ইত্যাদি সব ত্যাগ করিতে হয়। জানিয়া রাখুন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে সব মূর্খ ছুফী তাছাউফের স্বরূপ জানে না, তাহারাই এইরূপ প্রচার করিয়া বেড়ায়। এই পঞ্চম অঙ্গটিকে শরীঅতে "এছলাহে নফ্স" বা আত্মসংশোধন নামে অভিহিত করা হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গের সমষ্টির নাম ধর্ম। ইহাদের যে কোন একটি বাদ পড়িলে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হইবে না। যেমন, কাহারও একটি হাত না থাকিলে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলা যায় না।

আমরা উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গ পালনে কতদূর যত্নবান হইয়াছি, এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য। এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কেহ কেহ আকায়েদ ও এবাদত নামক অঙ্গগুলি বাদ দিয়াছে, আবার কেহ কেহ লেন-দেনের ব্যাপারকে ধর্মের অন্তর্ভুক্তই মনে করে না। বড় বড় পরহেযগার ব্যক্তিও এই মারাত্মক দোষে দোষী। তাহাদের ব্যবহারে ইহা ফুটিয়া উঠে। তাহারা নামায-রোযার মাসআলা আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লয়। কিন্তু লেন-দেনের ব্যাপারে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করে না। উদাহরণতঃ সম্পত্তি খরিদ করা কিংবা ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র শরীঅতসম্মত কিনা, তাহা আলেমদের নিকট জানিবার চেষ্টা করা হয় না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা এসব ব্যাপারকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। অথচ এইগুলি যে ধর্মের অঙ্গ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পবিত্র কোরআনে পারস্পরিক ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কিত আয়াত রহিয়াছে। উহাতে শুধু ঋণের ব্যাপারে বহু বিধি-নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা নির্ধারিত মিয়াদে ঋণ আদান-প্রদান করিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লও। নিজে লিখিতে অক্ষম হইলে অন্যের দ্বারা লিখাইয়া লও।" লেখক সম্বন্ধে বলেনঃ

وَلَايَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ

অর্থাৎ, "কোন লেখক লিখিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না।" কোন লেখক পাওয়া না গেলে দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাইয়া লইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন দেখা দিলে সাক্ষীদিগকে অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে হইবে। সাক্ষ্য গোপন করা ভীষণ অন্যায়। ইহার শাস্তির কথাও কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। কোরআন শরীফের এমনিভাবে আরও বহু লেন-দেনের ব্যাপারে বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে। হাদীস শরীফে আরও বেশী আছে। এছাড়া ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রে এগুলিকে এত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহার সহিত অন্য কোন আইন-শাস্ত্রের তুলনা চলে না।

www.almodina.com

**কুসংসর্গের প্রতিক্রিয়াঃ** কিছু সংখ্যক লোক আলেমদের প্রতি দোষারোপ করে যে, তাহারা না-জায়েয ছাড়া আর কিছু জানে না। দলীল দস্তাবেজ দেখা না-জায়েয কোন চাকুরীর কথা জিজ্ঞাসা করা না-জায়েয। মনে হয়, তাহারা একমাত্র না-জায়েযই শিক্ষা করিয়াছে। আলেমদের প্রতি এইরূপ দোষারোপ ব্যাপক হারেই শুনা যায়। কেহ কেহ আবার আরও অগ্রসর হইয়া বলে যে, আসলে ধর্মই বড় কঠিন ব্যাপার। (বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত দল আলেমদের প্রতি দোষারোপ করে, আর দ্বিতীয় দল খোদা ও রাসূলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসে।) উপরোক্ত আলোচনায় এই উভয় দলের জওয়াব হইয়া গিয়াছে।

এই ধরনের লোকদের কাহিনী কি বলিব? ভয়ও হয়, আবার ক্ষোভও সামলানো যায় না। কিছুদিন পূর্বে লক্ষ্ণৌতে মুসলমানদের একটি সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। মুসলমানদের অবনতির কারণ নির্ণয় ছিল সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। সভাশেষে স্থিরীকৃত হয় যে, ইসলামই মুসলমানদের অবনতির একমাত্র কারণ।

বন্ধুগণ, এই শ্রেণীর মুসলমানরাই জোর গলায় দাবী করে যে, আমরাই ইসলামের খাঁটি অনুগামী, আমরাই ইসলামের রক্ষক। আবার তাহারাই প্রস্তাব পাশ করে যে, ইসলামই অবনতির মূল কারণ। আফ্‌সোস! যে ইসলামের বদৌলতে ছাহাবায়ে কেরাম অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই ইসলামকেই অবনতির কারণরূপে আখ্যায়িত করা হয়। খোদার কসম! তাহারা ইসলামকে বুঝেই নাই। আমল করা তো দূরেরই কথা। যাহারা ইসলামকে সম্যক বুঝিয়া তদনুযায়ী আমল করিয়াছে, তাহাদের কখনও অবনতি হয় নাই। অবশ্য যাহারা আমল করে না, তাহাদেরই অবনতি হইয়াছে। তবে ইহার কারণ ইসলাম নহে; বরং ইসলামকে বর্জন করা।

এই শ্রেণীর লোকদের সংসর্গে থাকার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিতেছিঃ একবার আমি বেরিলী গিয়াছিলাম। তথায় জনৈক বৃদ্ধ তাহার নাতীকে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, "হুযূর! এ নামায পড়ে না। তাহাকে কিছু নছীহত করুন।" আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, তুমি নামায পড় না কেন?" সে উত্তরে বলিল, "আমি খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান; সুতরাং কাহার উদ্দেশ্যে নামায পড়িব?" এই পর্যন্ত বলিয়াই তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, "আপনি নামাযের চিন্তা করেন—বাচাধনের তো ঈমানই নাই। আগে ইহার প্রতিকার করা উচিত।" বৃদ্ধ আমাকেই প্রতিকারের পন্থা বলিয়া দিতে অনুরোধ করিল। আমি বলিলাম, "সে কোথায় লেখাপড়া করে?" উত্তরে জানা গেল যে, মুসলমান ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজে পড়ে। আমি বলিলাম, "তাহাকে কলেজের পরিবর্তে কোন গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করিয়া দিন।" বৃদ্ধ তখন ইহার রহস্য না জানিলেও আমার কথামত কাজ করিল।

পর বৎসর আমি আবার বেরিলী পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে, ছেলেটি পাক্কা মুসলমান এবং খুব নামায পড়ে। তখন কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কলেজে পড়িয়া ছেলেটির ইসলাম দুর্বল এবং গভর্নমেন্ট স্কুলে যাইয়া তাহার ইসলাম বাঁচিয়া গেল কিরূপে? অথচ এই কলেজে শুধু মুসলমান ছাত্ররাই লেখাপড়া করে। এখানে ইসলাম আরও শক্তিশালী হওয়ার কথা। অপরপক্ষে গভর্নমেন্ট স্কুলে হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর ছাত্রই লেখাপড়া করে।

আমি বলিলাম, "কলেজে যে সব মুসলমান ছাত্ররা লেখাপড়া করে, তাহারা সকলেই স্বাধীন মনোভাবাপন্ন। সেখানে দিবারাত্র এই এক ধরনের লোকের সংসর্গে থাকিতে হয়। ফলে সকলের অবস্থাই এক রকম হইয়া যায়। কেননা, বাহ্যতঃ সকলেই মুসলমান হওয়ার কারণে পরস্পরের

ঘৃণা করার কোন হেতু থাকে না। এমতাবস্থায় সংসর্গের প্রভাব শীঘ্র প্রতিফলিত হইতে কোন বাধা থাকে না। গভর্নমেন্ট স্কুলের অবস্থা এরূপ নহে। মুসলমান ছেলেরা হিন্দু ধর্মকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। কাজেই হিন্দুদের সংসর্গের প্রভাব মুসলমান ছেলেদের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে পারে না। তাছাড়া পারস্পরিক ঘৃণার কারণে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠে। তাই মুসলমান ছেলেরা নিজেদের ধর্মের উপর দৃঢ় হইয়া যায়।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আলেমগণ প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী পড়াইতে নিষেধ করেন না; বরং ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট করিতে বাধা দেন।

কেহ কেহ বলে, আজকাল আমরা ইংরেজী শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছি। সুতরাং এখন ইংরেজী শিক্ষায় দোষ নাই। বন্ধুগণ, শুধু শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নহে। কারণ, যাহারা শিক্ষাদাতা তাহারাও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে সৎসংসর্গের ব্যবস্থা করা দরকার। বেশী সম্ভব না হইলে কমপক্ষে ছুটির দিনগুলিতেই ছেলেদিগকে কোন বিচক্ষণ আলেমের সংসর্গে পাঠাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

**আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিঃ** আমি আপনাদিগকে ধর্মের খাতিরে অমূল্য সময় নষ্ট করিতে বলি না। কারণ, আজকালকার অবস্থাদৃষ্টে এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। আজকাল আল্লাহ্র নামে দেওয়ার জন্য যতসব নিকৃষ্ট জিনিস পছন্দ করা হয়। কাজেই আপনি অমূল্য সময় খোদার জন্য কিরূপে ব্যয় করিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একদা জনৈক মহিলা শিরণী পাকাইয়া একটি বাসনে উঠাইয়া রাখিয়াছিল। ঘটনাক্রমে একটি কুকুর উহাতে মুখ দেয়। মহিলাটি অপর একটি বাসনে ঐ শিরণী ঢালিয়া তাহা ছেলে দ্বারা মসজিদের মোল্লার নিকট পাঠাইয়া দিল। মোল্লাজী শিরণী দেখিয়া আনন্দচিত্তে খাওয়া শুরু করিয়া দিলেন। ঘটনাক্রমে কুকুর যে দিকে মুখ দিয়াছিল, তিনি ঐ দিক হইতেই খাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ছেলেটি বলিতে লাগিল, "মোল্লাজী, এদিক হইতে খাইবেন না—এদিকে কুকুর মুখ দিয়াছিল।" ইহা শুনামাত্রই মোল্লাজী রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং শিরণীসহ বাসনটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। ফলে উহা ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। তখন ছেলেটি, "হায়, আম্মা আমাকে মারিবে"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মোল্লাজী বলিলেন, "ওরে, কাঁদিস কেন? সামান্য মাটির বাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে কি হইল?" "ছেলে বলিল, 'তা নয় গো, উহাতে আম্মা আমার ছোট ভাইকে পায়খানা করাইত।" এই নূতন আবিষ্কারে মোল্লাজীর বমি আসার উপক্রম হইল! (কেননা, পাত্র ও পাত্রস্থিত বস্তু উভয়টিই নূরে পরিপূর্ণ ছিল!) এই হইল আমাদের অবস্থা। আমরা নাপাক ও নিকৃষ্ট বস্তুই খোদার নামে দিতে পছন্দ করি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা মসজিদের মোল্লাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করি—আবার আমরাই তাহাদিগকে হেয় ও ঘৃণেয় মনে করি। আরে ভাই, যখন আপনি সুস্বাদু ও উৎকৃষ্টতম খাদ্য খান, তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন কি? যখন নিজের খাওয়ার উপযুক্ত না থাকে, তখন তাহাদের পালা আসে। এখানেই শেষ নয়, তাহাদের বেতনও এত অল্প ধার্য করা হয় যে, বেচারাদের পক্ষে শুকনা রুটি যোগাড় করাই মুশ্কিল হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা লোভী হইবে না তো আর কি হইবে?

এই জন্যই আমি বলি, মহল্লায় কোন ধনী ব্যক্তি অসুস্থ হইলে মসজিদের মোয়ায্যিন হয়তো তাহার আরোগ্য লাভের জন্য দো'আ করিবে না। সে মনে মনে ইহাই কামনা করিবে যে, সে মরিলে ভালই হয়, চল্লিশা, ফাতেহা ইত্যাদির নিমন্ত্রণ খুব পেট ভরিয়া খাওয়া যাইবে। কারণ,

www.almodina.com

আনন্দোৎসবে বেচারাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না। কেবলমাত্র মৃত্যুজনিত অনুষ্ঠানাদিতেই তাহাদিগকে স্মরণ করা হয়। অতএব, ইহার অনিবার্য পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, তাহারা এই সব সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিবে।

এই জাতীয় লোভের চূড়ান্তরূপ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলি। কেরানা শহরের জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার কাফনের অতিরিক্ত চাদরটি গোরস্থানে নিযুক্ত খাদেমকে না দিয়া একজন দরিদ্রকে দেওয়া হইল। ইহাতে খাদেম আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল, "ইহা আমার হক। সুতরাং আমাকেই দেওয়া হউক।" কেহ কেহ বলিল, আরে ভাই, সব সময় তোমাকেই দেওয়া হয়। আজ না হয় এই গরীবকেই দেওয়া হইল—তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তরে খাদেম বলিল, বাঃ, হুযূর! 'খোদা খোদা' করিতে করিতে এই দিনের মুখ দেখি। ইহাতেও আপনারা আমার হক অন্যকে দিয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "আরে হতভাগা, তাহা হইলে দেখা যায়, তুই সর্বদা আমাদের মৃত্যু কামনা করিস এবং এজন্য মনে মনে দো'আ করিতে থাকিস।" উত্তরে খাদেম এদিক-ওদিকের কথা আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে কি হয়, তাহার মনের কথা কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। বন্ধুগণ, ইহাতে তার দোষ কি? এই দুঃসময় ছাড়া আপনারা যখন তাহার দিকে ফিরিয়াই তাকান না, ইহাই যখন তাহার একমাত্র আমদানির পথ, তখন সে ইহার ওযীফা না পড়িয়া কি করিবে?

আমরা অকেজো জিনিসই খোদার পথে দিয়া থাকি। এই অবস্থা দৃষ্টে সময় সম্বন্ধেও আমি বলি যে, ছুটির বেকার ও অতিরিক্ত সময়টিই খোদার পথের জন্য বাহির করিয়া লউন। ছুটির সম্পূর্ণ সময় দিতে না পারিলে অন্ততঃ অর্ধেকই দিন এবং ইহার মধ্যে আপন সন্তানদিগকে বিচক্ষণ আলেমের সংসর্গে পাঠাইয়া দিন। কারণ, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا। "বুযুর্গ ব্যক্তিদের সুদৃষ্টির ফলেই ধর্মকর্মে সুমতি হয়।" শুধু পুস্তক পড়াইলেই ধর্মভাব জাগ্রত হয় না। আমি ইংরেজী পড়াইতে নিষেধ করি না। তবে এই কথা বলি যে, আলেমদের সহিত পরামর্শ করিয়া ছেলেদের ধর্ম রক্ষারও একটা ব্যবস্থা করুন। আমি উপরোক্ত ছেলেটির সংশোধনের নিমিত্ত যে নিয়ম বলিয়াছিলাম, তাহাতে খোদার ফযলে উপকার হইয়াছে।

আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমেই ইংরেজী শিক্ষাকে হারাম বলিবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আজকাল আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় না; অথচ দুনিয়াদারীর সহিত আলেমদের কোন শত্রুতা নাই। তাঁহারা চান, আপনি ধর্মকে জলাঞ্জলি না দিয়া ধর্ম বাঁচাইয়া দুনিয়া উপার্জন করুন।

**জায়েয ও না-জায়েযের আলোচনাঃ** আলেমগণ না-জায়েয ব্যতীত আর কিছু জানে না—এই অপবাদের উত্তর এই যে, আপনারাই যখন বাছিয়া বাছিয়া না-জায়েয বিষয়েরই প্রশ্ন করেন, তখন তাহাদের পক্ষে না-জায়েয বলা ছাড়া উপায় কি? ব্যবসা ও কৃষি বিষয়ে জায়েয পন্থা কি কি, কোন্ কোন্ চাকুরী জায়েয, আলেমদিগকে এই জাতীয় প্রশ্ন করিয়া দেখুন, তাহারা আপনার সম্মুখে জায়েযের বিরাট দফতর খুলিয়া ধরিবে।

উদার নীতির অর্থ এই নয় যে, উহাতে নিষিদ্ধ বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। জগতে এই ধরনের কোন আইন নাই, থাকিলেও তাহাকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যাইতে পারে না। উদার নীতির অর্থ হইল এই যে, উহাতে না-জায়েয বিষয়ের তালিকা অল্প এবং জায়েয বিষয়ের তালিকা বেশী। আপনি মনোযোগ সহকারে শরীঅতের আইন অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহার

প্রত্যেকটি অধ্যায়ে না-জায়েয বিষয় অপেক্ষা জায়েয বিষয় অনেক বেশী। তবে কেহ শুধু না-জায়েয বিষয়গুলি লইয়াই প্রশ্ন করিলে স্বভাবতঃই উহার উত্তরে শুধু না-জায়েয বলা হইবে।

আলেমদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহাদের না-জায়েয ফতওয়া অনুযায়ী আমল না করিলেও জিজ্ঞাসা করিলে আপনার উপকার হইবে। তাহা এই যে, জিজ্ঞাসা না করিয়া আমল করিলে হয়তো আপনি হারামকে হালাল ভাবিয়া করিতেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার পর হারামকে হারাম ভাবিয়াই করিবেন। প্রথমোক্ত অবস্থায় গোনাহ্ করিয়াও হয়তো নিজকে গোনাহ্গার মনে করিতেন না, ইহা অত্যন্ত মারাত্মক। শেষোক্ত অবস্থায় আপনি নিজকে গোনাহ্গার মনে করিতে পারিবেন। ফলে কোন সময় তওবার তওফীক হইয়া যাইতে পারে।

লেন-দেন শুদ্ধ হইলেও আবার কেহ কেহ সামাজিকতার প্রতি চরম উদাসীন হইয়া রহিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোক যেরূপ প্রাচীন সভ্যতা গ্রহণ করে নাই, তদ্রূপ আধুনিক সভ্যতাকেও গ্রহণ করে না। আবার কেহ কেহ কেবল আধুনিক সভ্যতাকেই সম্বল বানাইয়া লইয়াছে। জায়েয না-জায়েযের কথা বাদ দিলেও ইহাতে একটি অপকারিতা এই যে, এই সভ্যতা গ্রহণ করায় তাহাদের বহু বিঘোষিত ও বিপুল প্রশংসিত জাতীয়তাবাদ পণ্ড হইয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, তাহারা মুখে নিজদিগকে জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু কাজেকর্মে এই জাতীয়তাবাদের মুলোৎপাটনে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের আকৃতি ও কথাবার্তায় কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না; বরং তাহারা আপন জাতি হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহাদের অবস্থা এইরূপ ঃ

یکے بر سر شاخ و بن می برید ـ خداوند بستاں نگہ کرد و دید

(একে বর সরে শাখ ও বুন মী বুরীদ + খোদাওয়ান্দে বুস্তাঁ নেগাহ্ করদ ও দীদ)

অর্থাৎ, "কেহ ডালের মাথায় বসিয়া উহার গোড়া কাটিতেছে। বাগানের মালিক, সেদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল............।

**ইসলামী সভ্যতা ঃ** এতদ্ব্যতীত বিজাতীয় সামাজিকতা অবলম্বন করার অর্থ এই যে, (নাঊযু-বিল্লাহ্) ইসলামে কোন সামাজিকতা নাই। থাকিলেও তাহা উত্তম ও যথেষ্ট নহে। ইহা ছাড়া অন্যের সামাজিকতা অবলম্বন করার আর কি কারণ থাকিতে পারে? খোদার কসম, ইসলামী সামাজিকতার ন্যায় উত্তম সামাজিকতা জগতের কোথাও দৃষ্ট হয় না। তবে সামাজিকতার অর্থ বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান করা বা অহঙ্কার উপকরণ সংগ্রহ করা নহে। এগুলি সামাজিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে। কারণ, অহঙ্কারী ব্যক্তি অন্যের তুলনায় বড় সাজিয়া থাকিতে পছন্দ করে। এমতাবস্থায় তাহার মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি কোথা হইতে জন্ম লাভ করিবে? ইসলাম যে সামাজিকতা শিক্ষা দেয়, উহাতে মানুষের মনে বিনয় ও নম্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা গিয়াছে যে, বিনয় ও নম্রতা ব্যতীত পারস্পরিক ঐক্য ও সহানুভূতি সৃষ্টি হইতে পারে না। অথচ ইহা সামাজিকতার ভিত্তি। অতএব, প্রকৃত সামাজিকতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কেবল ইসলামের মধ্যেই আছে।

উদাহরণতঃ পানাহার সম্পর্কে ইসলামী সামাজিকতা লক্ষ্য করুন। রাসূলে খোদা (দঃ) শুধু মুখেই বলেন নাই; বরং স্বয়ং কার্যেও পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اكل كما يأكل العبد "দাস যেভাবে খায়, আমিও সেইভাবে খাই।" তিনি দুই পায়ের উপর ভর দিয়া হাঁটু খাড়া করিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়া আহার করিতেন। এখন মুসলমান ভাইদের বসার ভঙ্গি দেখুন। উহা হইতে পরিষ্কার অহঙ্কার ফুটিয়া উঠে। তাহাদের বসার ও রাসূলে খোদা (দঃ)-এর বসার ভঙ্গি পরস্পর তুলনা করিয়া দেখুন, কোন্‌টি যুক্তিসঙ্গত?

বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। মনে করুন, আপনি পঞ্চম জর্জের দরবারে গেলেন। তিনি আপনাকে কোন খাদ্যবস্তু দিয়া বলিলেন, "আমার সম্মুখেই ইহা খাও।" জিজ্ঞাসা করি, তখন আপনি কিভাবে খাইবেন? সেখানেও কি আপনি টেবিলের অপেক্ষা করিবেন এবং আসন গাড়িয়া বসিবেন, না দাসের ন্যায় বিনয়াবনত হইয়া ঝুঁকিয়া খাইবেন?

আরও মনে করুন, তখন আপনাকে যে সব খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়, যদি উহাদের কোনটি আপনার রুচিবিরুদ্ধ হয়, সত্য করিয়া বলুন, তখন কি আপনি উহা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া খাইবেন? নিশ্চয়ই নহে। আপনি উহা প্রবল আগ্রহ সহকারে খাইবেন এবং কোনও রকমে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইতে দিবেন না।

ইহাই হইতেছে ইসলামী সভ্যতা। হুযূর (দঃ) আহার কালে প্রবল বাসনা প্রকাশ করিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেন। দুঃখের বিষয়, আমরা অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিতে আহার করিয়া থাকি। বন্ধুগণ, খাদ্যদ্রব্যের আসল স্বরূপ অবগত না হওয়ার কারণেই আমরা এইরূপ করিয়া থাকি। যদি আমরা মনে করিতাম যে, প্রবল পরাক্রমশালী খোদার দরবার হইতে আমাদিগকে এই বস্তুটি খাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি আমাদিগকে দেখিতেছেন, তবে আমরা আপনাআপনিই রাসূলে খোদা (দঃ)-এর বর্ণিত রীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতাম।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হাত হইতে লোক্‌মা পড়িয়া গেলে তাহা উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া খাইয়া ফেলিবে। কিছু সংখ্যক অহঙ্কারী ব্যক্তি ইহাকে সভ্যতা বিরোধী মনে করে। আমি উপরোক্ত উদাহরণের মধ্যেই জিজ্ঞাসা করি, যদি পঞ্চম জর্জ প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ পড়িয়া যায়, তখন আপনি কি করিবেন? নিশ্চয়, আপনি উহা উঠাইয়া সসম্মানে খাইয়া ফেলিবেন। বন্ধুগণ, অন্তরে খোদার মহত্ত্ব বিরাজমান থাকিলে সব সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। আসলে আমরা লক্ষ্য করি না যে, খোদা আমাদিগকে দেখিতেছেন। রাসূলে খোদা (দঃ) এদিকে লক্ষ্য করিতেন। আমাদেরও চক্ষু খুলিয়া গেলে আমরাও ঐরূপ করিব যেরূপ হুযূর (দঃ) করিয়াছেন। তবে যে সব স্থানে চক্ষু খোলে এবং অন্তরে কাহারও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তথায় এখনও আপনাদের ঐরূপ ব্যবহারই চলিতেছে।

ইসলামে পূর্ণরূপে সামাজিকতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট হইতে ইহা ধার করার কি প্রয়োজন? অথচ মযহাবী আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্যাদাবোধের তাগাদা এই ছিল যে, ইসলামী সামাজিকতা অসম্পূর্ণ হইলেও অন্যের সামাজিকতা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখা। জনৈক কবি বলেনঃ

کهن خرقۂ خویش پیراستن ــ به از جامۂ عاریت خواستن

(কুহন খেরকায়ে খেশ পায়রাস্তান + বেহ্ আয জামায়ে আরিয়ত খাস্তান)

"অন্যের নিকট হইতে জামা ধার করা অপেক্ষা আপন ছেঁড়া লেবাস পরিধান করা উত্তম।" কথায় বলে, নিজের পুরাতন কম্বল অন্যের শাল অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। স্বীয় উত্তম চাদর

খুলিয়া ফেলিয়া অন্যের ছেঁড়া কম্বল পরিধান করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও মুসলমান ভাইগণ অন্যের রীতিনীতি অনুসরণ করিতেছে; অথচ এ ব্যাপারেও ইসলামের সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা চলে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, বেশভুষার ব্যাপারে ইসলামে জায়েযের তালিকা না-জায়েযের তালিকা হইতে অনেক বড়। অথচ বিজাতির অনুকরণপ্রিয় ভাইদের সামাজিকতার ব্যাপার ইহার বিপরীত। অর্থাৎ, অনুমোদিত তালিকা ছোট এবং অননুমোদিত তালিকা বড়।

আশ্চর্যের বিষয়, আপনি দিবারাত্র উদারতা উদারতা বলিয়া চীৎকার করেন এবং সামাজিকতা ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা থাকা উচিত নয় বলিয়া আলেমদিগকে উপদেশ দেন, অথচ কার্যক্ষেত্রে আপনি এমন এক সামাজিকতা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে শুধু সঙ্কীর্ণতাই সঙ্কীর্ণতা। অনুমোদিত বস্তু অপেক্ষা অননুমোদিত বস্তু যেখানে বেশী সেখানে উদারতা কোথায়? আপনি নিজেই উদারতার প্রয়োজন বলিয়া আইন রচনা করেন, আবার নিজেই উহা ভঙ্গ করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, একমাত্র শরীঅতের সামাজিকতার মধ্যেই পূর্ণ আজাদী বিদ্যমান। কেননা, উহাতে জায়েয বিষয় বেশী এবং না-জায়েয বিষয় কম। পক্ষান্তরে আধুনিক সামাজিকতায় শুধু সঙ্কীর্ণতাই সঙ্কীর্ণতা। টেবিল চেয়ার না হওয়া পর্যন্ত তাহারা খাইতে পারে না। অথচ আমরা পালঙ্ক বিছানা, মাদুর, এমন কি মাটির উপর বসিয়াও খাইতে পারি। আমাদের জন্য কোন বাধাবিঘ্ন নাই। এখন বলুন, কাহারা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে?

**আধুনিক সামাজিকতাঃ** এখন আধুনিক সামাজিকতার একটি নমুনা দেখুন। একবার আমার ভাইয়ের বাড়ীতে আহার করিতেছিলাম। আমরা সকলেই বিছানায় বসিয়া আহার করিতেছিলাম। জনৈক জেন্টেলম্যানও তথায় ছিলেন। তিনি কোট প্যান্টে আবৃত অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইয়া একদিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উদ্দেশ্য—হয়তো তাহার জন্য টেবিল চেয়ার আনা হইবে। কিন্তু ভাই সাহেব আমার উপস্থিতির দরুন টেবিল চেয়ারের কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। তিনি বহুক্ষণ পর্যন্ত ভিখারীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাতে আমি খুবই লজ্জা অনুভব করিলাম। অবশেষে তিনি অনিচ্ছা সহকারে উভয় পা এক দিকে লম্বা করিয়া ধড়াস করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "মাফ করিবেন, পা লম্বা করিয়া বসা ছাড়া আমার উপায় নাই।" আমি বলিলাম, "মাফ করিবেন, আমি টেবিল চেয়ারে বসিয়া খাইতে অক্ষম।" ভদ্রলোক পা লম্বা করিতে লজ্জা করিতেছিলেন আর আমি টেবিল চেয়ারে বসিয়া খাইতে লজ্জা করিতাম। অতএব, আমার লজ্জা আল্লামা তাফ্‌তাযানীর লজ্জার ন্যায় এবং ভদ্রলোকের লজ্জা তাইমুরলঙ্গের লজ্জার সদৃশ।

ঘটনা এইরূপঃ তাইমুরলঙ্গ দরবারে পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। কারণ, ল্যাংড়া হওয়ার দরুন তাঁহার এক পা সর্বদা সোজা হইয়া থাকিত। তাঁহার সময়ে আল্লামা তাফ্‌তাযানী খুব বড় আলেম ছিলেন। তাইমুরলঙ্গ তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, দরবারে তাঁহাকে নিজের সঙ্গে সিংহাসনে বসাইত। আল্লামা যখন সর্বপ্রথম দরবারে আহূত হন, তখন তিনিও তাইমুরের দেখাদেখি এক পা ছড়াইয়া সিংহাসনে বসিলেন। ইহাতে তাইমুর বিরক্তি স্বরে বলিলঃ معذورم دار که مرا لنگ است "আমার পা ল্যাংড়া। কাজেই আমাকে অপারগ মনে করুন। আমি ইচ্ছাপূর্বক পা ছড়াইয়া বসি নাই।" আল্লামা উত্তরে বলিলেনঃ معذورم دار که مرا ننگ است অর্থাৎ, "বাহ্যতঃ বাদশাহের চালচলন পদ্ধতি হইতে নিকৃষ্ট চালচলন অবলম্বন করিতে আমি লজ্জাবোধ করি।" কারণ, ইহাতে অন্যের দৃষ্টিতে এল্‌মের অবমাননা হইবে। কাজেই আপনিও আমাকে অপারগ মনে করুন।

এই উত্তর শুনিয়া তাইমুর চুপ হইয়া গেলেন। আল্লামা এর পর হইতে সর্বদাই পা ছড়াইয়া তাইমুরের দরবারে বসিতেন।

এই কারণে আমিও আগন্তুক ভদ্রলোকের জন্য চেয়ার আনিতে বলি নাই। কারণ, ইহাতে ইসলামী সভ্যতার অবমাননা হইত। আমি ভাবিলাম, ভদ্রলোক আজ আপন সামাজিকতার স্বাদ উপভোগ করিয়া দেখুক যে, ইহাতে কি পরিমাণ বিপদ! ইহাতে কি স্বাধীনতা যে, মানুষ চেয়ার টেবিল ব্যতীত বসিতেই পারে না?

একবার আমি কানপুরের মসজিদে হাদীস শরীফ পড়াইতেছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর কোটপ্যান্টে আবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অদূরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। উদ্দেশ্য, আমি উঠিয়া তাহার নিকট গেলে তিনি আমার সহিত আলাপ করিবেন। কিন্তু তাহার জন্য আমি হাদীসের পাঠ বন্ধ করিব কেন? অবশেষে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। খোদার কসম, যে পোশাক পরিধান করিলে চেয়ার না আসা পর্যন্ত অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, উহা হইতে বেশী কারাবাস আর কি হইতে পারে?

এক্ষেত্রে আমি জায়েয না-জায়েযের কথা বলিতেছি না, ইহা স্বতন্ত্র কথা। আমি বলিতেছি যে, এই সমস্ত লোক বড় গলায় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী করে এবং নিজদিগকে ইসলামের সমর্থক ও খাদেম বলিয়া প্রকাশ করে। অন্যের সামাজিকতা অবলম্বন করার পর তাহাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ইসলামপ্রীতি কোথায় বাকী থাকে? অন্যের সামাজিকতা অবলম্বন করত পরোক্ষভাবে ইসলামী সামাজিকতাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রকাশ করাই কি ইসলাম-প্রীতি? তাছাড়া ইহাতে আরও একটি অনিষ্ট আছে। যে আধুনিক সামাজিকতা আপনি গ্রহণ করেন, উহাতে বহুবিধ সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান। যেমন, একটি করিতে চাহিলে আরও দশটি না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং এসব বেড়াজালের ভিতর আপনার প্রিয় রটিত স্বাধীনতা কোথায় অবশিষ্ট থাকে?

আজকাল আমাদের যুবক সম্প্রদায় স্বাধীন মনোভাবের বশবর্তী হইয়া বিবাহ-শাদীতে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিতে চায়। আমি ইতিপূর্বেও কোথায়ও বলিয়াছি যে, তাহাদের এই মনোভাবে আমাদের আনন্দিত হওয়ার কিছু নাই। কারণ, তাহারা খোদা ও রাসূলের নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইগুলি নিষিদ্ধ করিতে চায় না; বরং নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্যই এইগুলি নিষিদ্ধ করিতে চায়। কুপ্রথা দমন করা তো আলেমদের কর্তব্য। কারণ, তাহাদের ধর্ম হইল ঃ تَرَكْتُ اللاَّتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا "লাৎ ও ওয্‌যা ইত্যাদি সকল প্রতিমাকে ত্যাগ করিলাম।" (খোদা ব্যতীত অন্য সবের পন্থা ত্যাগ করিলাম)

সালাম আদান প্রদান এবং কথাবার্তার বেলায়ও তাহারা বিজাতির অনুকরণ করিতে শুরু করিয়াছে। ইহার অর্থ হইল, তাহারা শরীঅতের সামাজিকতাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেহ টুপী খুলিয়া সালাম করে, কেহ ইংরেজী শব্দ দ্বারা সালাম করে, আবার কেহ শুধু আদাব ও তসলীম বলে ইত্যাদি।

**অনুমতি চাওয়া ঃ** সামাজিকতার কোন কোন অঙ্গ সম্বন্ধে কতক লোক মোটেই অবগত নয় যে, ইহা শরীঅতের আদেশের অন্তর্ভুক্ত কিনা; বরং তাহারা ইহাকে শরীঅত বহির্ভূত ব্যাপার মনে করে। যদি কেহ নিয়ম করিয়া লয় যে, সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তি প্রথমে আগমনের কথা জানাইয়া সাক্ষাতের অনুমতি লইবে, তবে তাহাকে দোষারোপ করা হয় এবং বলা হয় যে, সে ইংরেজের প্রথা চালু করিয়াছে। অথচ অনুমতি চাওয়ার এই বিষয়টি ইসলাম ধর্ম হইতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা

শিক্ষা করিয়াছে। কোরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে নির্দেশ বিদ্যমান আছে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। রাসূলে খোদা (দঃ)-ও ইহা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। এক্ষেত্রে বিষয়টির আসল স্বরূপ জানা দরকার। কেননা, আজকালকার যুবক সম্প্রদায় যাহা করে, তাহা ইসলামের অনুসরণের জন্য নহে; বরং উহাতেও তাহারা বিজাতির অনুকরণ করে।

তাই শুনুন, ইসলামে অনুমতি চাওয়ার জন্য কার্ড পাঠাইবার প্রয়োজন নাই এবং প্রত্যেক স্থানেই অনুমতি লইতে হয় না। বাহ্যিক হাবভাবে যদি মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্জনতায় বসিয়া আছে, যেমন ঘরের দরজা বন্ধ দেখা যায়; দরজায় পর্দা ঝুলানো আছে অথবা ঘরটিই মেয়েলোকের বসবাসের। এমতাবস্থায় সাক্ষাতের পূর্বে অনুমতি লওয়া আবশ্যক। যদি পুরুষদের ঘর হয় এবং দরজা খোলা থাকে, পর্দা ঝুলানো না থাকে অনুমতি চাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। (তবে যদি বাহ্যিক লক্ষণাদি দ্বারা জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঘরে অত্যন্ত জরুরী কাজে লিপ্ত আছে, অন্য কেহ তথায় গেলে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে, তবে অনুমতি না লইয়া যাওয়া উচিত নহে।) অনুমতি চাওয়ার নিয়ম এই যে, প্রথমে আস্‌সালামু আলাইকুম বলিবে। অতঃপর আপন নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "আমি ভিতরে আসিতে পারি কি?" অনুমতি দিলে যাইবে, নতুবা তিনবার এইরূপ করার পর ফিরিয়া যাইবে।

একবার ছাহাবী হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তিনি উপরোক্ত নিয়মে তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর উত্তর না পাইয়া আপন পথে ফিরিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খাদেমকে বলিলেন, "আবু মূসার আওয়ায শুনিয়াছিলাম তাহাকে ডাকিয়া আন।" খাদেম বাহিরে আসিয়া দেখিল তিনি চলিয়া গিয়াছেন। হযরত ওমরকে ইহা জানাইলে তিনি আবার নির্দেশ দিলেন—"যেখানেই পাও, তাহাকে এখানে ডাকিয়া আন।" হযরত আবু মূসা উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ফিরিয়া গেলেন কেন?" উত্তর দিলেন, "রাসূলে খোদা (দঃ) আমাদিগকে তিনবার সালাম করার পর উত্তর না আসিলে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন।"

এই বিষয়টি হযরত ওমরের জানা ছিল না। তাই তিনি আবু মূসাকে বলিলেন, "ইহা যে রাসূলে খোদা (দঃ)-এরই উক্তি, এ সম্বন্ধে আপনি কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিবেন কি?" এই কথা শুনিয়া হযরত আবু মূসা সাক্ষীর খোঁজে মসজিদে নববীতে চলিয়া গেলেন। তখন আনছারদের এক জমাআত মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সকলেই এ বিষয়ের সাক্ষী। তবে আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, আমরা তাহাকেই আপনার সহিত পাঠাইব—যাহাতে হযরত ওমর (রাঃ) বুঝিতে পারেন যে, আনছারদের ছেলেরাও এই বিষয়ে অবগত আছে।" আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ছিলেন ঐ দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনিই সাক্ষ্য দানের নিমিত্ত হাযির হইলেন এবং বলিলেন, বাস্তবিকই হুযূর (দঃ) তিনবার ডাকার পর ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

রাসূলে খোদা (দঃ) উপরোক্ত উক্তিটি নিজেও কার্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। একদা তিনি ছা'দ ইবনে ওবাদার বাড়ীতে তশ্‌রীফ লইয়া যান। তিনি তিনবার সালাম করত ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ছা'দ প্রত্যেকবারই চুপ রহিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—হুযূর বারবার সালাম করিতেছেন, ইহা সৌভাগ্যের কথা। ইহাতে বেশী পরিমাণে দো'আর বরকত পাওয়া যাইবে। তৃতীয় বারের পর যখন সালাম করিলেন না, তখন ছা'দ ঘর হইতে বাহির হইয়া

দেখিলেন যে, তিনি ফিরিয়া যাইতেছেন, দৌড়িয়া হুযূরের খেদমতে আরয করিলেন, "আপনি ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? আমি তো বেশী পরিমাণে বরকত লাভের জন্য উত্তর দিতেছিলাম না।" হুযূর (দঃ) বলিলেন, আমি তিনবারের বেশী অনুমতি না চাহিতে আদিষ্ট হইয়াছি। মোটকথা, হুযূর (দঃ) ফিরিয়া গেলেন।

আজকাল কেহ সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য এইরূপ নিয়ম চালু করিলে তাহাকে ফেরআউন, অহঙ্কারী ইত্যাদি মনে করা হইবে। কিন্তু হুযূর (দঃ) ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নিয়ম ইহাই ছিল। তিনবার চাওয়ার পর অনুমতি না পাইলে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন এবং মোটেই দুঃখিত হইতেন না। দেখুন, বিষয়টি কত সহজ। ইহাতে অনেক উপকার নিহিত আছে। অতএব, বুঝা গেল, আমাদের সামাজিকতা সর্বপ্রকারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পানাহারের ব্যাপারে এবং দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারেও। দুঃখের বিষয়, আমরা ইহার মূল্য দেই না এবং বিনা প্রয়োজনে অন্যের দুয়ারে ভিখারীর ন্যায় ধরনা দেই।

**ছূফীবাদের স্বরূপঃ** ছূফীবাদ ধর্মের পঞ্চম অঙ্গ। পরিতাপের বিষয় আজকাল লোকেরা ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। অনেকের ধারণা, ছূফীবাদ বড় কঠিন ব্যাপার। ইহাতে পরিবার পরিজন সব ত্যাগ করিতে হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বন্ধুগণ, খোদার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি করাই হইল ছূফীবাদের স্বরূপ। ইহাতে না-জায়েয সাংসারিক সম্পর্ক অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। তবে জায়েয ও জরুরী সম্পর্ক ইহা দ্বারা আরও নিবিড় হইয়া যায়। তাই ছূফীগণ বিবি-বাচ্চাদের সহিত যেরূপ সুমধুর সম্পর্ক রাখেন, দুনিয়াদারগণ তদ্রূপ রাখিতে পারে না। অনেকে মনে করে, ছূফীগণ নিষ্ঠুর প্রকৃতির হইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা এতই করুণহৃদয় যে, জন্তুদের প্রতিও করুণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংসর্গে থাকিলে জানা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেকের আরামের প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখেন। অতএব, ইহাকে ভয় করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহে। ফলে ইসলামের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ একেবারেই বাদ পড়িয়া যাইতেছে। এই অঙ্গটির প্রয়োজনীয়তা ও উহা লাভ করা সম্পর্কে কোরআন শরীফে স্থানে স্থানে নির্দেশ রহিয়াছে। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ❋

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা খোদাকে প্রকৃত ভয় করার ন্যায় ভয় কর।" ইহাতে পূর্ণ তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীতি) অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ছূফীবাদ বলিতে ইহাই বুঝায়। চাক্ষুষ দেখা গিয়াছে যে, ছূফীগণ ব্যতীত খোদাকে এইরূপ আর কেহ ভয় করিতে পারে না। তাহাদের প্রত্যেকটি কথায় খোদা-ভীতি ফুটিয়া উঠে। নির্ভীকতা ও স্বাধীন চিত্ততার নামগন্ধও তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছূফীবাদ সম্পর্কে হাদীসেও তাকীদ রহিয়াছে। রাসূলে খোদা (দঃ) বলেনঃ

اِنَّ فِىْ جَسَدِ ابْنِ اٰدَمَ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

"মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে। উহা ঠিক হইলে সমস্ত শরীরই ঠিক হইয়া যায় এবং উহা নষ্ট হইয়া গেলে সমস্ত শরীরই নষ্ট হইয়া যায়। শুনিয়া রাখ, উহা হইল আত্মা।" এই হাদীসে আত্মার সংশোধনের জন্য জোর তাকীদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাকেই সংশোধনের কেন্দ্র

প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ইহাই ছুফীবাদের সারকথা। ইহাতে আত্মার সংশোধনের প্রতিই যত্ন নেওয়া হয়।

**ইসলামের স্বরূপ ঃ** এক হাদীসে বর্ণিত আছে—(ইহা হাদীসে জিব্‌রায়ীল নামে খ্যাত।) একবার হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ) মানবাকৃতি ধারণ করিয়া রাসূলে খোদা (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। ছাহাবাদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি হযরত (দঃ)-কে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হইল ঃ

يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ

"হে মোহাম্মদ! আমাকে ইসলামের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত করুন।"

قَالَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔

হুযূর বলিলেন ঃ "ইসলামের স্বরূপ হইল এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত রাসূল এবং নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং বায়তুল্লাহ্ পৌঁছিবার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করা।" জিব্‌রায়ীল (আঃ) আবার প্রশ্ন করিলেন ঃ

اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ *

"আমাকে ঈমানের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত করুন।"

قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

হুযূর বলিলেন ঃ "ঈমান হইল—আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত আসমানী কিতাব, সকল পয়গম্বর, কিয়ামত দিবস এবং তক্‌দীরের ভাল-মন্দের উপর পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা।" (ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে মুসলমান হওয়া যায় না এবং কিয়ামত, তক্‌দীর ও ফেরেশতাদের উপর ঈমান না থাকিলে মু'মিন হওয়া যায় না। কিয়ামত বিশ্বাস করার অর্থ নিজস্ব মনগড়া উপায়ে বিশ্বাস করা নয়; বরং হুযূর (দঃ) যেরূপ বলিয়াছেন, ঠিক ঐরূপে বিশ্বাস করা। সুতরাং হিসাব-কিতাব, আমল ওযন করা, পুলসিরাত ইত্যাদি সব কিছুতেই বিশ্বাস রাখিতে হইবে। হাদীস হইতে ইহাও জানা যায় যে, আমল ইসলামের একটি অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং পূর্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী যাহারা ধর্মের অঙ্গসমূহে বাছাই করে, তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল।)

হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ) পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন ঃ قَالَ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ "আমাকে এহ্সান (এখলাছ) সম্বন্ধে জ্ঞাত করুন।"

قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ *

"রাসূলে খোদা (দঃ) উত্তরে বলিলেন ঃ এহ্সানের অর্থ—এরূপভাবে খোদার এবাদত করা যেন আপনি তাহাকে দেখিতেছেন। কেননা, আপনি যদি তাহাকে না-ও দেখেন, তিনি তো আপনাকে নিশ্চয়ই দেখিতেছেন।" (হাদীসের মতলব এই যে, খোদাকে দেখিয়া যেভাবে এবাদত করা উচিত, সেইভাবে কর। চাকর যদি জানে যে, মালিক তাহাকে দেখিতেছে, তবে সে

www.almodina.com

মালিককে না দেখিলেও ঐ রকম কাজ করিবে, যে রকম মালিককে দেখিলে করিত।) ইহাতে বুঝা যায় যে, ইসলাম ও ঈমান পূর্ণরূপে অর্জন করিতে হইলে আরও একটি বিষয় অত্যাবশ্যকীয়। উহাতে পূর্ণরূপে এবাদত পালিত হয়। উহাই এহ্‌সান। বলা বাহুল্য, এই এহ্‌সান অর্জন করাই ছূফীবাদের লক্ষ্য।

**আমলের প্রকারভেদ ঃ** আমল দুই প্রকার। প্রথমতঃ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। দ্বিতীয়তঃ, অন্তরের আমল। এবাদত, লেন-দেন, সামাজিকতা ইত্যাদি প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অন্তরের আমলও দুই প্রকার। প্রথমটি আকায়েদ। এই প্রকার আমল শুধু জানিতে ও বিশ্বাস করিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সমস্ত আমল, যাহা অন্তরে সৃষ্টি করিতে হয় এবং উহার বিপরীত বিষয়গুলি হইতে অন্তরকে পবিত্র রাখিতে হয়। যথা ঃ এখলাছ, ছবর, শুক্‌র, মহব্বত, খোদা-ভীতি, খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্টি, তাওয়াক্কুল, বিনয়, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি। এইগুলি লাভ করা জরুরী এবং ইহাদের বিপরীত বিষয়গুলি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলাও জরুরী। যথা ঃ রিয়া, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি। মোটকথা, কোন কোন কাজ গ্রহণযোগ্য ও কোন কোন কাজ বর্জনীয়, এইগুলি দ্বারাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা এবাদত ইত্যাদি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, আর এই সবগুলির পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার নামই এহ্‌সান।

এখন কোরআন ও হাদীসে এই সমস্ত আন্তরিক আমলের প্রতি তাকীদ আছে কিনা, তাহাই দেখুন। কোরআনে বলা হইয়াছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝

"ঐ সমস্ত নামাযীদের জন্য অভিশাপ, যাহারা নামাযের বিষয়ে গাফেল এবং যাহারা লোক-দেখান নামায পড়ে।" এই আয়াতে নামাযে রিয়া ও গাফলতি সম্পর্কে কঠোর শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ *

"যাহার অন্তরে অণু পরিমাণও অহঙ্কার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" তদ্রূপ কোরআন ও হাদীসের আরও বিভিন্ন স্থানে মন্দ চরিত্রের নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির উল্লেখ এবং উত্তম চরিত্রের তাকীদ ও উহার পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। অতএব, চরিত্রের এই অঙ্গ অর্জন করা ওয়াজিব প্রমাণিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাই ছূফীবাদের স্বরূপ। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, ছূফীবাদ ধর্মের একটি বিশেষ জরুরী অঙ্গ।

তবে প্রত্যেক বিষয়ে কিছু না কিছু আনুষঙ্গিক কাজ এবং উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যেমন, হজ্জ করিতে হইলে পথখরচ সঙ্গে লইতে হয়। ইহাতে সহজে গন্তব্যস্থানে পৌঁছা যায়। তদ্রূপ ছূফীবাদের আসল লক্ষ্য আত্ম-সংশোধন হইলেও উহা লাভ করিতে কতিপয় উপায় অবলম্বন করিতে হয়, যদ্দরুন সহজে আসল লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। যেমন, যিকর-আয্‌কার, হাল ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, আজকাল ভুলক্রমে এইগুলিকেই আসল লক্ষ্য বানাইয়া লওয়া হইয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এইগুলি আনুষঙ্গিক ব্যাপার এবং উপায় মাত্র। আসল লক্ষ্য হইল আত্মার সংশোধন। এই লক্ষ্যেরও একটি লক্ষ্য আছে। তাহা হইল খোদার সন্তুষ্টি লাভ। ইহার প্রত্যক্ষ ফল খোদার নৈকট্য লাভ।

www.almodina.com

মোটকথা, ধর্মকর্মের ধারাবাহিকতা এইরূপ হইবে—প্রথমে আকায়েদ শুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা, এবাদত, লেন-দেন ও সামাজিকতা শুদ্ধ করিবে। এর পর আত্মার সংশোধনের প্রতি যত্নবান হইবে। কামেল শায়খকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাঁহার নির্দেশমত যিকরে মশ্‌গুল হইবে। ইহাতে আত্মসংশোধন সহজে লাভ হয়। কেননা, যিকর-আয্‌কার দ্বারা খোদার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ফলে শীঘ্র শীঘ্র অন্তরে চারিত্রিক যোগ্যতা সৃষ্টি হইয়া যায়। যিকর-আয্‌কার করার সময় চরিত্রের প্রতিও লক্ষ্য দেওয়া উচিত। কেননা, ইহাই মুখ্য বিষয়। কিছু সংখ্যক লোক শুধু যিকরেই লিপ্ত থাকে চরিত্র সংশোধনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহা অজ্ঞানতা বৈ কিছুই নহে। চরিত্র সংশোধনের উপায় হইল শায়খের সম্মুখে নিজের দোষ-ত্রুটি পরিষ্কার বর্ণনা করিয়া দেওয়া। এর পর শায়খ যে পন্থা বলিয়া দেন, উহার উপর আমল করা, যেরূপ ইমাম গায্‌যালী (রঃ) 'এহ্‌ইয়াউল উলূম' কিতাবে আত্মার প্রত্যেকটি রোগ ও উহার চিকিৎসা, পৃথক পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক আত্মার সংশোধনের জন্য মনগড়া উপায় বাহির করিয়াছে। তাহারা শুধু যিকর করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যায়। স্মরণ রাখুন, এইভাবে আত্মার সংশোধন হয় না; বরং পূর্বোল্লিখিত উপায়েই ইহা হাছিল হয়। যেমন, কাহারও মধ্যে অহঙ্কার থাকিলে শায়খের উচিত—যিকর করার সাথে সাথে তাহাকে এমন কাজ করিতে বলা, যাহাতে অন্তরে বিনয় ভাব উৎপন্ন হয়। যেমন, নামাযীদের ওযূর জন্য লোটা ভরিয়া দেওয়া, তাহাদের জুতা সোজা করা ইত্যাদি। শায়খ না বলিলেও মুরীদের স্বেচ্ছায় এরূপ কাজ করা উচিত। যাহাতে অন্তরে বিনয় ভাব সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ কাহারও মধ্যে হিংসা-রোগ থাকিলে তাহার উচিত—যাহার প্রতি হিংসা, তাহার প্রশংসা করা। ইহাতে অন্তরের মলিনতা দূর হইয়া যাইবে। এইরূপে প্রত্যেকটি রোগের বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা আছে, ছুফীবাদ সম্পর্কিত পুস্তক পাঠ করিলে ইহা জানা যাইবে। মোটকথা, এগুলিই হইল চরিত্র সংশোধনের উপায়।

অতঃপর ইহার ফল অর্থাৎ, খোদার সন্তুষ্টির কথা আসে। আজকাল কিছু লতীফা জারী হওয়া, কিছু রোদন ও ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হওয়া ইত্যাদিকেই ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বন্ধুগণ, এগুলি হাল মাত্র যাহা ক্ষমতা বহির্ভূত। সুতরাং কাম্য হইতে পারে না। যাহা লাভ করা বান্দার ক্ষমতাধীন অর্থাৎ, উত্তম চরিত্র অর্জন করা ও দুশ্চরিত্রতা হইতে বাঁচিয়া থাকা, ইহাই মূল উদ্দেশ্য। 'কাশ্‌ফ' (অদৃশ্য বিষয়কে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখা) কাম্য হওয়া উচিত নহে। উহা লাভ হইয়া গেলে যদি অন্তরে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা দেখা না দেয়, তবে উহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর লাভ না হইলে তজ্জন্য তৎপর না হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় বুঝা উচিত যে, কাশ্‌ফ না হওয়াই তাহার সাফল্যের উপায় বিবেচিত হইয়াছে। কারণ, মাঝে মাঝে কাশ্‌ফের ফলে মানুষ নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়া পড়ে। মোটকথা, আপনি নিজের জন্য কোন পথ বাছিয়া লইবেন না।

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم در کش – که آنچه ساقی ما ریخت عین الطاف است

(বদর্‌দ ও ছাফ তোরা হুকুম নীস্ত দম দরকাশ
কেহ্ আঁচে সাকীয়ে মা রীখ্‌ত আইনে আল্‌তাফ আস্ত)

"সঙ্কোচ ও খোলাখুলি ভাবে চাওয়া না চাওয়ার অধিকারী তুমি নও। খোদা তোমাকে যাহাই দেন, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পক্ষে উহাই মঙ্গলজনক ও সাক্ষাৎ মেহেরবানী।" আরও বলেন ঃ

www.almodina.com

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن ـ کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند

(তু বন্দেগী চু গাদায়াঁ বশর্‌তে মুযদ মকুন + কেহ্ খাজা খোদ রভিশে বন্দা পরওয়ারী দানাদ)

"তুমি মজুরের ন্যায় পারিশ্রমিকের শর্তে খোদার বন্দেগী করিও না। কেননা, প্রভু দাস পালনের রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন।"

হাল ইত্যাদি লক্ষ্য বস্তু মনে করিয়া লওয়াই সকল ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তার মূল কারণ। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এগুলি উপায় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে গণ্য। এগুলি প্রত্যেকের মধ্যেই বিভিন্নরূপে দেখা দিতে পারে। মোটকথা, উল্লিখিত পাঁচটি অঙ্গ লাভ করাই ধর্মের সারকথা। এইগুলিকেই সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ○

উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গ কার্যে পরিণত করিলে আপনি اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবেন। অতঃপর ইহার ফল লাভ হইবে। অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হইয়া যাইবেন। পূর্বে ইহার ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে করা হইয়াছে।

অদ্যকার ওয়াযের আলোচ্য বিষয় ছিল শুধু ইহার উপায় বর্ণনা করা। খোদার ফযলে ইহা প্রয়োজনানুযায়ী বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। এখন আমল করা আপনাদের কাজ। আসুন, দো'আ করি—হক তা'আলা আমাদের সকলকে সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও আমল করার সাহস দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصّٰلِحٰتُ ○

— ■ —

www.almodina.com

# পূর্ণ ধার্মিকতা

■

পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের আবশ্যকতা ও উহার উপায় সম্বন্ধে দিল্লীর বল্লীমাঁরা মহল্লায় পাঞ্জাবীদের মসজিদে ২৫শে যিলহজ্জ ১৩৪০ হিজরী রবিবার সকাল ৭—৫ মিনিট হইতে সোয়া এগারটা পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় ওয়ায করেন। শ্রোতাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। হযরত মাওলানা যফর আহ্‌মদ ওসমানী থানভী সাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার সহজতম পথ এই যে, অসম্পূর্ণ অবস্থার উপর সন্তুষ্ট না হইয়া পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। উহার উপায় হইল আমলে পূর্ণতা অর্জন করা, ফরয ও ওয়াজিব পালনে ত্রুটি না করা, হারাম কার্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আমল কামেল করার সময় নফসে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে থাকিয়া উহার প্রতিকার করা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قَالَ اللهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ*

আয়াতের অর্থঃ 'হে ঈমানদারগণ! খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।'

## ভূমিকা

ইহা একখানি সংক্ষিপ্ত আয়াত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তৎসঙ্গে উহা লাভ করার উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। আয়াতে বর্ণিত উপায়টি যে অত্যন্ত সহজ, আমি পরে তাহা প্রমাণ করিব। ইহা জানা কথা যে, প্রত্যেকেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য ও উহা অর্জন করার উপায় রহিয়াছে। এই উপায় কখনও সহজ, কখনও কঠিন হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও তাহার উপায় জানা থাকিলে এবং উপায়টি সহজ হইলে সত্বর কৃতকার্য হওয়া যায়।

www.almodina.com

বলা বাহুল্য, অকৃতকার্যতার একমাত্র কারণ হইল উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট না হওয়া অথবা নির্ভুল উপায় অবগত না থাকা কিংবা উপায় এত কঠিন হওয়া যে, উহা লাভ করিতে মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে।

**অকৃতকার্যতার রহস্যঃ** উদাহরণতঃ রুগ্ন ব্যক্তির অকৃতকার্যতার কয়েকটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, সুস্থতা যে একটি লক্ষ্যবস্তু, তাহা সে জানে না। কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সে কখনও সচেষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ইহা জানা থাকিলেও সুস্থতা লাভ করিবার উপায় চিকিৎসা কিনা, তাহা জানে না। তৃতীয়তঃ, ইহাও জানা থাকিলে চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভুল করিয়া বসে। আবার এমনও হয় যে, লক্ষ্যবস্তু জ্ঞাত, উপায়ও জ্ঞাত, নির্ভুল পদ্ধতিও জ্ঞাত, কিন্তু সাহসের অভাব। যেমন, সুস্থতা যে কাম্যবস্তু তাহা জানা আছে। ইহার উপায় যে চিকিৎসা তাহাও অজানা নহে এবং চিকিৎসকও খুব দক্ষ বলিয়া জানা আছে, কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, চিকিৎসক একশত টাকার একটি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়াছে। অথচ সে এত টাকা মূল্যের ঔষধ কিনিতে সক্ষম নহে। উপরোক্ত বিষয়গুলিই যাবতীয় পার্থিব ব্যাপারে অকৃতকার্যতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

উদাহরণতঃ, জীবিকা উপার্জন যে একটি লক্ষ্যবস্তু, এই ব্যক্তি তাহা মোটেই জানে না। ফলে সে সর্বদা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে। কিংবা ইহা জানিলেও উহার উপায় জানে না। বলা বাহুল্য, এই উভয় ব্যক্তিই অনাহারে মরিবে অথবা কেহ উপায় জানে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ব্যবসা করার পরামর্শ দিল। কারণ, তাহারা ইহাতে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। এখন জানা কথা যে, ব্যবসার জন্য টাকা-পয়সা দরকার। অথচ এই ব্যক্তি কখনও টাকা-পয়সার মুখও দেখে নাই। সুতরাং এই ব্যক্তিও অনাহারে মরিবে। কেননা, বন্ধুরা তাহাকে এমন এক উপায় বলিয়াছে, যাহা তাহার সামর্থ্যের বাহিরে। কেহ দয়া করিয়া তাহাকে মজুরীর উপায় বলে নাই। ইহাতে শুধু হাত-পা কাজে লাগাইতে হয়, টাকা-পয়সার দরকার হয় না। এইরূপে প্রত্যেক কাজেই চিন্তা করিলে অকৃতকার্যতার রহস্য জানা যাইবে।

**আকাঙ্ক্ষা ও উপায়ের পার্থক্যঃ** লক্ষ্য এবং উপায় নির্দিষ্ট ও সহজ হওয়ার পরও যদি কেহ অকৃতকার্য থাকে, তবে ইহার একমাত্র কারণ হইবে অলসতা। এই ব্যক্তি শুধু আকাঙ্ক্ষা করাকেই উদ্দেশ্য হাছিলের উপায় মনে করে। ইহা মারাত্মক ভুল। শুধু আকাঙ্ক্ষা কোন কিছু লাভ করার উপায় হইতে পারে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি ঘরে শস্য সঞ্চিত করিতে চায়; কিন্তু তজ্জন্য চাষবাস, বীজ বপন ইত্যাদি কিছুই করে না। এমতাবস্থায় সে শত আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাহার ঘরে শস্য সঞ্চিত হইতে পারে না। কারণ, শুধু আকাঙ্ক্ষা করিলে শস্যে ঘর ভরিয়া যাইবে—খোদার রীতি তাহা নহে। হাঁ, খোদা আপন ক্ষমতা প্রদর্শনার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ করিয়া দিলে তাহা নিতান্তই বিরল ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিরল না থাকারই শামিল। কোনরূপ উপার্জন ব্যতিরেকে শস্যে ঘর ভরিয়া দেওয়া খোদার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়। কোন কোন সময় এরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে, কেহ কেহ অভাবিত উপায়ে বিরাট ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া এক দিনেই বিত্তশালী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খোদা এরূপ করার কোন ওয়াদা দেন নাই। সুতরাং খোদার রীতি ও ওয়াদা না থাকা সত্ত্বে কোন্ ভরসায় হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা যাইবে?

উদাহরণতঃ, খোদা আপন ক্ষমতা প্রদর্শনার্থে হযরত মরইয়মকে, পিতা ব্যতীতই একটি পুত্র-সন্তান দান করিয়াছিলেন। অথচ পিতা ব্যতীত সন্তান না হওয়াই খোদার চিরন্তন রীতি। এখন যদি কোন মহিলা বিবাহ ছাড়াই মরইয়মের ন্যায় বিনা বাপে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে,

www.almodina.com

তবে সকলেই তাহাকে পাগল আখ্যা দিবে। এক্ষেত্রে মনে করা হইবে যে, মহিলাটি আসলে সন্তানই কামনা করে না। করিলে সে অবশ্যই বিবাহ করিত।

তদ্রূপ, হক তা'আলা আদম (আঃ) কে পিতা-মাতা ছাড়াই পয়দা করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন পুরুষ যদি মনে করে যে, বিবাহ ও স্ত্রীসঙ্গম ব্যতিরেকেই তাহারও একটি পুতুলের ন্যায় মাটি নির্মিত সন্তান পয়দা হউক, তবে সকলেই তাহাকে বোকা বলিবে এবং মনে করিবে যে, সে সন্তান চায় না। চাহিলে অবশ্যই বিবাহ করিত।

মোটকথা, পার্থিব কাজকর্মে উপায় অবলম্বন করা জ্ঞানী মাত্রই জরুরী মনে করেন এবং কেবল আকাঙ্ক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করেন না; বরং উপায়হীন আকাঙ্ক্ষাকে সকলেই নির্বুদ্ধিতা মনে করে। অথচ উপায় অবলম্বন করিলেও উদ্দেশ্য হাছিল হওয়া নিশ্চিতও নহে। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকে চাকুরী করে, কিন্তু বেতন পায় না। কেহ কেহ মজুরী করিয়াও পারিশ্রমিক পায় না। অনেকে শিল্প কাজ জানে, কিন্তু তাহা কোন কাজে লাগাইতে পারে না। তবে শুধু আশার উপর ভিত্তি করিয়া জ্ঞানিগণ এসব উপায় অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তায় একমত হইয়াছেন।

**ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাইঃ** অতি আশ্চর্যের বিষয়! ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে উপরোক্ত নিয়মের অনুসরণ করা হয় না। অথচ ধর্মকাজ সবকিছুই হইতে উত্তম লক্ষ্যবস্তু। কেননা, দুনিয়া অপেক্ষা দ্বীন অগ্রগণ্য বলিয়াই মুসলমানের বিশ্বাস। ধর্মের উপায়ও নির্দিষ্ট এবং জ্ঞাত আছে। তাছাড়া এই সব উপায় যে নির্ভুল, তাহাও অজানা নহে। কারণ, খোদা ও রাসূলের উক্তিকে সত্য জ্ঞান করা মুসলমানের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এই সব উপায় কঠিনও নহে। তবে ইচ্ছারও প্রয়োজন নাই এই অর্থে সহজ নহে; বরং ধর্মীয় উপায়সমূহে পরিশ্রম ও জটিলতার কিছুই নাই। ইচ্ছার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আমার এই দাবীর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ আল্লাহ্‌র উক্তি مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ "খোদা তোমাদের ধর্মীয় কাজে মোটেই সঙ্কীর্ণতা রাখেন নাই।" অপর এক আয়াতে বলেনঃ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "খোদা তোমাদের কাজ সহজ করিতে চান, তোমাদিগকে কোনরূপ ক্লেশে ফেলিতে চান না।"

কোরআনের উপর মুসলমানদের ঈমান আছে। কাজেই এই দাবী প্রমাণ করার জন্য এতটুকু বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট যে, ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই বলিয়া হক তা'আলা নিজেই কোরআনে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আমি এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব না; বরং আরও অগ্রসর হইয়া বলিব যে, এই দাবীটি যুক্তিসঙ্গত বটে। কারণ, যখন কোরআন অবতীর্ণ হয়, তখন সমস্ত কাফের ইহার বিরোধিতায় দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ইহার দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিল। তাহারা কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নানাবিধ বাহানা খুঁজিতেছিল। অপরপক্ষে কোরআন বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাইয়া বলিল যে, কাহারও সামর্থ্য থাকিলে কোরআনের ন্যায় একটি কিতাব রচনা করিয়া আনুক। ইহাতে কাফেররা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে। এর পর হইতে আজ পর্যন্ত প্রতি যুগেই ধর্মদ্রোহীদল কোরআন সম্পর্কে নানাবিধ আপত্তি উত্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই বলিয়া কোরআন যে জোর দাবী জানাইয়াছে, ইহাতে সামান্যও দুর্বলতা বা ইহা অমূলক হওয়ার সামান্যতম আভাস থাকিলে ধর্মদ্রোহীদল ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া কোরআনের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিত না। তাহারা উঠিয়া পড়িয়া এই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত এবং বিরোধিতার জন্য একটি উত্তম বাহানা পাইয়া বসিত যে,

দেখুন কোরআনের দাবী কতখানি বাস্তব-বিরোধী। এত কঠিন ধর্মকে সহজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বিধর্মী ও বিরুদ্ধাচারী এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করিতে পারে নাই। অন্যথায় অন্যান্য উত্থাপিত সমালোচনার ন্যায় ইহাও বর্ণিত হইত। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিরোধীদল এ ব্যাপারে আপত্তি করার জন্য এতটুকুও সুযোগ পায় নাই।

**আধুনিক যুগের আপত্তিসমূহঃ** পরিতাপের বিষয়, আজকাল কোরআনে বিশ্বাসী কতক মুসলমান উপরোক্ত দাবী সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। অথচ বিরুদ্ধবাদিগণও এ ব্যাপারে সমালোচনার সুযোগ পায় নাই। আমি এই কথা বলি না যে, তাহারা এই দাবীর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না। বিশ্বাস করে, তবে কোরআনের এই দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা না করিলেও মন খুলিয়া ইহাকে সমর্থনও করে না। সমর্থন করিতে যাইয়া তাহাদের অন্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, বিরুদ্ধবাদিগণ কর্তৃক যে দাবী স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে, মুসলমানদের তরফ হইতে উহাতে আপত্তি উত্থাপন করা যারপরনাই লজ্জাকর ব্যাপার।

বন্ধুগণ, আমি কসম করিয়া বলি যে, কোরআনের এই দাবী ষোল আনা সত্য ও নির্ভুল। ইহাতে সামান্যও দুর্বলতা থাকিলে ধর্মদ্রোহীরা তাহা লইয়া হৈ চৈ করিতে দ্বিধা করিত না। আজকাল দুর্বল বিশ্বাসী মুসলমানদের তরফ হইতে এই দাবীর বিপক্ষে এইরূপ যুক্তি বর্ণনা করা হয়ঃ ভাই, ধর্মের উপর আমল করা কঠিন ব্যাপার। ব্যবসা করিতে গেলে পদে পদে শরীঅতের ফতওয়ার সম্মুখীন হইতে হয়। এইরূপে কারবার করিলে ইহাতে সুদ হইবে। এইভাবে করিলে মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই ইহা না-জায়েয, এইভাবে করিলে ত্রুটিযুক্ত শর্ত শামিল হইয়া যায় ইত্যাদি। ইউরোপে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইউরোপীয়ানদের সহিত ব্যবসা করিতে হয়। তাহারা এসব ব্যাপারে উন্মুক্ত মনোভাবের অধিকারী। ফলে তাহাদের অনেক নিয়ম কানূন শরীঅতের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। এমতাবস্থায় ব্যবসা করিলে ধর্ম ঠিক রাখা যায় কিরূপে? আবার ধর্ম ঠিক রাখিলে ব্যবসা সিকায় উঠিতে বাধ্য। সুদ ব্যতীত কোথাও ঋণ পাওয়া যায় না। অথচ ঋণ না করিলে ব্যবসা চলিতে পারে না। এই উভয় সঙ্কটের অবস্থায় মানুষ কি করিবে?

চাকুরীক্ষেত্রেও শরীঅতের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করিতে হয়। কৃষিকাজেও পদে পদে শরীঅতের নির্দেশাবলী বাধা সৃষ্টি করে। আমি এই ওয়াযে উপরোক্ত যাবতীয় আপত্তিসমূহের উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব। ইহা ছাড়া আরও কোন আপত্তি কাহারও খেয়ালে থাকিলে আমার বর্ণিত উত্তরে উহারও সমাধান পাওয়া যাইবে।

**কতিপয় উদাহরণঃ** তবে আমি উত্তর দানের পূর্বে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। গল্পটি যদিও নোংরা, তথাপি অবস্থার সহিত চমৎকার খাপ খায়। আমাদের মহল্লায় জনৈকা মহিলা মাগরেবের সময় বাচ্চাকে পায়খানা করাইতেছিল। সেদিন ছিল ঈদের চন্দ্রোদয়ের তারিখ। আবালবৃদ্ধবণিতা ঈদের চাঁদ দেখিতেছিল। মহিলাটিও বাচ্চার পায়খানা মুছিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি মুছিবার কারণে অজ্ঞাতেই তাহার হাতে সামান্য পায়খানা লাগিয়া গিয়াছিল। সে মহিলাদের প্রথা অনুযায়ী নাকে অঙ্গুলি রাখিয়া দেখিতেছিল। ফলে নাকে পায়খানার দুর্গন্ধ অনুভূত হইল। ইহাতে সে নাক সিট্‌কাইয়া বলিতে লাগিল, "উহু, এবারকার ঈদের চাঁদ পচা কেন?" বন্ধুগণ, এই মহিলাটির অঙ্গুলির পায়খানা যেমন চাঁদের গায়ে অনুভূত হইয়াছিল, ফলে সে চাঁদকে পচা মনে করিয়াছিল। খোদার কসম, তদ্রূপ আপনারাও ধর্মের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা দেখিতেছেন। আসলে এই সঙ্কীর্ণতা আপনাদের মধ্যেই নিহিত আছে, ধর্মের মধ্যে নহে।

আপনাদের তমদ্দুন (কৃষ্টি) ও জীবনযাপন পদ্ধতিই সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ। আমি পরে ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করিব। আপনি নিজের অঙ্গুলি কখনও দেখেন না যে, উহাতে নাপাকী লাগিয়া রহিয়াছে। অনর্থক শরীঅতের চাঁদকে দুর্গন্ধযুক্ত আখ্যা দেন। অথচ শরীঅতের চাঁদ এত উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন যে, এই সমস্ত আবর্জনা উহার ধারেকাছেও পৌঁছিতে পারে না।

জনৈক নিগ্রোর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। সে একবার পথিমধ্যে একটি আয়না পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা কুড়াইয়া লয় এবং উহাতে আপন চেহারা দেখিতে থাকে। সে আয়নার ভিতরে একটি ভয়াবহ কুৎসিত চেহারা প্রতিফলিত হইতে দেখিল। ইহাতে সে মনে করিল যে, চেহারাটি পূর্ব হইতেই আয়নার মধ্যে বিদ্যমান আছে। চেহারাটি যে তাহারই, নিজের সম্বন্ধে এইরূপ কু-ধারণা করিতে সে প্রস্তুত ছিল না। মানুষ স্বীয় চেহারা দেখিতে পায় না বলিয়া উহার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। নিগ্রো ব্যক্তি চেহারা দেখার পর আয়নাটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এমন কদাকার চেহারাবিশিষ্ট ছিলে বলিয়াই তো তোকে কেহ এখানে ফেলিয়া গিয়াছে।"

বন্ধুগণ! ঠিক তেমনি আপনার কুৎসিত চেহারা ধর্মের আয়নায় দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু আপনি মনে করেন যে, কদর্যতা (নাঊযুবিল্লাহ্) ধর্মের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। অথচ ধর্ম এত পরিষ্কার ও জ্যোতির্ময় যে, অন্ধকার ও কালিমা উহার কাছেও ঘেষিতে পারে না। তবে স্বচ্ছ হওয়ার কারণে আপনার চেহারা উহাতে প্রতিফলিত হয়। আপনি উহাকে ধর্মেরই চেহারা মনে করিয়া বসেন। মাওলানা রূমী ইহার নযীর হিসাবে একটি গল্প বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

حمله بر خود میکنی ای ساده مرد — هم چوں آں شیرےکه بر خود حمله کرد

"হে সরল প্রাণ ব্যক্তি, তুমি সিংহের ন্যায় নিজকেই আক্রমণ করিতেছ।"

মাওলানা মসনবী শরীফে এই গল্পটি নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। একদা বন্য পশুরা পরামর্শ সভা ডাকিয়া আলোচনা করিল যে, সিংহ প্রত্যহ আমাদিগকে অতিষ্ঠ করে এবং দুই একটি পশু ধরিয়া লইয়া যায়। ফলে প্রাণ নাশের আশঙ্কায় প্রত্যেকের জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আস আমরা সকলে যাইয়া সিংহকে বলি, সে যেন এইভাবে আমাদিগকে বিরক্ত না করে। তাহার আহারের জন্য আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া পশু পাঠাইয়া দিব। ইহাতে অন্যান্য সকল পশু নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে। সিংহকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইলে সে সানন্দে সম্মতি জানাইল। কারণ, ইহাতে তাহারও যথেষ্ট আরাম ছিল। বিনা কায়-ক্লেশে ঘরে বসিয়া নিত্যকার খোরাক পাইবে। ইহার পর হইতে বন্য পশুরা প্রত্যহ লটারীযোগে একটি পশু নির্দিষ্ট করিত। লটারীতে যাহার নাম বাহির হইত, সকলে জোর জবর করিয়া তাহাকে সিংহের দরবারে পাঠাইয়া দিত।

ঘটনাক্রমে একদিন খরগোশের পালা আসিল। সকলে বলিল, যাও, আজ তুমিই সিংহের খাদ্য। খরগোশ বলিল, আমি যাইব না। স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখে পা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নহে; ইহা আত্মহত্যারই শামিল। সকলে বলিল, এখন এই ধরনের কথা বলা উচিত নহে। ইহাতে সিংহের সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ হইবে। খরগোশ বলিল, যে চুক্তির ফলস্বরূপ আত্মহত্যা করিতে হয়, তাহা স্বয়ং অবৈধ। সুতরাং অবৈধ চুক্তি পালন করা জরুরী নহে। খরগোশের এই যুক্তি শুনিয়া বন্য পশুদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলে একত্রিত হইয়া খরগোশকে বুঝাইতে লাগিল যে,

www.almodina.com

সে না গেলে পশুরাজ সিংহ যারপরনাই রাগান্বিত হইবেন। খরগোশ বলিল, সিংহ রাগান্বিত হইলে সকলের প্রতিই হইবে। ইহাতে যাহার মৃত্যু আসন্ন হইবে, সিংহ তাহাকেই খাইয়া ফেলিবে। তখন আমি হয়তো বাঁচিয়া যাইব। অপর পক্ষে তোমাদের কথামত কাজ করিলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা অনিশ্চিত মৃত্যুর পর্যায়ে অবস্থান করাই যুক্তিসঙ্গত। পশুরা বলিল, সিংহের সহিত চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যে বিরাট অশান্তি দেখা দিবে। খরগোশ বলিল, আমার অশান্তি তো এখনই শুরু হইয়া গিয়াছে। অশান্তিকে আমি ভয় করি না। মৃত্যু অপেক্ষা বড় কোন অশান্তি নাই। বড় জোর রাগান্বিত হইয়া আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। তোমরা তো আমাকে এরূপ করিতেই বলিতেছ। তাছাড়া অশান্তির সময় আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিব। এর পরও মারা গেলে তাহা অদৃষ্টের পরিহাস হইবে। তবুও ইহা তোমাদের প্রস্তাব হইতে অনেক সহজ। কারণ, ইহাতে আত্মহত্যার পাপ হইবে না।

বন্য পশুরা দেখিল, যুক্তিতর্কে খরগোশ কাবু হইবে না। এবার তাহারা সামাজিক চাপ প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিল। তাহারা বলিল, না, তোমাকে যাইতেই হইবে। স্বেচ্ছায় না গেলে জবরদস্তি তোমাকে সিংহের হাতে সোপর্দ করিয়া দিব। অবশেষে সামাজিক চাপে বাধ্য হইয়া খরগোশ পথ ধরিল। কিন্তু কি কৌশলে প্রাণ বাঁচানো যায় এবং সমাজের পশুরাও সন্তুষ্ট থাকে সারাটি পথ শুধু সে এই চিন্তায়ই মশগুল রহিল। পথিমধ্যে সে একটি কূপ দেখিতে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইল। সে মনে মনে স্থির করিল যে, এই কূপেই পশুরাজ সিংহকে ডুবাইয়া মারিতে হইবে। এর পর সে দ্রুতগতিতে সিংহের দরবারের দিকে পা বাড়াইল।

নির্ধারিত খাদ্য পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় এদিকে সিংহের অস্থিরতা দেখে কে। সে ভাবিতেছিল, মনে হয় বন্য পশুরা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। অদ্য যাইয়া তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। খরগোশকে দেখিয়াই সিংহ তর্জন গর্জন সহকারে গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল—কি হে, অপদার্থ! আজ এত দেরী হইল কেন? মনে হয়, তোরা চুক্তি ভঙ্গের ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়াছিস্।

খরগোশ বলিল, হুযূর! প্রথমে অধমের ঘটনাটি শ্রবণ করুন। এর পর তর্জন গর্জন করুন। অদ্য দেরী হওয়ার কারণ এই যে, আপনার রাজ্যে প্রবল পরাক্রমশালী একটি শত্রু অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সে আমার রাস্তা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলে, তোমরা অমুক সিংহের পরিবর্তে আমাকে ভোগ দাও। অদ্য আপনার খোরাকের জন্য একটি মোটা তাজা খরগোশ নির্বাচন করা হইয়াছিল। সে আমার সহিত এক সঙ্গে আসিতেছিল। আপনার শত্রু উহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমি কোন মতে প্রাণ লইয়া আপনাকে খবর দিতে আসিয়াছি। যদি আপন ভোগ নিরাপদ রাখিতে চান, তবে অদ্যই এই শত্রুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করুন। নতুবা জানিয়া রাখুন, আগামীকল্য হইতে আপনার ভোগ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। সে কিছুতেই এই পর্যন্ত পৌঁছিতে দিবে না।

প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতির কথা জানিয়া পশুরাজ সিংহ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল। সে খরগোশকে বলিল, আমার সাথে চল, আমি এখনই তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিব। আমা হইতে শক্তিশালী সিংহ কে? তাহার সহিত বুঝাপড়া না করিয়া ছাড়িব না। খরগোশ তাহাকে লইয়া কূপের ধারে পৌঁছিয়া বলিল, হুযূর! হতভাগা এই কূপের মধ্যেই লুকাইয়া আছে। দেখিবেন, তাহার নিকট আমা হইতে মোটা খরগোশটিও রহিয়াছে। সিংহ কূপের মধ্যে উঁকি দিতেই উহাতে তাহার প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টিগোচর হইল। খরগোশও তাহার সহিত উঁকি দিয়াছিল। ফলে একটি খরগোশও দেখা গেল।

পানির নীচে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া আসল বস্তু হইতে বড় দেখা যায়। ইহাই নিয়ম। ফলে সিংহের সহিত খরগোশের আকৃতিটিও বড় দেখা গেল। সিংহ রাগে গরগর করিতে করিতে আপন প্রতিচ্ছবিকেই আক্রমণ করিয়া বসিল। সে ধড়াস করিয়া নীচে পড়িয়া গেল, তথায় পানি ব্যতীত আর কি থাকিবে? খরগোশ উপর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, বাচাধন, ইহাই তোমার জেলখানা। ইহাতেই ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন দাও। আমি বাড়ী চলিলাম। 'সালাম লও' বলিয়া খরগোশ আনন্দচিত্তে আপন সমাজে পৌঁছিয়া গেল। অন্যান্য পশুরা বলিল, কি হে, তুই সিংহের নিকট যাস নাই? খরগোশ বলিল, গিয়াছিলাম বৈ কি, তোমরা আমাকে সিংহের শিকার বানাইতে চাহিয়াছিলে, এখন আমিই তাহাকে শিকার করিয়া চলিয়া আসিলাম। এই গল্প বর্ণনা করার পর মাওলানা রূমী বলেনঃ

حمله بر خود میکنی اے ساده مرد۔ هم چوں آں شیرےکه بر خود حمله کرد

'হে সরল প্রাণ ব্যক্তি! সিংহটি যেরূপ নিজেকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও নিজেকে আক্রমণ করিতেছ।'

**সঙ্কীর্ণতার স্বরূপঃ** বন্ধুগণ! আপত্তি উত্থাপনকারীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাহারা শরীঅত সম্বন্ধে যেসব আপত্তি করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সম্বন্ধেই করিতেছে। তবে তাহারা টের পাইতেছে না। এক্ষেত্রে আপনি হয়তো বলিবেন যে, ইহা তো একটি দাবী। ইহার প্রমাণ কি? আমরা শরীঅতের চাক্ষুষ সঙ্কীর্ণতা দেখিতেছি। যে কোন লেন-দেনের ব্যাপারে শরীঅতের নির্দেশের উপর আমল করিলে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

ইহার উত্তর এই যে, আমি লেন-দেনে অসুবিধা দেখা দেওয়াকে অস্বীকার করি না, তবে দেখিতে হইবে যে, এই অসুবিধার কারণ কি শরীঅত, না আপনার ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতি? মনে রাখিবেন, কোন আইনকে তখনই সঙ্কীর্ণ বলা যায়, যখন সকলেই উহার উপর আমল করিতে চায়; কিন্তু তাহা খুবই অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। কোন আইনের উপর এক হাজারের মধ্য হইতে দশজনে আমল করিতে চাহিলে এবং অবশিষ্ট সকলেই ইহার খেলাফ আমল করিলে উহাকে সঙ্কীর্ণ আইন আখ্যা দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বলা হইবে যে, তাহাদের তমদ্দুন তথা জীবন-ব্যবস্থাই সঙ্কীর্ণ।

এই নীতি উপলব্ধি করার পর চিন্তা করুন—শরীঅতের উপর আমল করিলে অসুবিধা দেখা দেয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ হইল, আপনি একা উহার উপর আমল করিতে চান। অবশিষ্ট ব্যবসায়িগণ ইহার উপর আমল করিতে চায় না। আপনি সুদের অঙ্ক দিতে চান না, কিন্তু প্রতিপক্ষ উহা লইতে চায়। আপনি সুদের অঙ্ক না দিলে সে মোকদ্দমা করিয়া উহা আদায় করিয়া লইবে।

উদাহরণতঃ, কোন সরকারী বিভাগে এক হাজার কর্মচারী রহিয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র দুই-চারিজন নামাযের সময় কাজ করিতে চায় না। অবশিষ্ট সকলেই নামায নষ্ট করিতে রাযী। এমতাবস্থায় ঐ দুই-চারিজন লোকের পক্ষে অবশ্যই অসুবিধা দেখা দিবে। সকলেই নামায নষ্ট না করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলে বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নামাযের জন্য আইন রচনা করিতে বাধ্য হইবেন। তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে যে, যে কাজ সকলের করা উচিত তাহা অধিকাংশ লোকে না করিয়া মাত্র দুই-চারিজনে করার কারণেই শরীঅতের উপর আমল করা

অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আপনিই বলুন, এই সঙ্কীর্ণতার জন্য শরীঅত দায়ী, না আপনার জীবনযাপন পদ্ধতি?

বন্ধুগণ! এইরূপে সহজ হইতে সহজতর কাজও কঠিন হইয়া যাইবে। মনে করুন, খাওয়া কত সহজ কাজ। কিন্তু আপনি যদি এমন কোন গ্রামে পৌঁছিয়া যান, যেখানে আটা বিক্রয় হয় না, খড়িও কিনিতে পাওয়া যায় না এবং ভাল ঘি ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় আপনি খাওয়া কঠিন বলিতে পারিবেন কি? কখনই নহে; বরং বলা হইবে যে, এই গ্রামের জীবনযাপন পদ্ধতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অথবা আপনি খাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু দশজন ডাকাত আপনার মাথার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আপনি লোকমা উঠাইতেই তাহারা ছিনাইয়া লইয়া যায়। এমতাবস্থায় খাওয়াকে কঠিন বলা যাইবে না; সামাজিকতা সঙ্কীর্ণ বলা হইবে। ডাকাতদলের নিকট হইতে দূরে যাইয়া দেখুন—খাওয়া কত সহজ কাজ।

আমি আরও বলি, আপনি এমন কোন জায়গায় বসবাস করুন, যেখানে সকলেই শরীঅতের উপর আমল করে। এর পর দেখুন, শরীঅতে কতটুকু সঙ্কীর্ণতা আছে?

মনে করুন—চিকিৎসক রোগীকে দুই পয়সা মূল্যের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিল। ঔষধটি সস্তা ও সাধারণ হওয়ার কারণে সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে রোগীটি এমন অঞ্চলের অধিবাসী—যেখানে মামুলী ঔষধও পাওয়া যায় না। তাছাড়া চিকিৎসক রোগীকে বেগুন, করলা, মসুর ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি জিনিস খাইতে নিষেধ করিল এবং পালং শাক, তরই, লাউ, মুগের ডাল, খাসীর গোশ্ত শালগমের আশ ইত্যাদি আট দশ প্রকার জিনিস খাইতে অনুমতি দিল। কিন্তু রোগীর অঞ্চলে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। হাঁ, বেগুন, মসুর ইত্যাদি নিষিদ্ধ পথ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় রোগী যদি বলে যে, এই চিকিৎসকের ব্যবস্থা খুবই সঙ্কীর্ণ কিংবা চিকিৎসা-শাস্ত্রই সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ, তবে তাহার কথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মানিয়া লইবে কি? কখনই নহে। সকলেই তাহাকে বলিবে, আরে বোকা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে মোটেই সঙ্কীর্ণতা নাই, উহা অত্যধিক প্রশস্ত। উহাতে মারাত্মক রোগের চিকিৎসা হাজার হাজার টাকার বিনিময়েও করা যায়, আবার দুই-চারি পয়সা দামের ঔষধ দ্বারাও করা যায়। আসলে তোমার গ্রামই সঙ্কীর্ণ। উহাতে সাধারণ জিনিস পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন।

ভাইসব, আপত্তি উত্থাপনকারীদের অবস্থাও তদ্রূপ। নিজেদের জীবন-পদ্ধতির সঙ্কীর্ণতা তাহাদের চোখে পড়ে না। অহেতুক শরীঅতের উপর সঙ্কীর্ণ ও দুরূহ হওয়ার দোষ চাপাইয়া দেয়। আমি কসম করিয়া বলিতেছি, শরীঅত অপেক্ষা সহজ আইন কোথাও পাওয়া যাইবে না। শরীঅতের আইনে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তবে যেক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলমান শরীঅতের উপর আমল করিতে অনিচ্ছুক; অধিকন্তু যাহারা আমল করে, তাহাদিগকেও বিরত রাখিতে সচেষ্ট, সেখানে এই সব ডাকাতদের কারণেই যতসব সঙ্কীর্ণতা অনুভূত হইবে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে শরীঅতের নির্দেশাবলী যারপরনাই সহজ। সকলে মিলিয়া উহার উপর আমল করিলে জীবনযাত্রা অত্যন্ত সুখী ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাহ হইবে। হক তা'আলা বলেনঃ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ কাহাকেও সামর্থ্যের বাহিরে কাজের ভার দেন না।' এমতাবস্থায় শরীঅতের নির্দেশাবলী মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে বলিয়া কিংবা উহা সামান্যও কঠিন বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? খোদার বাণী কিছুতেই অসত্য হইতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ পোষণেরও বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

www.almodina.com

এই বিষয়টি আমি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে পারি ; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত ওয়ায করিয়াছিলাম। উহার নাম রাখা হইয়াছে, "নাফিউল হরয।" বর্তমানে উহা শীঘ্রই মুদ্রিত হইতেছে। প্রকাশক বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই উহা প্রকাশ করা হইবে। ঐ ওয়াযে "ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই"—এই দাবীটির সকল দিকই উত্তমরূপে প্রমাণিত করা হইয়াছে। ঐ ওয়ায-মহফিলে অনেক নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উহা শুনিয়া সকলেই মাথা নোয়াইয়া দেয় এবং স্বীকার করে যে, দাবীটি যথার্থই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের বহু দিনকার পুঞ্জীভূত আপত্তিসমূহও দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ঐ ওয়াযের এক এক কপি থাকা উচিত। বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিত ভাইগণ এক কপি অবশ্যই রাখিবেন। কেননা, তাঁহাদের মনেই এই ধরনের আপত্তি বেশী মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ধর্মের ব্যাপারে মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকা খুবই মারাত্মক রোগ। খুব যত্ন সহকারে এই রোগের চিকিৎসা করা দরকার। খোদা চাহে তো ঐ ওয়াযে অনেক আপত্তি দূর হইয়া যাইবে।

মোটকথা, ধর্মকর্ম সর্বোত্তম কাম্য বস্তু। উহা লাভ করার উপায় নির্দিষ্ট। উহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই ; বরং অত্যন্ত সহজ ও সরল। এই উপায় অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধিও নিশ্চিত। এক্ষণে ইহারই গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করিতে চাই।

**প্রতিফলের ওয়াদাঃ** হক তা'আলা ধর্মকর্মে প্রতিফলের ওয়াদা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সাংসারিক কার্যাবলীতে প্রতিফলের ওয়াদা দেন নাই। সাংসারিক কাজকর্ম সম্বন্ধে বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ

"যে ব্যক্তি দুনিয়া উপার্জন করিতে চায়, আমি তাহাকে দুনিয়াতে যে পরিমাণ ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি দান করিব।" অর্থাৎ, পার্থিব ফলাফল লাভ হওয়া খোদার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এখানে ওয়াদা নাই যে, যাহা চাহিবে তাহাই দেওয়া হইবে এবং যে-ই চাহিবে তাহাকেই দেওয়া হইবে ; বরং খোদার ইচ্ছানুযায়ী, কতক লোকের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, কতক লোকের উদ্দেশ্য মোটেই পূর্ণ হয় না।

অপর পক্ষে আখেরাতের আমল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا

"যে ব্যক্তি আখেরাত লাভ করার ইচ্ছা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তবে হক তা'আলা তাহাদের চেষ্টাকে মর্যাদা দিবেন।" আয়াতে اَرَادَ অর্থাৎ, ইচ্ছার পর سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا অর্থাৎ, যথাযোগ্য চেষ্টার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইচ্ছা করার অর্থ শুধু মনে আকাঙ্ক্ষা করা নহে, বরং ইচ্ছা করার অর্থ হইল দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া। ইহা চেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। এর পর প্রতিফল স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, اُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا 'তাহাদের চেষ্টা খোদার নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত হইবে।' শাহী পরিভাষায় এই বাক্যটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কোন বাদশাহ্ স্বীয় খাদেমকে যদি বলে, আমি তোমার খেদমতের যথাযোগ্য সম্মান দান করিব, তবে খাদেমের মূল্যবান পুরস্কার লাভের আশা নিশ্চিত হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে যে, তাহাকে তাহার সেবা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী পুরস্কার দেওয়া হইবে। দুনিয়ার সামান্যতম বাদশাহ্র এই ধরণের উক্তি হইতে যদি এতকিছু পাওয়ার দৃঢ় আশা নিশ্চিত হয়, তবে বাদশাহ্দের বাদশাহ্

খোদার এবম্প্রকার বাণী হইতে কতকিছু আশা করা যায়! রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ফয়সালা করিতে পারিবেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি আখেরাতের ক্ষেতি কামনা করে, আমি তাহাকে আরও বাড়াইয়া দেই এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষেতি চায়, তাহাকে কিঞ্চিৎ দিয়া দেই।"

দুনিয়ার বেলায় نُؤْتِهٖ مِنْهَا অর্থাৎ, 'কিঞ্চিৎ দিয়া দেই' বলা হইয়াছে। এই ওয়াদা করা হয় নাই যে, সে যাহা চাহিবে তাহাই দেওয়া হইবে। অথচ আখেরাতের বেলায় বাড়াইয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে। এই ওয়াদাকে ইচ্ছার উপরও নির্ভরশীল করা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, আখেরাত লাভের ইচ্ছা করিলে উদ্দেশ্যই লাভ হইয়া যায়; বরং উদ্দেশ্য হইতেও বেশী পাওয়া যায়। সোবহানাল্লাহ্! এই বেশী শুধু আখেরাতেই দেওয়া হয় না; বরং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দুনিয়াতেও আমল অপেক্ষা অনেক বেশী পুরস্কার পাইয়া থাকেন। তাঁহারা দুনিয়াতে এমন সব বস্তু পান, যাহা পূর্বে তাঁহাদের কল্পনায়ও ছিল না। আখেরাতে যাহা লাভ হইবে, মুসলমানগণ সাধারণতঃ তাহা জানে। তাহারা জানে যে, আখেরাতে আমল অপেক্ষা অনেক বেশী পুরস্কার পাওয়া যাইবে। সকলেই এই হাদীস শুনিয়াছেঃ

اَعَدَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

"আমি আমার নেক বন্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই এবং কাহারও মনে উহার কল্পনাও জাগে নাই।" কিন্তু দুনিয়ার উন্নতি ও বৃদ্ধি সম্পর্কে অনেকেই জ্ঞাত নহে। অধিকাংশ মুসলমানের ধারণা, শুধু আখেরাতেই আমল অপেক্ষা বেশী পুরস্কার পাওয়া যাইবে, দুনিয়াতে আমলের পুরস্কার পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও অল্প, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হক তা'আলা ধর্মীয় আমলের পুরস্কার দুনিয়াতেও ধারণাতীত পরিমাণে দান করিয়া থাকেন এবং তাহাও এত বিরাট হয় যে, কাহারও মনে পূর্বে ইহার কল্পনাও জাগে না।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করিবেন যে, ঐ পুরস্কারগুলি কি? ইহার উত্তর এই যে, ধার্মিক হইয়া যান, নিজেই ঐ পুরস্কার লাভ করিতে পারিবেন। আমি ইহা বর্ণনা করিতে পারিব না, ইহার বর্ণনা সম্ভবও নহে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ ঐ সবের কল্পনাও করিতে পারে না; সুতরাং এরূপ বস্তুর বর্ণনা কিরূপে সম্ভব? সত্য বলিতে কি, দুনিয়াতেও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এমন নেয়ামত প্রাপ্ত হয়, যাহা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য বুযুর্গানের উক্তি হইতে উপরোক্ত নেয়ামতসমূহের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় এবং নিশ্চিত লক্ষণাদি দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ

لَوْ عَلِمَتِ الْمُلُوْكُ بِمَا عِنْدَنَا مِنَ النِّعَمِ لَجَادَلُوْنَ بِالسُّيُوْفِ

"আমাদের কাছে যে সব নেয়ামত রহিয়াছে দুনিয়ার বাদশাহ্গণ তাহা জানিতে পারিলে তলোয়ার লইয়া আমাদের উপর চড়াও করিত এবং তাহা ছিনাইয়া লইতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিত না।" ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের নিকট এমন নেয়ামতসমূহ রহিয়াছে যাহার মোকাবিলায় সমগ্র পৃথিবীর রাজত্বও মূল্যহীন। কেননা, বাদশাহ্রা তাঁহাদের উপস্থিত ধনদৌলত হইতে উত্তম

www.almodina.com

জিনিসই লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন। আর ঐ নেয়ামত রাজত্ব অপেক্ষা হেয় হইলে তাহা লাভ করিতে তাঁহারা চেষ্টিত হইবেন কেন?

সুতরাং নিশ্চিতরূপেই উহা এমন নেয়ামত হইবে, যাহার নামগন্ধও বাদশাহ্‌গণ পান নাই। ইহা শুধু বুযুর্গদের মুখের কথাই নহে; বরং যিনি এই নেয়ামত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি দুনিয়ার রাজত্বকে লাথি মারিয়াও দেখাইয়া দিয়াছেন। ইব্‌রাহীম আদহাম (রঃ)-এর ঘটনা কাহারও অজানা নহে। খোদা তা'আলা যখন তাঁহাকে খাছ নেয়ামত দান করিলেন, তখন তিনি বিরাট সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া ফকীরী অবলম্বন করেন; সুতরাং ইহা এইরূপ নেয়ামত যে, বুযুর্গগণ যাহার মোকাবিলায় সাম্রাজ্যকেও অত্যন্ত হেয় মনে করিয়া থাকেন। বাহ্যতঃ তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ যে, তাঁহাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিপাটী থাকে না এবং শারীরিক আকৃতিতেও কোনরূপ শ্রী থাকে না। কিন্তু আন্তরিক দিক দিয়া তাঁহারা এত ধনী যে, রাজা-বাদশাহ্‌দিগের প্রতিও তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন না; রাজা-বাদশাহ্‌রা স্বয়ং তাঁহাদের গোলামী করাকে গৌরব মনে করেন। এই নেয়ামতের বর্ণনা প্রসঙ্গে সাধক শীরাযী বলেনঃ

مبیں حقیـر گدایاں عشق را کیں قوم – شاهان بے کمر و خسروان بے کله اند

(মবী হাকীর গাদায়ানে এশ্‌ক্‌রা কিঁ কওম + শাহানে বে-কমর ও খসরুয়ানে বে-কুলাহান্দ)

অর্থাৎ, 'খোদার আশেকদিগকে ঘৃণিত মনে করিও না। তাঁহারা কমরবন্ধ ও মুকুট ব্যতীতই সম্রাট সম্প্রদায় বিশেষ।' সাধক শীরাযী এই নেয়ামতের কিঞ্চিৎ সন্ধানও দিয়াছেনঃ

بفـراغ دل زمـانے نظرے بمـاه روئے – به ازاں که چتر شاهی همه روزها و هوئے

(ব-ফরাগে দিল্ যমানে নয্‌রে ব-মাহ্ রোয়ে
বেহ্ আযাঁ কেহ্ চতরে শাহী হামা রোয হা ও হোয়ে)

প্রাণ খুলিয়া মা'শুকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা অশান্তিপূর্ণ শাহী জৌলুস হইতেও উত্তম।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হক তা'আলার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ এবং তাঁহার সহিত পূর্ণ সম্পর্কই হইল এই নেয়ামত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা লাভ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হইয়া যায়। কেন হইবে না, যে অন্তরে খোদা বিরাজমান উহাতে অন্য জিনিস কিরূপে স্থান পাইতে পারে।

عشق آں شعله است که چوں بر فروخت – هرچـه جز معـشـوق باقی جمله سوخت
مانـد الا الله باقـی جمـله رفـت – مرحـبـا اے عشـق شرکـت سوز رفـت

(এশ্‌ক আঁ শো'লাস্ত কেহ্ চূঁ বর ফরোখ্‌ত্ + হরচেহ্ জুয মা'শুক বাকী জুমলা সোখ্‌ত্
মানাদ ইল্লাল্লাহ্ বাকী জুমলা রফ্‌ত্ + মারহাবা আয় এশ্‌ক শিরকত সূয রফ্‌ত্)

"এশ্‌ক এমন একটি স্ফুলিঙ্গ যে, উহা জ্বলিয়া উঠিলে মা'শুক ব্যতীত সব কিছুকেই জ্বালাইয়া দেয়। একমাত্র আল্লাহ্‌র নাম বাকী থাকে, বাকী সমস্তই ফানা হইয়া যায়। মারহাবা! হে এশ্‌ক! তোমার বদৌলতে গায়রুল্লাহ্‌র মহব্বত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।"

**খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায়ঃ** ইহাকে এই নেয়ামতের মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত সন্ধান বলিতে হইবে। কারণ, ইহা দ্বারা খোদার সহিত পূর্ণ সম্পর্কের উপায় জানা যায় না। ফলে এই বিষয়ে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। অনেকে সর্বাবস্থায় খোদাকে স্মরণ রাখার ক্ষমতা

অর্জনকেই পূর্ণ সম্পর্ক মনে করে। আমারও কিছুদিন পর্যন্ত এইরূপ ধারণা ছিল। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ এখন হক তা'আলা আসল স্বরূপ খুলিয়া দিয়াছেন। খোদার সহিত সম্পর্কের অর্থ হইল, উভয় পক্ষ হইতে সম্পর্ক হওয়া। শুধু বন্দার তরফ হইতে সম্পর্ক হইল, কিন্তু খোদার তরফ হইতে রহিল পর্দা, এইরূপ সম্পর্ক কাম্য নহে। মোটকথা, লোকেরা শুধু খোদাকে স্মরণ রাখাকেই উদ্দিষ্ট সম্পর্ক মনে করে, অথচ ইহা মশ্‌ক (অনুশীলন) দ্বারাই অর্জিত হইতে পারে।

আপনি খোদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং খোদাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন, এইরূপ সম্পর্কই কাম্য। ইহা শুধু যিকর-আয্‌কারের মশ্‌কের দ্বারা অর্জন করা যায় না; বরং অধিক পরিমাণে যিকর করা, তৎসঙ্গে পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আনুগত্য প্রকাশ করাও শর্ত। পাপ কাজ হইতে আত্মরক্ষা না করিলে এবং আনুগত্য প্রকাশ না করিলে শুধু যিকর দ্বারা অভীষ্ট সম্পর্ক হাছিল হইবে না। অনেকেই যিকরের মশ্‌ক এবং সর্বদা খোদার ধ্যান লাভ হইতে দেখিয়াই নিজকে খোদার সহিত সম্পর্কযুক্ত মনে করিতে থাকে। ইহা ধোঁকা বৈ কিছুই নহে। গোনাহ্‌ করার পরও এই ধ্যান নষ্ট হয় না দেখিয়া, তাহারা আরও মনে করে যে, গোনাহ্‌ তাহাদের জন্য ক্ষতিকর নহে। অথচ ছূফীগণ বলিয়াছেন যে, গোনাহ্‌র ফলে বাতেনী সম্পর্ক দুর্বল হইয়া যায়। এর পর বার বার গোনাহ্‌ করিলে ঐ সম্পর্ক আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কিছু সংখ্যক লোক আরও মারাত্মক ধোঁকায় পড়িয়া আছে। তাহারা মনে করে, সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর এমন এক স্তর আসে, যাহাতে সাহেবে নিস্‌বত ব্যক্তি শরীঅতের আদেশ-নিষেধের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তখন কোন হারাম তাহার পক্ষে হারাম থাকে না। স্মরণ রাখুন, ইহা পরিষ্কার ধর্ম বিকৃতি। যতক্ষণ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সঠিক থাকে, ততক্ষণ কেহই শরীঅতের আদেশ-নিষেধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

সুতরাং উভয় পক্ষ হইতে সম্বন্ধ হওয়াকেই প্রকৃত সম্পর্ক বলে। শুধু একতরফা সম্পর্ক হইলে তাহা নিম্ন বর্ণিত গল্পের ন্যায় হইবে।

জনৈক ছাত্রকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলঃ আজকাল কি চিন্তায় দিন কাটাইতেছ? সে উত্তর দিলঃ শাহ্‌যাদীর সহিত বিবাহের চিন্তায় মশগুল আছি। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এর জন্য কি আয়োজন করিয়াছ? উত্তরঃ অর্ধেক আয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে—আর অর্ধেক বাকী আছে। সে পুনঃ প্রশ্ন করিল, তা কিরূপে? উত্তর হইল, আমি তো রাযী আছি, কিন্তু শাহ্‌যাদি এখনও রাযী নহে।

এই ব্যক্তি যেরূপ নিজের রাযী হওয়া দ্বারাই অর্ধেক আয়োজন সমাপ্ত করিয়া বসিয়াছিল, উপরোক্ত ব্যক্তিদের অবস্থাও তদ্রূপ। বিবাহে একতরফা সম্মতি যেমন কোন মূল্য রাখে না, তদ্রূপ তাহাদের একতরফা সম্পর্কও না হওয়ারই শামিল। পূর্ববর্ণিত খাঁটি সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই এমন তৃপ্তি লাভ হয়, যাহার সম্মুখে বিরাট সাম্রাজ্যও মূল্যহীন।

একদা সানজারের বাদশাহ্‌ গাওসে আ'যমকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমি হযরতের খান্‌কার যাবতীয় খরচাদির জন্য নিমরোয রাজ্যের এক অংশ দান করিতে ইচ্ছুক। হযরতকে উহা কবূল করিতে অনুরোধ করিতেছি। হযরত গাওসে আ'যম উত্তরে নিম্নোক্ত চৌপদী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেনঃ

چوں چتـر سنجـری رخ بختم سیاه باد ـ در دل اگـر بود هوس ملك سنـجـرم

زانـگـه كه یافتم خبـر از ملك نیم شب ـ من ملك نیـمـروز بیـك جو نمـی خرم

(চুঁ চতর সানজারী রুখ বখতম সিয়া বাদ + দর দিল আগর বুয়াদ হওস মুল্‌ক সান্‌জারম
যাঁগাহ্ কেহ্ ইয়াফতাম খবর আয মুল্‌কে নীম শব + মান মুল্‌কে নীমরোয ব-য়েক যও নমী খারাম)

'সানজার-শাহের রাজ্যের প্রতি যদি আমার লোভ হয়, তবে আমার ভাগ্যও যেন সানজার-শাহের পতাকার ন্যায় কাল হইয়া যায়। (তখনকার যুগে বাদশাহ্‌গণ কাল রঙ্গের পতাকা ব্যবহার করিতেন।) নীম্‌শব-রাজ্যের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে আমার অবস্থা এই যে, এখন সামান্য একটি যবের পরিবর্তেও নীমরোয রাজ্য ক্রয় করিতে রাযী নই।'

ملك نيم شب ও نيمروز -এর মধ্যে আশ্চর্যধরনের صنعت تقابل রহিয়াছে। বুযুর্গদের কালামে বাতেনী শান-শওকত ছাড়া বাহ্যিক সৌন্দর্যও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

জিজ্ঞাসা করি, এই বুযুর্গগণ কি কারণে রাজত্বের প্রতি এত বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন? মনে হয়, তাঁহারা দুনিয়াতেও এমন নেয়ামত প্রাপ্ত হন, দুনিয়াদারগণ যাহার কল্পনাও করিতে পারে না।

**বন্দেগী ও অভিমানের স্তরঃ** জনৈক দালাল (অভিমানী) পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন—যালাল (গোমরাহ) পর্যায়ের নহে। 'দালাল' মা'রেফতী পরিভাষায় একটি বিশেষ অবস্থাকে বলে। যাহারা মা'রেফতী লাইনে মধ্যপথের পথিক, তাহাদের মধ্যে এই অবস্থাটি প্রকাশ পায়। কামেলদের মধ্যে এই অবস্থা দেখা যায় না। তাহাদের মধ্যে বিনয় ও দাসত্ববোধই প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। হাঁ, যাহারা মধ্য পথের পথিক আনন্দের আতিশয্যে তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে এই অবস্থা দেখা দেয়। তখন তাহারা অভিমানবশতঃ এমন সব উক্তি করিয়া ফেলেন, যাহা অন্যে বলিলে মারদূদ (খোদার দরবার হইতে বহিষ্কৃত) হইয়া যাইবে। মাওলানা বলেনঃ

ناز را روئے ببایـد همچـو ورد ــ چوں نداری گرد بدخوئی مگرد
زشت باشـد روئے نازیبـا و نازــ عیب باشـد چشم نابینـا و باز
پیش یوسف نازش وخوبی مکن ــ جزنـیـاز و آه یعـقـوبی مکن

অর্থাৎ, অভিমান করার জন্যও (যোগ্য) মুখের দরকার। সকলের মুখই অভিমানের (যোগ্য) নহে। কেহ এই অবস্থা অর্জন করিতে পারিলে অভিমান করা তাহার পক্ষে শোভা পায়। এই অবস্থা অর্জিত না হইলে তাহার পক্ষে কান্নাকাটি ও অক্ষমতা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু শোভনীয় নহে। অভিমানীদের উক্তি খোদা কখনও কবূল করিয়া থাকেন, আবার কখনও তাহাদের কানও মলিয়া দেন।

এই বুযুর্গও দালাল পর্যায়ের ছিলেন। একদা দিবাভাগে তিনি এক শহরের পথে চলিতেছিলেন। শহরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি দারোয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরে ভাই, ব্যাপার কি, দিনের বেলায় শহরের দরজা বন্ধ কেন? তাহারা বলিল, বাদশাহ্‌র বাজপক্ষী উড়িয়া গিয়াছে। তাই তিনি শহরের দরজা বন্ধ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন—যাহাতে বাজ দরজার পথে বাহির হইয়া যাইতে না পারে।

ঘটনা শুনিয়া বুযুর্গ ব্যক্তি হাসি রোধ করিতে পারিলেন না, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, মনে হয় বাদশাহ্ একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন। দরজার সহিত বাজের কি সম্পর্ক? সে পালাইতে ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে আকাশ-পথে পালাইয়া যাইতে পারিবে। শহরের দরজা বন্ধ করিয়া বাজকে

কিরূপে রোধ করা যাইবে? অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিয়া হক তা'আলাকে বলিলেন, বেশ বোকাকে আপনি বাদশাহী দান করিয়াছেন! বাজ পক্ষী দরজা দিয়া যায়, না আকাশ-পথে উড়ে—সে ইহাও জানে না। পক্ষান্তরে আমি কত বুদ্ধিমান কিন্তু আজ আমার পায়ে জুতা নাই, পরনে ভাল পোশাক নাই। তৎক্ষণাৎ হক তা'আলার তরফ হইতে তাহার উপর তিরস্কারবাণী অবতীর্ণ হইল, "খুব ভাল কথা! আমি তোমাকেই বাদশাহী দান করিতেছি; কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার তত্ত্বজ্ঞান, বেলায়েত যাবতীয় গুণাবলী তোমার অভাব-অনটন সহ ঐ বাদশাহ্কে দান করিলে এবং তাহার বাদশাহী ও বোকামি ইত্যাদি তোমাকে দান করিলে তুমি তাহাতে রাযী আছ কি?"

এই তিরস্কার-বাণী শুনিয়া বুযুর্গের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি খোদার প্রতাপে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেজদায় পড়িয়া গেলেন এবং আরয করিলেন, আমি ভুল স্বীকার করিয়া তওবা করিতেছি। আর কখনও এরূপ ধৃষ্টতা করিব না। আমি যাহা লাভ করিয়াছি হাজার বাদশাহীর পরিবর্তেও তাহা দিতে রাযী নই।

কবি চমৎকার বলিয়াছেনঃ

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا ـ لَنَا عِلْمٌ وَّلِلْجُهَّالِ مَالٌ
فَاِنَّ الْمَالَ يَفْنِىْ عَنْ قَرِيْبٍ ـ وَاِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَايَزَالُ

"আমাদের ভাগে এল্ম ও মা'রেফত এবং মূর্খদের ভাগে ধনদৌলত পড়িয়াছে। আমরা প্রতাপশালী খোদার এই বন্টনে খুবই সন্তুষ্ট। কেননা, ধনদৌলত সত্বরই ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং এল্ম ও মা'রেফতের ধ্বংস নাই।"

নেক আমলের পুরস্কার দুনিয়াতে পাওয়া যায় না বলিয়া যাহাদের ধারণা, তাহারা এই গল্পটিতে চিন্তা করুক। এই বুযুর্গ ব্যক্তি দারিদ্র্যের তাড়না বরণ করিয়া বাদশাহীকে লাথি মারিয়া দিলেন কেন? ইহা বিনা কারণে নহে। তিনি নিশ্চয়ই কোন অমূল্য নেয়ামত পাইয়াছিলেন, যাহা ছিনাইয়া লওয়ার কথা শুনিতেই তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি বাদশাহীর পরিবর্তেও উহা দিতে রাযী হইলেন না। বন্ধুগণ! খোদার কসম, যাঁহারা এই দৌলতের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নেশার কোন অন্ত নাই। তাঁহারা বাদশাহীকে মশার ডানার সমানও মনে করেন না।

آں کس کہ تراشناخت جاں را چہ کند ـ فرزند و عیال و خانماں را چہ کند

(আঁকাস কেহ তুরা শনাখ্ত জাঁরা চেহ্ কুনাদ + ফরযন্দ ও এয়াল ও খানমাঁরা চেহ্ কুনাদ)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার আবার পরিবার-পরিজন বাড়ী-ঘর ও আপন প্রাণের কি চিন্তা?"

**প্রত্যেক কাজের উপায়ঃ** মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, ধর্মীয় কাজের ফলাফল দুনিয়াতেও আমল অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যায় এবং নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দুনিয়াতেও এমন এমন নেয়ামত লাভ হয়, যাহার মোকাবেলায় দুনিয়াদারদের নেয়ামত কোন মূল্য রাখে না। আর আখেরাতে নেক আমলের প্রতিদান লাভ সম্পর্কে তো কাহারও দ্বিমত নাই।

সুতরাং ধর্ম মকছুদ হওয়া স্থিরীকৃত। উহার উপায়ও অজানা নহে। আর ধর্মের উপায়ও অত্যন্ত সহজ এবং এই উপায়ে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি লাভও সুনিশ্চিত। ইহাতে দুনিয়া ও আখেরাতে

আশাতীত প্রতিদান পাওয়া যায়। তাছাড়া আখেরাতের প্রতিদান চিরস্থায়ী এবং দুনিয়ার প্রতিদান ধ্বংসশীল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ ধর্মের জন্য মোটেই তৎপর হয় না এবং উহার উপায়সমূহ অবলম্বন করে না। যাহারা সামান্য তৎপরতা দেখায়, তাহারাও শুধু আকাঙ্ক্ষা পর্যন্তই উহাকে সীমাবদ্ধ রাখে, কোন উপায় অবলম্বন করে না। অথচ দুনিয়ার ব্যাপারে উপায় অবলম্বন না করিয়া শুধু আকাঙ্ক্ষা করাকে সকলেই নির্বুদ্ধিতা ও পাগলামি মনে করে। জানি না, ধর্মের বেলায় কেন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। কিছুক্ষণ বুযুর্গদের সংসর্গে বসিয়া কিছু কাঁদাকাটি করিয়া লওয়া, আর ওয়ায শুনিয়া কিছু অশ্রু বিসর্জন করিয়া লওয়াকেই তাহারা তৎপরতা মনে করিয়া লইয়াছে। স্মরণ রাখুন, শুধু কাঁদাকাটি করিলে কিছুই হয় না। প্রত্যেক কার্যকে উহার নিয়মানুযায়ী করিতে হয়।

عرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال – صد سال می تواں بتمنا گریستن

(ওরফী আগর বগিরয়া মুয়াস্‌সার শোদে বেছাল + ছদ সাল মীতাওয়াঁ ব-তামান্না গুরিস্তান)

"হে ওরফী! যদি শুধু কান্নাকাটি দ্বারা খোদাকে পাওয়া সম্ভব হইত, তবে ইহার আশায় শত বৎসর কাঁদিতেও প্রস্তুত।"

তাহাদের আকাঙ্ক্ষার উদাহরণ এইরূপ মনে করুন যে, কেহ বুযুর্গদের নিকট যাইয়া বলে, হুযূর! দো'আ করুন যেন আমার একটি ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অথচ এই সাহেব বিবাহই করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহার ছেলে কিরূপে জন্মলাভ করিবে? তদ্রূপ ধর্মে কামেল হওয়ার জন্য বুযুর্গদের নিকট শুধু দো'আ চাওয়া এবং উহার উপায় অবলম্বন না করা অনর্থক কাজ নহে কি? মনে রাখুন, প্রত্যেক কাজ নিয়মানুযায়ী করিলেই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ○

"তোমরা দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ কর।" যদিও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে, তথাপি শব্দের ব্যাপকতার দিক দিয়া ইহার প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক। ধর্ম একটি ঘর। আর উহার দরজা হইল ঐ সমস্ত উপায় যাহা শরীঅত বর্ণনা করিয়াছে। এই সব দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেই ধর্মরূপ ঘরে প্রবেশ করা হইবে। মাওলানা রূমী নিম্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اُطْلُبُوا الْاَرْزَاقَ مِنْ اَسْبَابِهَا – وَادْخُلُوا الْاَبْيَاتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

এই কবিতার প্রথম লাইন দ্বিতীয় লাইনের নযীর। অর্থাৎ, তোমরা যেরূপ রিযিক লাভের জন্য উহার নির্ধারিত উপায় অবলম্বন কর, তদ্রূপ ধর্মের বেলায়ও উহার উপায় অবলম্বন কর। আপনি ধর্মের কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। খোদা চাহে তো দরজা আপনাআপনি খুলিয়া যাইবে। অতঃপর দ্বীনের প্রতিফলও আপনার হাছিল হইবে। ইহার এক ফল এই যে, ইহাতে খোদার সহিত আপনার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাইবে, জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে। বাকী খোদা-প্রেমিকগণ অন্যান্য যে সব দৌলত লাভ করিয়া থাকেন, আমি উহাদের স্বরূপ আপনাকে বলিতে পারিব না। কারণ, ঐগুলি রুচিগত জিনিস। রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই উহা বুঝিতে পারেন। ধর্মের কাজে লাগিয়া গেলে খোদা চাহে তো আপনিও এরূপ রুচি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এছাড়া যতই বুঝানো হউক, বুঝিতে পারিবেন না।

পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে হাজার বুঝাইলেও নারীর মিলন-সুখ অনুভব করিতে পারিবে না। হাঁ, যদি খোদার ফযল হয় এবং সে রোগমুক্ত হয়, তবে আপনাআপনি এই সুখ বুঝিয়া ফেলিবে, তখন কাহারও বুঝাইবার প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং প্রথমে আপনি অনুভূতিহীনতার প্রতিকার করুন।

**দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্যঃ** প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে, তবে চিকিৎসা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী আমল করা শর্ত। দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে আরও একটি পার্থক্য বুঝা যায়। তাহা এই যে, চেষ্টা তদবীর ছাড়াই দুনিয়ার উদ্দেশ্যাবলী লাভ হওয়া সম্পর্কে খোদার তরফ হইতে ওয়াদা আছে। হক তা'আলা এরশাদ করেনঃ

وَمَامِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

"প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকই খোদার জিম্মায়।" ইহা চেষ্টা-তদবীর ছাড়াও লাভ হইতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ইহা লাভ করার চেষ্টাকে জরুরী মনে করে। পক্ষান্তরে আখেরাতের ফলাফল চেষ্টা-তদবীর ছাড়া লাভ হইবে বলিয়া কোন ওয়াদা নাই। হক তা'আলা পরিষ্কার বলেনঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا অর্থাৎ, "প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার আমলের প্রতিফল পাইবে। যেমন কর্ম করিবে তেমন ফল পাইবে।" আশ্চর্যের বিষয়! মানুষ তা সত্ত্বেও ধর্মের কাজে চেষ্টা করা জরুরী মনে করে না। এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খোদা-প্রেমিকগণ পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী লাভ করার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেনঃ জীবিকার দায়িত্ব হক তা'আলা গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার জন্য চেষ্টা তদ্‌বীর প্রয়োজন নাই। ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা-তদবীর করিতেই হইবে।

একদা জনৈক বুযুর্গ একজন ইমামের পিছনে নামায পড়িলেন। নামায শেষে ইমাম সাহেব বুযুর্গের সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'আপনি কোথায় খাওয়া দাওয়া করেন? আপনাকে জীবিকার জন্য কোন কাজকর্ম করিতে দেখি না।' বুযুর্গ বলিলেনঃ 'একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।' এই বলিয়া তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া ফেলিলেন। সালাম ফিরাইয়া বলিলেন, এবার বলুন, আপনার কি প্রশ্ন? ইমাম সাহেব বলিলেনঃ 'এখন আমার প্রশ্ন আরও একটি বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা এই যে, আপনি দ্বিতীয়বার নামায পড়িলেন কেন? কিছুক্ষণ পূর্বেই তো নামায পড়িয়াছিলেন।' বুযুর্গ বলিলেনঃ 'আমি পূর্বের নামাযই দোহ্‌রাইয়া পড়িয়াছি। কেননা, আপনার প্রশ্ন শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল যে, বোধ হয় খোদার উক্তি وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا 'প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকই খোদার যিম্মায়'-এর প্রতি আপনার বিশ্বাস নাই। ফলে আপনার ইমামতির ব্যাপারেই আমি সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই আমি তাড়াতাড়ি নামায দোহ্‌রাইয়াছি। ইতিমধ্যে মৃত্যু আসিয়া পড়িলে নামাযটি আমার জিম্মায়ই থাকিয়া যাইত। (ইহা হালের প্রাধান্য বৈ কিছুই নহে)

অতঃপর বলিলেন, আরে ভাই, উপার্জনের উপরই কি রুযী নির্ভর করে? অথচ খোদা তা'আলা বলিয়াছেন, রুযী আমার যিম্মায়। এরপরও আপনার মনে এই প্রশ্ন উদয় হইল কেন? তবে খোদার এই উক্তির উপর আপনার আস্থা নাই? ইহাতে ইমাম সাহেব খুবই লজ্জিত হইলেন।

অন্য একজন বুযুর্গ বলেনঃ দুনিয়া খোদার ঘর। আমরা এখানে মেহ্‌মান। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ "তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা উচিত।" সুতরাং আমরাও

দুনিয়াতে আসিয়া তিন দিন পর্যন্ত খোদার মেহ্‌মান থাকিব। খোদার নিকট এক হাজার বৎসরে এক দিন হয়। যেমন, আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

"আপনার প্রভুর নিকট একদিন তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বৎসরের সমান।" অতএব, আমরা তিন হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিকা উপার্জন হইতে একেবারে নিশ্চিন্ত। বয়স তিন হাজার বৎসর হইতে বেশী হইলে তখন চিন্তা করা যাইবে।

বাহ্যতঃ ইহা একটি রসাত্মক উক্তি মনে হয়। কিন্তু ইহা হইতে খোদাপ্রেমিকদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা দুনিয়ার কাজে চেষ্টা-তদবীর করা জরুরী মনে করেন না। কারণ, রুযীর দায়িত্ব খোদা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আখেরাতের আমলসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। আখেরাতের জন্য চেষ্টা-তদবীর না করিলেও তিনি জান্নাত দান করিবেন কিংবা তোমাদের দ্বারা আপনাআপনিই জান্নাতের কাজ করাইয়া লইবেন—এরূপ নহে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا

"কেহ নেক কাজ করিলে তাহা তাহারই উপকারে আসিবে এবং কেহ অসৎকাজ করিলে উহার কুফলও তাহার উপর বর্তিবে।" আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ

اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ

"তোমরা পছন্দ না করিলেও কি আমি তোমাদের ঘাড়ে জান্নাত জোরপূর্বক চাপাইয়া দিব।"

অপর পক্ষে রিযিক সম্বন্ধে হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

وَمَنْ كَانَ لَهٗ رِزْقٌ فِىْ رَأْسِ جَبَلٍ اَوْ حَضِيْضٍ يَّاْتِ بِهِ اللّٰهُ

"কাহারও রিযিক পাহাড়ের চূড়ায় কিংবা গভীর গর্তে নিহিত থাকিলেও আল্লাহ্ উহা পৌঁছাইয়া দেন।"

আশ্চর্যের বিষয়, এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা আখেরাতের আমল সম্বন্ধে মোটেই চিন্তা করি না, উল্টা দুনিয়ার জন্য চিন্তায় মশ্‌গুল থাকি। অথচ উপরোক্ত পার্থক্যবশতঃ দুনিয়া বিন্দুমাত্রও মনোনিবেশের যোগ্য নহে; বরং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করা না-জায়েয করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খোদা অনুগ্রহবশতঃ দুনিয়ার জন্য উপায় অবলম্বন করার অনুমতি দান করিয়াছেন।

**জীবিকার জন্য উপায় অবলম্বন করাঃ** শুধু অনুমতি নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দুনিয়ার জন্য চেষ্টা-তদবীর করা ফরযও করিয়াছেন। হাদীসে বলা হইয়াছেঃ طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ ۢ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ 'শরীঅতের মৌলিক ফরযসমূহের পর হালাল রুযী অন্বেষণ করাও একটি ফরয।' আমাদের সূক্ষ্মদর্শী বুযুর্গগণ রুযীর উপায় সম্বন্ধে এমনও বলিয়াছেন যে, কেহ হারাম চাকুরীতে লিপ্ত থাকিলে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সে সাহসের সহিত অভাব-অনটনের মোকাবিলা করিতে পারিবে না, তবে তৎক্ষণাৎ হারাম চাকুরী ত্যাগ করা তাহার জন্য জরুরী নহে। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের নির্দেশ এই যে, প্রথমে হালাল চাকুরী খুঁজিয়া বাহির কর। তারপর হারাম চাকুরী

www.almodina.com

ত্যাগ কর। হালাল চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত হারাম চাকুরীই করিতে থাক এবং নিজকে গোনাহ্‌গার মনে করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক।

কারণ, কেহ কেহ অভাব-অনটনে অতিষ্ঠ হইয়া খৃষ্টান, আর্য কিংবা কাদিয়ানী হইয়া যায়। মিথ্যা ধর্মাবলম্বীরা স্বদলে ভিড়াইবার জন্য মানুষকে অনেক প্রলোভন দেখায়। এমতাবস্থায় অভাব-অনটন সহ স্বধর্মে কায়েম থাকা সাহসী লোকদের কাজ। কেহ কেহ আবার অভাব-অনটনে পড়িয়া পীরী-মুরীদীর ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং মানুষকে ধোঁকা দিতে থাকেঃ او خویشتن گمراه است کرا رهبری کند "সে নিজেই গোমরাহ অন্যের হেদায়ত কিরূপে করিবে ?"

আমি কিছুসংখ্যক লোককে পীর সাজিয়া ঘুরাফেরা করিতে দেখিয়াছি। তাহারা নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে নামাযও পড়ে না, অথচ বাহিরে যাইয়া ছুফী সাজিয়া যায়। এ সম্বন্ধে একটি মারাত্মক ঘটনা শুনা গিয়াছে যাহার কোন নযীর নাই।

আমার জনৈক মৌলবী বন্ধু বর্ণনা করেনঃ এলাহাবাদের জনৈক মূর্খ ব্যক্তি বর্ধমান জিলায় পীরী-মুরীদী করিত। সে ছিল পরভোজী ফকীর। বর্ধমানের জনৈক ধনী ব্যক্তি তাহার ফাঁদে পড়িয়া যায়। ধনী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ দুনিয়া সম্বন্ধেই জ্ঞান রাখে, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না। ফলে মূর্খ দরবেশ এবং ভণ্ড পীর ডাকাতদের ফাঁদে তাহারাই অধিকাংশ পড়িয়া থাকে। আমাদের শ্রদ্ধেয় হাজী সাহেব বলিতেন, যে দরবেশের চারিদিকে অধিকাংশ দুনিয়াদারদের ভিড় জমে, সে দরবেশ নহে; বরং সে-ও দুনিয়াদার। কেননা, কথায় বলে, الجنس يميل الى الجنس "প্রত্যেক জাতি স্বজাতির প্রতিই আকৃষ্ট হয়।" তাহার মধ্যে পূর্ণ দ্বীনদারী থাকিলে দ্বীনদার ব্যক্তিরাই তাহার দিকে অধিক আকৃষ্ট হইত।

একটি হাদীসেও এই বিষয়টি উল্লিখিত রহিয়াছে। রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেনঃ আরবের নবীর অনুসারীদের মধ্যে কোন্ দলের লোক বেশী, ধনী—না দরিদ্র? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেনঃ 'দরিদ্র ব্যক্তিরাই অধিকতর তাঁহার অনুসরণ করে।' হিরাক্লিয়াস ইহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, সত্যই দরিদ্ররাই পয়গম্বরদের অনুসরণ করে। (ছাহাবাগণ হিরাক্লিয়াসের এই মন্তব্য খণ্ডন করেন নাই; বরং তাঁহারা চুপ ছিলেন। কাজেই ইহা দলীলে পরিণত হইয়া গিয়াছে।) খোদার শোকর, আমাদের বুযুর্গদের সিল্‌সিলায় দরিদ্র ও ছাত্রদের সমাবেশই বেশী। ধনী ও আমীরদের সংখ্যা খুব কম। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও খাঁটি দ্বীনদার।

মোটকথা, একবার ঐ বাঙ্গালী বিত্তশালী ব্যক্তি কার্যোপলক্ষে এলাহাবাদ আসিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি মুর্শিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিলেন, জনৈক চৌধুরী চৌকিতে বসিয়া আছেন। খুব তা'যীমসহ পীরের নাম লইয়া তাহার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে চৌধুরী উত্তরে বলিলেন, সে তো তাকিয়াদার (পরভোজী) ফকীর। আপনি তাহার খপ্পরে পড়িলেন কিরূপে? বাঙ্গালী সাহেব বলিলেন, আপনি যাহাই বলুন তিনি আমার মালিক ও মুর্শিদ। চৌধুরী বুঝিলেন, লোকটি কাণ্ডজ্ঞানহীন বটে। তিনি একটি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, অমুক তাকিয়াদারকে এখানে ধরিয়া আন। বাঙ্গালী বলিলেন, হুযূরের সহিত এমন ধৃষ্টতা আমার পক্ষে শোভা পায় না। আমি স্বয়ং তাঁহার খেদমতে হাযির হইব। আপনি মেহেরবানীপূর্বক রাস্তা দেখাইবার জন্য চাকরকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দিন। অগত্যা চৌধুরী সাহেব চাকরকে তাহার সঙ্গে দিয়া দিলেন। ঐ ব্যক্তি এক কুড়ে ঘরে বাস করিত। বাঙ্গালী সাহেব তথায় পৌঁছিয়া

খুব তা'যীম সহকারে সালাম করিলেন ও ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুড়ে ঘরে তাহার সহিত আরও কতিপয় গুণ্ডা বদমায়েশ থাকিত। সর্বদা গাঁজা-ভাঙ্গ ইত্যাদি পান করিত। এতসব দেখিয়া-শুনিয়াও ধনী ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট হইল না। আসলে পীরী-মুরীদী ব্যবসাটিই এমন যে, একবার কাহারও সাধুতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মিয়া গেলে তমীযা বিবির ওযূর ন্যায় তাহা কখনও নষ্ট হয় না।

তমীযা ছিল এক কুল্টা নারী। সে নামাযও পড়িত না। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি তাহাকে নামায পড়িতে তাকীদ করিয়া ওযূ করাইয়া দিলেন। নামাযের অন্যান্য নিয়ম-কানূনও শিখাইয়া দিলেন। এক বৎসর পর বুযুর্গ ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়া তমীযা বিবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায রীতিমত পড়িতেছ কিনা? তমীযা বলিল, হুযূর, দৈনিকই পড়িতেছি। বুযুর্গ ব্যক্তি আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, ওযূও কর কি? উত্তর দিল, হুযূর! যে ওযূ করাইয়াছিলেন, আজ পর্যন্ত তাহার দ্বারাই নামায পড়িতেছি।

তমীযার ওযূ পেশাব, পায়খানা, যিনা ইত্যাদি কোন কিছুতেই ভঙ্গ হইত না, (ওযূ নয় যেন লোহা আর কি!) তেমনি আজকালকার পীরী-মুরীদী একবার চালু হইয়া গেলে তাহা শরাব, যিনা, নামায-রোযা ত্যাগ, দাড়ি মুণ্ডানো, উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করা ইত্যাদি কোন কারণেই আর অচল হয় না। এমন কি কোন পীর যদি লেংটিও না পরে, তবে তাহার ভক্তের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। কোন পীর সর্বদা চুপ হইয়া থাকিলে তাহার নাম হয় 'চুপশাহ' বরং 'ফানাফিল্লাহ্'। আবলতাবল বকিলে তাহা কুফরী বাক্য হইলেও উহাকে নিগূঢ় তত্ত্ব মনে করা হয়। আর ঘটনাক্রমে কেহ দুই একটি শুদ্ধ কথা বলিয়া ফেলিলে তাহাকে 'মোহাক্কিক' ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

শরীঅত ও তরীকত দুইটি পৃথক জিনিস বলিয়া মানুষের যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে, উহাই এই সমস্ত ভ্রান্তির মূল কারণ। ফলে কোন পীর শরীঅতবিরোধী কাজ করিলেও মুরীদদের তাহাতে বিশ্বাস নষ্ট হয় না। তাহারা মনে করে, বোধ হয় ইহা তরীকতের কোন গূঢ়তত্ত্ব। আস্তাগ-ফিরুল্লাহ্........... আল্লাহ্ ক্ষমা করুন।

মোটকথা, উপরোক্ত ফকীর কয়েক দিন পর্যন্ত ধনী ব্যক্তিকে খুব আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইল। দুই চারি দিন পর ধনী ব্যক্তি বিদায়ের অনুমতি চাহিলে সে অনুমতি দিয়া বলিল, আমি নিজে আপনাকে ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিব। এই বলিয়া সে ও তাহার ভাই ধনী ব্যক্তিকে লইয়া ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইল। তাহারা একটি নির্জন রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চলার পরও ষ্টেশন না পাওয়ায় ধনী ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি বলিলেন, হুযূর, আমি যে পথে আসিয়াছিলাম ইহা তো সেই পথ নয়। ফকীর উত্তর দিল, আচ্ছা, আমি আপনাকে বাহিরে বাহিরে নিকটতম পথ দিয়াই লইয়া চলিতেছি। ইহাতে বেচারা চুপ হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা একটি জনপ্রাণীহীন জঙ্গলে পৌঁছিয়া গেল। সেখানে গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও কেহ সাহায্যার্থে আসিতে পারিবে না।

তথায় পৌঁছিয়া ফকীর বলিল, সঙ্গে যাহাকিছু আছে, এখানে রাখিয়া দাও। ইহাতে বেচারা অপারগ অবস্থায় যথাসর্বস্ব তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। তাহারা তাহাকে পোশাক-পরিচ্ছদও খুলিয়া ফেলিতে বলিল। সে তাহাও করিল। এর পর তাহারা তাহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। সে করজোড়ে কাকুতি মিনতি সহকারে বলিল, আপনারা আমাকে হত্যা করিবেন না, আমি বাড়ী

পৌঁছিয়া আরও দ্বিগুণ টাকা আপনাদের নামে পাঠাইয়া দিব। তাহারা বলিল, এখন তোমাকে জীবিত ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অবিবেচকের কাজ হইবে। তুমি সমস্ত ভেদ খুলিয়া দিবে। ধনী ব্যক্তি অনেক কসম করিয়া বলিল, আমি কাহাকেও এই কথা জানাইব না। কিন্তু নিষ্ঠুর-প্রাণ ফকীর তাহার কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া একটি কূপে লাশ ফেলিয়া চলিয়া গেল।

ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর জনৈক রাখাল ঐ কূপের ধারে পৌঁছিলে সে দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া কূপের ভিতর দৃষ্টিপাত করিতেই একটি ভাসমান লাশ দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ থানায় সংবাদ দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া লাশ উদ্ধার করিল। তখন তাহাকে চিনিবার মত তথায় কেহ ছিল না। অবশ্য তাহার পকেট হইতে কিছু কাগজপত্র বাহির হইল। উহাতে বর্ধমানের ঠিকানা লেখা ছিল। আর কি চাই, প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য পুলিশের পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট। অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত অবস্থা খুলিয়া গেল। পুলিশ ফকীরকে গ্রেফতার করিয়া তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিল। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করিল যে, আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি। অবশেষে বিচারে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

জীবিকার অভাবে অপারগ হইয়া মানুষ অন্যান্য উপায়েও 'হুকুকুল এবাদ' (বন্দার হক) নষ্ট করিতে দ্বিধাবোধ করে না। কাহারও কাছ হইতে ধার করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, কাহারও আমানত গ্রহণ করিয়া পরে অস্বীকার করিয়া বসে, আবার কাহারও নিকট হইতে কিছু লইয়া তাহা বন্ধক রাখিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কুকাণ্ড মানুষ করিয়া থাকে। ইহা স্পষ্ট কথা যে, হক্কুল-এবাদ নষ্ট করার অনিষ্টতা সংক্রামক হইয়া থাকে, যাহা ব্যক্তিগত অনিষ্ট হইতে অনেক মারাত্মক। কোন ব্যক্তি হারাম চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিলে যদি ঐ চাকুরীর করণীয় বিষয়ে অন্যের ক্ষতিসাধন করা হয়, তবে সে ব্যক্তিগতভাবে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সে অন্যান্য লোকদিগকে পেরেশান করিবে না। কিন্তু এই ব্যক্তি হালাল রুযী তালাশ না করিয়াই যদি হারাম চাকুরীটিও ছাড়িয়া দেয়, তবে অন্যের ক্ষতিসাধন করা ব্যতীত তাহার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় থাকিবে না। এই কারণে বিচক্ষণ বুযুর্গগণ জীবিকা অর্জনের উপায়কে এত গুরুত্ব দেন যে, জীবিকার্জনের হারাম উপায়কেও কৌশলে ত্যাগ করাইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় জীবিকার্জনের হালাল উপায় হইতে তাঁহারা কি করিয়া বিরত রাখিতে পারেন?

কোন কোন অবিবেচক লোক এই বুযুর্গদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলে যে, তাঁহারা হারাম চাকুরী করিতে অনুমতি দেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা হারাম চাকুরীর অনুমতি দেন না; বরং তাঁহারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমান বাঁচাইতে চান। হারাম চাকুরী করিলে সে গোনাহ্‌গার হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু চাকুরী ত্যাগ করিলে ঈমান হইতে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া এখন সে নিজেরই ক্ষতি করিতেছে, চাকুরী ত্যাগ করিলে হয়তো অন্যান্যকেও বিপদে ফেলিয়া দিবে। ফেকাহ্‌র নীতি অনুযায়ী বড় অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছোট অনিষ্টকে সহ্য করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, এই নীতিকে কাজে লাগানোর অধিকার প্রত্যেকের নাই। একমাত্র বিচক্ষণ আলেম ব্যক্তিই ইহার যথার্থ প্রয়োগস্থল বুঝিতে পারেন।

**নফ্‌সের বাহানাঃ** আমি বলিতেছিলাম যে, ধর্মীয় উপায়সমূহের মোকাবিলায় সাংসারিক উপায়াদি চেষ্টা-তদবীরের যোগ্য নহে। দুনিয়ার জন্য এত চেষ্টা-তদবীর করা, যাহাতে আখেরাতের চেষ্টা বাদ পড়িয়া যায়, তাহা আরও জঘন্য ব্যাপার। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ মুসলমান দুনিয়ার

জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা-তদবীর করা জরুরী মনে করে; কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে কোন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় মনে করে না। তবে যাহারা ধর্মকেই প্রয়োজনীয় মনে করে না তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। যাহারা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও উহার জন্য উপায় অবলম্বন করে না—আমার অভিযোগ তাহাদের সম্বন্ধেই। তাহারা বুযুর্গদের দরবারে যাতায়াত করে, কিন্তু ধর্ম অর্জনের উপায় জিজ্ঞাসা করে না। এক তাওয়াজ্জুতেই কামেল বানাইয়া দেওয়ার জন্য বুযুর্গদিগকে অনুরোধ করাই তাহাদের বড় জোর চেষ্টা। তাহাদের ধারণা, বুযুর্গগণও এইভাবেই বুযুর্গ হইয়াছেন। আমি বলি, এখানেই ফয়সালা হইবে। বুযুর্গদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শুধু তাওয়াজ্জুহের বরকতেই কামেল হইয়াছেন, না কিছু কাজও করিতে হইয়াছে? যদি তাহারা শুধু তাওয়াজ্জুহের বরকতেই কৃতকার্য হইয়া না থাকেন, তবে তাহাদের কাছে এরূপ দরখাস্ত করার অধিকার আপনি কোথায় পাইলেন?

বন্ধুগণ, এসব নফ্‌সের বাহানা বৈ কিছুই নহে; নফ্‌স আপনাকে ধোঁকায় ফেলিয়া গোমরাহ্ করিতে চায়। সাহসের অভাব এবং ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীনতা হইতে ইহার উৎপত্তি। ফলে আমরা দুনিয়ার কাজের যতটুকু চেষ্টা করিয়া থাকি ধর্মীয় কাজের জন্য ততটুকু চেষ্টা করি না।

**আল্লাহ্‌র সহিত বাক্যালাপঃ** কেহ কেহ রৌদ্রের কারণে জমাআতের নামায ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু সেই সময় যদি তাহাদিগকে কোন উপরিস্থ সরকারী কর্মচারী ডাকিয়া পাঠায়, তবে রৌদ্রের পরওয়া না করিয়া ঠিক দুপুর বেলায় তথায় পৌঁছিয়া যাইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রৌদ্রের অভিযোগ করা দূরের কথা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ ঘটার গর্বে বুক ফুলিয়া যায়। সাহেবের সহিত দীর্ঘ আলাপ হইয়াছে, অমুক মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই এই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া গর্ব করা হয়। অথচ ইহা মোটেই গর্বের বিষয় নহে। সরকারী কর্মচারীরা তোমাদের মতই মানুষ নহে কি? অথচ ইহাই ছিল গর্বের কথা যে, নামাযে পরম প্রভু আল্লাহ্‌র সহিত কথাবার্তা হয়। আমরা এরূপ যোগ্য নহি যে, হক তা'আলা আমাদের সহিত কথা বলিবেন। এমন কি আমরা তাঁহার পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করারও যোগ্যতা রাখি না।

هزار بار بشـویم دهن بمشـك وگلاب ــ هنوز نام تو گفتن كمال بے ادبی است

"মেশ্‌ক ও গোলাপ দ্বারা হাজার বার মুখ ধৌত করিলেও তোমার নাম মুখে উচ্চারণ করা চরম ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নহে।" কিন্তু হক তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহবশতঃ আমাদিগকে নামাযে তাঁহার সহিত যে কোন সময় কথা বলার অনুমতি দান করিয়াছেন। তিনি আমাদের কথার প্রতি মনোযোগও দেন। আমাদের আবেদন-নিবেদনের উত্তর দেন। এছাড়া তিনি নামাযে কোরআন শরীফ পাঠ করার অনুমতি দিয়াছেন; বরং ইহা ফরয করিয়াছেন। কোরআন খোদারই কালাম। এইভাবে তিনিও যেন আমাদের সহিত কথাবার্তা বলেন। আরও অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাদিগকে তাঁহার আসল নাম ধরিয়া ডাকিতে অর্থাৎ, 'ইয়া আল্লাহ্' বলিয়া ডাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। দুনিয়ার কোন শাসনকর্তাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া দেখুন, তৎক্ষণাৎ সর্বপ্রধান অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহার নামও এত সহজ যে, শিশু সর্বপ্রথম 'আল্লাহ্' নাম শিখিয়া লয়। পরিতাপের বিষয়, এমনি দয়ার আধার ও মহান খোদার সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য মানুষ রৌদ্রের বাধা ডিঙ্গাইতে পারে না। আর অহেতুক জমাআতের নামায ছাড়িয়া দেয়।

www.almodina.com

**এবাদত কবূল হওয়ার লক্ষণঃ** খোদার আরও একটি বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাদের অসম্পূর্ণ এবাদতও কবূল করিয়া লন। যদি বলেন, আমাদের অসম্পূর্ণ এবাদত যে কবূল হয় তাহা কিরূপে বুঝা গেল? তবে শুনুন, হযরত হাজী সাহেব (রঃ) ইহার একটি লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, আপনি যদি কাহারও আগমনে বিরক্তি বোধ করেন, তবে সামর্থ্য থাকিলে তাহাকে দ্বিতীয়বার আপনার নিকট আগমন করিতে দেন না, ইহাই নিয়ম। সেমতে আপনার প্রথম এবাদত খোদার নিকট অপছন্দনীয় হইয়া থাকিলে তিনি পরবর্তী সময় আপনাকে মসজিদেই প্রবেশ করিতে দিতেন না—নামাযেরও তওফীক দিতেন না। অথচ একবার নামায পড়ার পর পরবর্তী সময়ও আপনার নামায পড়ার তওফীক হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, আপনার পূর্বের নামায কবূল হইয়াছে। অন্যান্য এবাদতের বেলায়ও এইরূপ বুঝিয়া নিন।

সত্যই তিনি কত সুন্দর কথা বলিয়াছেন, ইহা যদিও অকাট্য দলীল নহে, তথাপি হক তা'আলার প্রতি এইরূপ ধারণা পোষণ করিতে থাকিলে কবূল হওয়ার নিশ্চিত আশা করা যায়। কারণ, হাদীসে কুদ্‌সীতে বলা হইয়াছেঃ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ "বান্দা আমার নিকট যেরূপ আশা পোষণ করে, আমি তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি।" হক তা'আলা আপনাকে দৈনিক পাঁচ বার মসজিদে আসার তওফীক দিয়াছেন। অথচ তাঁহার অন্যান্য আরও বহু বান্দা আছে, তাহাদের বৎসরে একবারও মসজিদে আসার তওফীক হয় না। ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, হক তা'আলা তাহাদের মসজিদে আসা পছন্দ করেন না।

জনৈক গণ্ড মূর্খ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা তাহার একটি বাছুর মসজিদে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে মোল্লাজী রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—লোকেরা নিজেরা তো রোযা-নামায করেই না, অথচ জন্তু জানোয়ারকে মসজিদে ঢুকাইয়া দেয়। ইহার উত্তরে গণ্ড মূর্খ ব্যক্তি মোল্লাজীকে বলিতে লাগিল, বকবক করিতেছ কেন? অবুঝ জানোয়ার বলিয়াই তো মসজিদে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমাকে কোন দিন মসজিদে আসিতে দেখিয়াছ কি? দেখুন, ইহাকেই বলে তওফীক না হওয়া।

তদ্রূপ জনৈক মনিব ও চাকরের একটি গল্প আছে। একদা তাহারা প্রয়োজনবশতঃ বাজারে যাইতেছিল। পথে নামাযের সময় হওয়ায় চাকর মালিকের নিকট নামায পড়ার অনুমতি চাহিল। মনিব অনুমতি দানকরতঃ বলিল, তাড়াতাড়ি নামায পড়িয়া চলিয়া আস। আমি মসজিদের বাহিরে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। খোদার কুদরত দেখুন, তিনি চাকরকে মসজিদে প্রবেশের শক্তি দিলেন, কিন্তু মনিব বাহিরেই আটকা পড়িয়া গেল। চাকর খুব নিশ্চিন্ত মনে ফরয, নফল ইত্যাদি আদায় করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মসজিদের অন্যান্য নামাযীরা নামায সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। মনিব বাহিরে অপেক্ষা করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। সকলের শেষে এক ব্যক্তিকে মসজিদ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন মসজিদে কতজন লোক রহিয়াছে? উত্তর হইল, মাত্র একজন। মনিব মনে করিল, আর বোধ হয় দেরী হইবে না, সত্বরই চলিয়া আসিবে। কিন্তু চাকর নির্জনতা পাইয়া ওযীফা আরম্ভ করিয়া দিল। অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া মনিব ডাকিয়া বলিল, আরে কোথায় আছ, বাহিরে আস না কেন? চাকর উত্তর দিল, আমাকে আসিতে দেয় না। মনিব বলিল, কে আসিতে দেয় না; চাকর উত্তর দিল, যে তোমাকে মসজিদের ভিতরে আসিতে দেয় না। সোব্‌হানাল্লাহ্! সোব্‌হানাল্লাহ্! চমৎকার উত্তর হইয়াছে।

www.almodina.com

বন্ধুগণ, খোদার তওফীক অস্বীকার করা যায় না। খোদা যাহাকে তওফীক দেন, সে-ই ধর্মের কাজ করিতে পারে। ইহা হইতে এবাদতকারীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এবাদত লইয়া গর্ব করা বা এবাদত বন্দেগী হইতে বঞ্চিত কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করা মোটেই সমীচীন নহে। কেননা, তুমি যাহা করিতেছ, তাহা একমাত্র খোদার তওফীকেই করিতেছ। ইহাকে নিজের বাহাদুরী মনে করিও না; বরং সর্বদা এই ভাবিয়া ভীত থাক যে, খোদা যেন অন্যান্যদের ন্যায় তোমার নিকট হইতেও তওফীক ছিনাইয়া না নেন।

মোটকথা, তওফীকের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করিলে হযরত হাজী সাহেব বর্ণিত এবাদত কবূল হওয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে হক তা'আলার অপার অনুগ্রহেরও অনুমান করা যায়। আমরা যে নামায পড়ি তাহাতে না আছে খুশূ'-খুযূ' না আছে যিকর, না আছে ধ্যান। ঘড়ির কাঁটা যেমন আপনাআপনিই চলিতে থাকে, আমাদের নামাযও তদ্রূপ। নামাযের মধ্যে আমাদের মস্তিষ্কে রাজ্যের চিন্তা আসিয়া জড় হয়। কিন্তু উপরোক্ত লক্ষণানুযায়ী বুঝা যায় যে, আমাদের এইরূপ নামাযও কবূল হয়। এই রহমতের কোন পারাপার আছে কি?

তুমি কোন বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অন্য দিকে মনোনিবেশ করিয়া দেখ তো, তৎক্ষণাৎ দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইবে। তাই মাওলানা বলেনঃ

این قبول ذکر تو از رحمت است ـ چوں نماز مستحاضه رخصت است

চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। মোস্তাহাযা মহিলার নামায যেমন একমাত্র রহমতের কারণেই কবূল হয়, আমাদের নামাযের অবস্থাও তদ্রূপ। মোস্তাহাযা মহিলা পাক-পবিত্র থাকে না—সর্বদা রক্ত ঝরিতে থাকে। তাসত্ত্বেও শরীঅত বলে—ক্ষতি নাই, নামায পড়িয়া যাও। কবূল হইয়া যাইবে।

খোদার এই রহমতের কথা জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাওয়া উচিত নয় যে, তিনি যখন সর্বাবস্থায়ই কবূল করেন, খুশূ'-খুযূ'র কি প্রয়োজন? না, প্রয়োজন আছে। কেননা, খুশূ'-খুযূ' ছাড়া নামায কবূল হওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ। নিয়ম হইল—ওয়াজিব, শর্ত ইত্যাদি আদায় করিয়া নামায পড়িলেই কবূল হইবে—নতুবা নহে। কোন কোন আলেমের মতে নামাযে খুশূ'-খুযূ' ফরয। আবার কাহারও মতে ইহা সুন্নত। তবুও নিশ্চিত হওয়া কোন অবস্থাতেই সঙ্গত নহে। আত্মমর্যাদাশীল লোকগণ খোদার অপার অনুগ্রহ ও রহমতের কথা মনে করিয়া লজ্জায় মাথা হেট করিয়া দেয়। তাঁহারা ভাবেন—আফসোস! খোদার তরফ হইতে এত মনোনিবেশ, আর আমাদের তরফ হইতে এত উদাসীনতা! ছিঃ! ছিঃ! মরিয়া যাওয়ার কথা। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা এবাদতে আরও বেশী তৎপরতা অবলম্বন করেন।

**ধর্ম-কার্যে অকৃতকার্যতার কারণঃ** মোটকথা, বহু যুক্তির মাধ্যমে এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ধর্মের কাজ দুনিয়ার কাজ হইতে অনেক দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। উপরন্তু দুনিয়ার কাজে বিভিন্ন উপায়াদি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞানীদের নিকট স্বীকৃত। এমতাবস্থায় ধর্মের কাজে উপায় অবলম্বন না করার কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে? কোন যৌক্তিকতা নাই।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অকৃতকার্যতার কারণ কয়েকটি হইতে পারে—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা কিংবা উদ্দেশ্য হাছিলের উপায় নির্দিষ্ট না হওয়া; কিংবা উপায় অত্যধিক কঠিন হওয়া অথবা উপায় দ্বারা মক্‌ছুদ হাছিল না হওয়া। যেক্ষেত্রে এই কয়েকটি কারণের মধ্য হইতে কোন

একটিও বিদ্যমান নাই, সেক্ষেত্রে অকৃতকার্যের কারণ সাহসের অভাব এবং অলসতা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে বুঝা যায় যে, যাহারা ধর্মকাজে অকৃতকার্য হয়, তাহারা একমাত্র অলসতার কারণেই অকৃতকার্য হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া অকৃতকার্যতার অন্য কোন কারণ নাই। কেননা, ধর্মকাজ যে একটি উদ্দেশ্য, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহার উপায়ও অজানা নহে। আমি জোর দাবীর সহিত এক্ষণেই বর্ণনা করিয়াছি যে, ধর্মের কাজে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। কাজেই উপায় কঠিন হওয়ারও প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আয়াত ও হাদীসের সাহায্যে আমি ইহাও প্রমাণ করিয়াছি যে, দুনিয়ার কাজে উপায়াদি অবলম্বন করিলে মকছুদ হাছিল হওয়া নিশ্চিত নহে; কিন্তু ধর্ম কাজে উপায় অবলম্বন করিলে কামিয়াবী সুনিশ্চিত। কেননা, কোরআন ও হাদীসে এ সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ওয়াদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য খোদার তরফ হইতে উন্নতি এবং সাহায্য দানেরও ওয়াদা আছে। এর পরও কেহ ধর্ম-কাজে অকৃতকার্য হইলে উহার কারণ দুর্ভাগ্য ও অলসতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

**আয়াতের তফসীর ঃ** প্রথমে আমি যে আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাতে হক তা'আলা এই ধর্মীয় উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করিয়া তৎসঙ্গে উহার উপায়ও বর্ণনা করিয়াছেন। আমার বিস্তারিত বর্ণনা হইতে আপনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, আয়াতে বর্ণিত উপায়টি অত্যধিক সহজ ও সরল। ইহা হইতে অধিক সহজ কোন উপায় হইতে পারে না। কিন্তু এই বিস্তারিত বর্ণনার পূর্বে আমি আয়াতের তফসীর করিয়া দেওয়া সমীচীন মনে করি। হক তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ۞

এই আয়াতখানি দুই ভাগে বিভক্তঃ (১) اِتَّقُوا اللهَ "তোমরা খোদাকে ভয় কর" (২) وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ "এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।"

ইহা কোরআন শরীফের অলৌকিক ক্ষমতা যে, এই দুইটি বাক্যের মধ্যে সমুদ্র ভরিয়া দিয়াছে। বিস্তারিত বর্ণনার পর বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুইটি বাক্যের মধ্যে হক তা'আলা কত বিরাট বিষয়কে ব্যক্ত করিয়াছেন!

বিভিন্ন প্রকারে কোরআনের বাক্যাবলীর তফসীর হইতে পারে। কাজেই এই আয়াতে অন্য কোন তফসীরকার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু এই মতদ্বৈধতা কেবলমাত্র প্রকারভেদে সীমাবদ্ধ। আয়াতের মূল অর্থ একই থাকে। এই আয়াতের অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, اِتَّقُوا اللهَ অংশে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অংশে উহার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

যাহারা গভীর মনোযোগ সহকারে কোরআন পাঠ করে; তাহারা ভালভাবেই জানে যে, কোরআনে হক তা'আলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের সঙ্গেসঙ্গে উহার উপায়ও বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পরম অনুগ্রহ যে, তিনি কোন কাজের আদেশ দিয়া বান্দাকে হয়রান পেরেশান ছাড়িয়া দেন না; বরং কাজটি কি উপায়ে করিতে হইবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বলিয়া দেন। হক তা'আলার এই অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা এই যে, এই আয়াতেও প্রথম বাক্যে উদ্দেশ্য ও দ্বিতীয় বাক্যে উহার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, "তাক্ওয়া" (খোদাভীতি) হইল উদ্দেশ্য এবং "সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়া" হইল উহা লাভ করিবার উপায়। অন্য কথায় বুঝিতে হইলে হক তা'আলা ধর্মকে পূর্ণরূপে অর্জন করার আদেশ দিয়াছেন এবং

কামেল ব্যক্তিদের সঙ্গলাভকে উহার উপায় হিসাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাকওয়ার তফসীর 'ধর্মে পূর্ণতা অর্জন' কিনা, তাহা আমি পরে বর্ণনা করিব। এক্ষণে আমি বলিতে চাই যে, ধর্মে পূর্ণ ধার্মিকতা উদ্দেশ্য ও কাম্য কিনা।

**পূর্ণতা লাভের চেষ্টা ঃ** যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জনের বেলায় পূর্ণতা লাভই মানুষের লক্ষ্য থাকে। অপূর্ণ অবস্থায় কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। ব্যবসা-বাণিজ্য করিলেও উহাতে পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করা হয়। দুই এক লক্ষ টাকা আমদানী হইলেই কেহ চেষ্টায় বিরত হয় না; বরং যতই উন্নতি হইতে থাকে, ততই আরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। প্রয়োজনের তুলনায় বেশী আমদানী হইয়াছে দেখিয়া কেহই ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করে না; বরং আরও নানা রকম নূতন ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেয়। যদি কাহারও সাধারণ গৃহ সরঞ্জামের দোকান থাকে এবং উহা হইতে প্রচুর আমদানী হয়, তবে পুঁজি বৃদ্ধি হওয়ার পর সে একটি কাপড়ের দোকানও খুলিয়া বসে। ইহাতে উন্নতি হইলে জুতার ব্যবসাও আরম্ভ করিয়া দেয়। এমন কি প্রথমে পিতা-পুত্র সকলেই এক দোকানের কাজ করিলে পরে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক দোকান খোলা হয়। আমরা এসব দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করি। এর পর বহু বাসা ক্রয় করিয়া ভাড়া দেওয়া হয়। মোটকথা, উন্নতির জন্য চিন্তার বিরাম নাই। কোন পর্যায়েই ক্ষান্ত হয় না। কথায় বলে ঃ لَايَنْتَهِىْ اِرْبٌ اِلَّا اِلٰى اِرْبٍ "এক প্রয়োজন সমাপ্ত হইতে না হইতেই অপর প্রয়োজন দেখা দেয়।"

কাহারও নিকট প্রয়োজন মাফিক জায়গা-জমি থাকিলেও সে উহাতে তৃপ্ত হয় না; বরং কিরূপে সারা গ্রাম ক্রয় করা যায়, সে সেই চিন্তায়ই মশগুল থাকে। এক গ্রাম ক্রয় করার পর অন্য গ্রাম ক্রয় করার আশা মনের কোণে বাসা বাঁধিয়া বসে।

هفت اقليم ار بگيرد پادشاه ـ همچناں در بند اقليمے دگر

(হাফ্‌ত একলীম আর বগীরাদ পাদশাহ্+ হামচুনাঁ দর বন্দে একলীমে দিগার)

"বাদশাহ্ যদি সপ্ত-রাজ্যও হাছিল করে, তবুও সে আরও অধিক রাজ্য লাভের আশায় থাকে।"

মোটকথা, পার্থিব উন্নতির বেলায় মানুষ সর্বদাই বেশীর কামনা করে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার এই কামনা শেষ হয় না। শেখ সা'দী বলেন ঃ

گفت چشم تنگ دنيادار را ـ يا قناعت پر كند يا خاك گور

(গোফ্‌ত চশ্‌মে তঙ্গ দুনিয়াদার রা + ইয়া কানাআত পুর কুনাদ ইয়া খাকে গোর)

"বলিয়া দাও সংকীর্ণ-চক্ষু দুনিয়াদারের কানাআত কিংবা কবরের মাটিই তাহার লোভ পরিপূর্ণ করিতে পারে।" দুনিয়াদারের কোন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, তবে হাঁ, কবরের মাটিতেই তাহার লোভের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে।

হয়তো আপনি এমন কোন ব্যক্তি দেখাইতে পারিবেন, যে দশ হাজার টাকা কিংবা দশটি গ্রাম লাভ করার পর ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে। প্রথমতঃ, এরূপ ব্যক্তি খুবই বিরল। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এক আধজন এরূপ হইলে তাহা না হওয়ারই শামিল। কাজেই ইহাতে আমার বর্ণিত নীতিতে কোনরূপ ত্রুটি লাগিতে পারে না। কেননা, অধিকাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নীতি নির্ধারিত হয়। অধিকাংশ লোকের অবস্থা আমার বর্ণিত নীতির সম্পূর্ণ অনুকূলে। দ্বিতীয়তঃ, আমি বলিব যে, আপনি যাহাকে এরূপ দেখাইবেন, সে দ্বীনদার হইবে—দুনিয়াদার হইবে না। আর

www.almodina.com

আমি তো দুনিয়াদারদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। যদি এই ব্যক্তি দ্বীনদার না হয়, তবে ইহার মোটামুটি উত্তর এই যে, এই পরিমাণ দৌলত অর্জন করাই তাহার মতে পূর্ণতা। এই পূর্ণতা লাভ হইয়া যাওয়ার পর তাহার দৃষ্টিতে আর কোন পূর্ণতা নাই। সুতরাং বুঝা গেল যে, সে-ও পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষী, সে-ও অপূর্ণ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে নাই।

আসল উত্তর এই যে, সে বাহ্যিক উন্নতি শেষ করিয়া দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও উন্নতি করিতেছে। কারণ, সে জ্ঞানী দুনিয়াদার—অজ্ঞান নহে। সে দুনিয়ার প্রাণ বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে, জীবিকা উপার্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল মানসিক শান্তি লাভ করা। সর্বদাই জীবিকার পিছনে লাগিয়া থাকিলে মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়। মন অস্থির থাকে। এই কারণে যথেষ্ট পরিমাণ ধন অর্জন করার পর সে ভবিষ্যতের জন্য বাহ্যিক উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে এখনও উন্নতি করিতেছে। অর্থাৎ, সে আরাম ও মানসিক শান্তি বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে।

মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, পার্থিব উপায়াদির বেলায় মানুষ সর্বদাই পূর্ণতা অন্বেষণ করে। কোন লভ্য বস্তুর উপর চেষ্টা শেষ করে না। কেহ কোন নির্দিষ্ট সীমায় চেষ্টা শেষ করিলেও তাহা অপূর্ণ অবস্থায় করে না; বরং চেষ্টাকে উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইয়াই ক্ষান্ত হয়। উদাহরণতঃ কাহারও ব্যবসায় ক্ষতি হইতে থাকিলে সে তদবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া যায় না; বরং সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়, এরূপ সম্পদ সঞ্চিত করিয়াই চেষ্টা ত্যাগ করে। সুতরাং নিশ্চিতরূপেই জানা গেল যে, অপূর্ণ অবস্থায় কাহারও তৃপ্তি হয় না; বরং পূর্ণতা লাভের পরেই হয়। এই তৃপ্তিও বাহ্যত হইয়া থাকে, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তাহার উন্নতি তখনও শেষ হয় না।

**দ্বীনদারী ও অল্পে তুষ্টিঃ** আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ ধর্ম-কার্যে অপূর্ণ অবস্থায়ই তুষ্ট হইয়া যায়। পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়িয়া লওয়াকেই আজকাল বড় দ্বীনদারী মনে করা হয়। নামায পড়া আরম্ভ করার পর হইতেই নিজকে দ্বীনদার মনে করে এবং ইহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া লয়। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহাদের নামাযও সবদিক দিয়া সম্পূর্ণ নহে। অথচ নামায পূর্ণভাবে আদায় করিলেও দ্বীনদারী কামেল হয় না। সুতরাং নামাযই যেখানে অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ, সে ক্ষেত্রে ইহারই উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাওয়া খুবই দোষের কথা। কেহ নামাযের সাথে সাথে যদি যাকাতও আদায় করে, তবে আর কি, মনে করে যে, বস্ জান্নাত কিনিয়া ফেলিলাম। এর পর হজ্জ করিলে তো আর কথাই নাই, যেন জুনাইদ বাগদাদী হইয়া গেল। এর পর সম্মুখে আর উন্নতি করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। ইহাতেই দ্বীনদারী কামেল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া সে চেষ্টাচরিত্র একেবারে বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। সর্বসাধারণের কথা কি বলিব, কিছু সংখ্যক আলেমকেও এই রোগে আক্রান্ত দেখা যায়।

একবার জনৈক আলেম আমার নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন—আপনার বর্ণিত ওযীফা ইত্যাদি পড়িয়া শেষ করিয়াছি। এখন সম্মুখে আরও কোন সবক আছে, না এই পর্যন্তই শেষ? আফসোস! মরা দুনিয়ার জন্য চেষ্টা করিতে যাইয়া মানুষ কোথাও সন্তুষ্ট হয় না, আর দ্বীনদারী কি এতই হেয় হইয়া গেল যে, দুই চারি দিন কাজ করিয়াই মানুষ নিজকে কামেল মনে করিতে থাকে। এই আলেমের পত্র পাঠ করিয়া আমি যারপরনাই বিরক্তি অনুভব করিলাম। মনে হইল যে, সে দ্বীনের আদব মোটেই জানে না। তাহার ব্যবহৃত শব্দ হইতে পরিহাস ফুটিতেছিল। আমি উত্তরে লিখিয়া দিলাম, আপনার সহিত আমার বনিবনাও হইবে না। আপনাকে আমি সম্বোধনের

উপযুক্ত মনে করি না। আপনি দ্বীনদারী তো হাছিল করিতে চানই না—অন্তরে উহার প্রতি শ্রদ্ধাও রাখেন না। (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)

মোটকথা, মানুষের ধারণা যে, দ্বীনদারী শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বেশী কোনকিছু করার প্রয়োজন নাই। উপরন্তু কেহ পুরাপুরি তাকওয়া অবলম্বন করিলে, বান্দার হকের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে এবং দ্বীনদারীতে উন্নতি করিতে চাহিলে তাহাকে পাগল মনে করা হয়। কিন্তু সে এমন পাগল যাহার সম্বন্ধে মাওলানা বলিয়াছেনঃ

او گل سرخ ست تو خونش مخوان – مست عقل ست او تو مجنونش مدان

(উ গোলে সুরখ আস্ত তূ খুনাশ মখাঁ + মস্তে আক্বল আস্ত উ তূ মজনূনাশ মদাঁ)

"তিনি লাল ফুল, তাঁহাকে তুমি রক্ত মনে করিও না। তিনি সজ্ঞান বিভোর, তাঁহাকে পাগল মনে করিও না।" তাহারা তো খোদার পাগল।

ما اگر قلاش و اگر دیوانه ایم – مست آں ساقی و آں پیمانه ایم

(মা আগর কাল্লাশ ও আগর দেওয়ানায়েম + মস্ত আঁ সাকী ও আঁ পায়মানায়েম)

"আমরা যদি নিঃস্ব ও পাগল হইয়া থাকি, তবে তাহা আল্লাহ্‌র জন্যই।" এই পাগলামী তো তাহাদের জন্য গর্বের বিষয়।

اوست دیوانه که دیوانه نشد – مرعسس را دید و در خانه نشد

(উস্ত দিওয়ানা কেহ্ দিওয়ানা নাশুদ + মার্‌আসাস রা দীদ ও দর খানা নাশুদ)

"যে পাগল হয় নাই, সে-ই পাগল। কেননা, সে কোতয়ালকে দেখিয়াই ঘরে প্রবেশ করিল না।"

**জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনীঃ** আমার জনৈক বন্ধু প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পরে তিনি দ্বীনদারীর হেফাযতের খাতিরে স্বেচ্ছায় শাসন বিভাগ হইতে বদলী হইয়া বর্তমানে শিক্ষা বিভাগে কাজ করিতেছেন। এই চাকুরীতে তিনি পূর্বাপেক্ষা কম বেতন পাইতেছেন। এই কারণে অনেকে তাঁহাকে বোকা বানাইয়া বলিতে শুরু করিয়াছে—অদ্ভুত পাগল আর কি! এত বড় বেতনের চাকুরী ত্যাগ করিয়া অল্প বেতনে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শাসন বিভাগের চাকুরী ছাড়িয়া নিকৃষ্ট চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে। আমি বলি, তাহারা যখন খোদার সম্মুখে পৌঁছিবে, তখন বুঝিতে পারিবে আসলে কে বোকা।

তিনি একবার রেলভ্রমণে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ছেলেও ছিল। তিনি ছেলের সঠিক বয়স অনুসন্ধান করিতেছিলেন যে, বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কিনা। বার বৎসর পূর্ণ হইলে রেলওয়ের আইনানুযায়ী তাহার জন্যও পূর্ণ টিকেট লইতে হইবে। তাঁহার সঙ্গীয় লোকগণ বলিলেন, ছেলের বয়স কিছুতেই বার বৎসর হইবে না। হইলেও আকৃতিতে সে দশ বৎসরেরই মনে হয়। সুতরাং তাহার জন্য পূর্ণ টিকেট না লইলেও কেহ কিছু বলিবে না। বন্ধুবর বলিলেন, রেল কর্মচারীরা কিছু না বলিলেও খোদা তো নিশ্চয়ই বলিবেন যে, তুমি অন্যের জিনিস অনুমতি না লইয়া ও ভাড়া আদায় না করিয়া কেন ব্যবহার করিলে? মোটকথা, তিনি ছেলের বয়স খোঁজাখুঁজি করিতেছিলেন, এদিকে তাঁহার চাকর তাহাতে হাসিতেছিল। অবশেষে জানা গেল যে, ছেলের বয়স বার বৎসর হইতেও কিছু বেশী। ফলে তিনি তাহার জন্যও পূর্ণ টিকেট লইলেন।

ইহা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে এইরূপ পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিল না যে, সাহেব—আপনার কাছে টাকা বেশী হইয়া থাকিলে কোন দরিদ্রকে দান করিয়া দিন। রেলওয়েকে কেন দিতেছেন? কেননা, রেল কর্মচারীরা এই ছেলের জন্য পূর্ণ টিকেট চাহিতেই পারে না। তিনি উত্তরে বলিলেন, যে উদ্দেশ্যের জন্য আমি এইরূপ খোঁজাখুঁজি করিতেছি, দরিদ্রকে টাকা দান করিলে তাহা লাভ হইবে না। অর্থাৎ, দরিদ্রকে টাকা দান করিলেই অপরের স্বত্ব বিনানুমতিতে ব্যবহার করা জায়েয হইয়া যাইবে না। মোটকথা, এ ব্যাপারে সকলেই তাহাকে বোকা ও পাগল ঠাওরাইতেছিল; কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন খোদার পাগল।

নীতি হইল, যখন দ্বীনদারী প্রবল হয়, তখন মুসলমান পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। তবে কোথায় পার্থিব ক্ষতি বরদাশ্‌ত করা এবং কোথায় না করা,—তাহা বিচক্ষণ বুযুর্গদের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক। ব্যাপকভাবে যে কোন পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির বরদাশ্‌ত করা জরুরী নহে; বরং বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মোটামুটিভাবে শরীঅতের কোন ওয়াজিব কাজ পালন করিতে কিংবা কোন হারাম কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া যদি অর্থ কিংবা আত্মসম্মানের ক্ষতিও হয়, তবে তৎপ্রতি ভুক্ষেপ করা উচিত নহে। আর যদি প্রাণ নাশের আশঙ্কাজনিত ক্ষতি দেখা দেয়, তবে এই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব কাজ ওয়াজিব থাকিবে না এবং হারাম কাজ হারাম থাকিবে না। মোস্তাহাব কিংবা সুন্নত পালন করিতে যাইয়া আর্থিক ক্ষতি বরদাশ্‌ত করা ওয়াজিব নহে; বরং তাহা উত্তম এবং দৃঢ়তা বলিয়া বিবেচিত হইবে। কখনও কখনও মোস্তাহাব ও সুন্নতের জন্য প্রাণনাশ জনিত ক্ষতি সহ্য করা না-জায়েয ও হারাম বলিয়া গণ্য হয়। উহা জানিতে হইলে ফেকাহ্‌র কিতাবাদি পাঠ করা আবশ্যক। ক্ষতি সহ্য করা কোথায় উচিত, কোথায় অনুচিত এবং কোথায় ওয়াজিব, কোথায় হারাম—তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারে না।

**মূর্খ তাওয়াক্কুল (ভরসা) কারীর কাহিনীঃ** এই বিষয়টি প্রত্যেকের নিজস্ব মতামতের উপর ছাড়িয়া দিলে তাহা নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীর ন্যায় হইবে।

জনৈক ব্যক্তি তাওয়াকুলের ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক মৌলবী সাহেবের ওয়ায শুনিয়াছিল। সে এই ভাবিয়া খুব আনন্দিত হইল যে, খোদা যখন এমনিতেই রুযী পৌঁছাইতে পারেন, তখন এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? সেমতে সে যাবতীয় কাজ-কারবার ছাড়িয়া দিয়া সড়কের ধারে বসিয়া রহিল। সড়ক হইতে একটু দূরে যাইয়া বসিবে এ সাহসও হইল না। সে ভাবিল যে, সড়কের ধারে বসিলে পথিকগণ তাহাকে দেখিতে পাইবে। তাছাড়া সেখানে একটি কূপও ছিল। উহার নিকটে বসিয়া প্রায়ই পথিকগণ খাওয়া-দাওয়া করিত। পথিকদের মধ্য হইতে কেহ না কেহ তাহাকে খাইতে দিবেই। এই ভাবিয়াও সে উক্ত জায়গাটি পছন্দ করিল। কিছুক্ষণ পর জনৈক পথিক আসিয়া সেখানে খাওয়া-দাওয়া করিল এবং আপন পথে চলিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, এবার যে আসিবে, সে নিশ্চয়ই আমাকে খাইতে দিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিল; কিন্তু হায়, সে-ও তাহার দিকে পিঠ দিয়া খানা খাইয়া চলিয়া গেল। এইভাবে দুই তিনদিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কেহ তাহাকে এক লোকমাও খাইতে দিল না। সর্বশেষে জনৈক পথিক আসিয়া খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত করত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেই সে গলাঝাড়া দিয়া উহ্, আহ্ শুরু করিয়া দিল। পথিক নিকটে আসিয়া দেখিল যে, লোকটি ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। সঙ্গে যে কয়টি রুটি অবিশিষ্ট ছিল, সমস্তই তাহার সম্মুখে দিয়া দিল। রুটি খাইয়া সাহেবের চৈতন্য পুনর্বহাল হইল।

অতঃপর সে দৌড়িয়া মৌলবী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, জনাব, আপনি তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে ওয়ায করিতে যাইয়া একটি বিশেষ জরুরী কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। উহা না বলায় খোদা জানে কত মানুষ কষ্ট ভোগ করিতেছে। খোদার কৃপায় আমি নিজস্ব চেষ্টায় বিষয়টি বুঝিতে পারিয়াছি। নতুবা আমিও প্রাণ হারাইতাম। ভবিষ্যতে আপনি যখনই তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে ওয়ায করিবেন, তখন মেহেরবানীপূর্বক এই কথাটিও বলিয়া দিবেন যে, গলা ঝাড়া দেওয়ারও প্রয়োজন আছে। এর পর লোকটি মৌলবী সাহেবকে আপন কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনাইল।

দেখুন, এই ব্যক্তি জীবিকার উপায়াদি ত্যাগ করার কথা শুনিয়া মনে করিল যে, সে-ও এই কাজের যোগ্য। ফলে কাজ-কারবার হইতে হাত গুটাইয়া অহেতুক কষ্ট ভোগ করিল। তাহার উচিত ছিল, আধ্যাত্মিক চিকিৎসকের নিকট জিজ্ঞাসা করা যে, সে চেষ্টা-চরিত্র ত্যাগ করার যোগ্য কিনা।

জনৈক ব্যক্তি ওয়ায শুনিয়াছিল যে, খোদার পথে এক টাকা দান করিলে উহার পরিবর্তে দুনিয়াতে দশ ও আখেরাতে সত্তর টাকা পাওয়া যায়। সে মনে মনে ভাবিল, এর চেয়ে উত্তম ব্যবসা আর কি হইবে? সবকিছু ছাড়িয়া ইহাই করা উচিত। তাহার নিকট একটি টাকা ছিল। সে তৎক্ষণাৎ উহা খয়রাত করিয়া দিল এবং দশ টাকা পাওয়ার আশায় প্রহর গণিত লাগিল। কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল; কিন্তু একটি পয়সাও আসিল না। সে খুব অস্থির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর পর তাহার কেবল টাকাটির কথা মনে জাগিত। সে মনে মনে মৌলবী সাহেবকেও মন্দ বলিত। এইরূপে ক্রমাগত চিন্তার ফলে তাহার দাস্ত ও আমাশয় দেখা দিল। সে ঘন ঘন জঙ্গলে যাতায়াত করিতে লাগিল।

একবার সে পায়খানায় বসিয়া মাটি খুড়িতেছিল। হঠাৎ মাটির নীচ হইতে একটি থলিয়া বাহির হইয়া আসিল। উহাতে পূর্ণ দশ টাকা রক্ষিত ছিল। সে যারপরনাই আনন্দিত হইল। দাস্তও বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, যে কারণে দাস্ত হইতেছিল, তাহাই আর বাকী ছিল না। সে দৌড়িয়া মৌলবী সাহেবের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিল, জনাব, আপনার ওয়ায ষোল আনা সত্য। তবে কিনা উহাতে একটি কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে কোথাও এই মাসআলাটি বর্ণনা করিলে ইহাও বলিয়া দিবেন যে, আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া শরীরও মোচড়াইতে হয়। এর পর যে ইহা সহ্য করিতে পারিবে, সে এক টাকার পরিবর্তে দশ টাকা পাইবে। আর যে সহ্য করিতে পারিবে না, সে এই পথেই আসিবে না। একের পরিবর্তে দশ পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু মোচড় সহ্য করিতে সাংঘাতিক কষ্ট হয়।

মোটকথা, প্রত্যেককেই ক্ষতি সহ্য করার অনুমতি দেওয়া যায় না। তজ্জন্য কিছু শর্ত ও যোগ্য পাত্রের প্রয়োজন। তবে ইহাও সত্য যে, দ্বীনদারী প্রবল হইয়া গেলে দ্বীনদার ব্যক্তি পার্থিব ক্ষতির পরওয়া করে না।

**জনৈক খোদা-প্রেমিকের কাহিনীঃ** আমার জনৈক বি,এ, পাশ বন্ধু একবার রেলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট যথেষ্ট আসবাব-পত্র ছিল। ঘটনাক্রমে যে ষ্টেশনে তিনি গাড়ীতে চড়িয়াছিলেন, সময়ের অভাবে তথায় আসবাবপত্র ওযন ও বুক করাইতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি ভাবিলেন যে, যে ষ্টেশনে নামিব, সেখানে আসবাবপত্র ওযন করাইয়া রেলওয়ের ভাড়া পরিশোধ করিয়া দিব। সেমতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তিনি কর্মরত বাবুকে বলিলেন, আমার নিকট বেশী মালপত্র আছে, কিন্তু সময়ের অভাবে উহা ওযন করাইয়া বুক করাইতে পারি নাই। এখন

আপনি মালপত্রগুলি ওযন করিয়া ভাড়া গ্রহণ করুন। যেহেতু আমি স্বেচ্ছায় বলিয়া দিয়াছি, কাজেই আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি খিয়ানত অথবা আইনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করি নাই। অতএব, আইনত যাহা ভাড়া হয়, আমার নিকট হইতে তাহাই লওয়া উচিত—ডবল চার্জ করা উচিত নহে। বাবু বলিল, স্বচ্ছন্দে চলিয়া যান, আপনার নিকট হইতে কিছুই লইব না। বন্ধুবর আবার পীড়াপীড়ি করিলেন। বাবু বিস্ময় সহকারে তাঁহাকে ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট লইয়া গেল। ষ্টেশন-মাষ্টারও ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি এখানেও পীড়াপীড়ি করিলেন। তাহাদের ধারণা ছিল যে, আগন্তুক লোকটি ইংরেজী ভাষা জানে না। তাই তাহারা উভয়ে ইংরেজীতে আলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের আলাপের সারমর্ম ছিল এইরূপঃ মনে হয়, লোকটি মদ পান করিয়াছে। তাই লইতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় টাকা দিতে চাহিতেছে। বন্ধুবর বলিলেন, আমি মদ পান করি নাই, তবে আমার ধর্ম আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিতেছে।

আফ্সোস্ আজকাল প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর বাজার গরম হইয়া গিয়াছে। ফলে কেহ স্বেচ্ছায় খোদার ভয়ে অন্যের হক আদায় করিতে পারে বলিয়া মানুষ বিশ্বাসই করে না। তাহাদের মতে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যের হক আদায় না করে, সে-ই বুদ্ধিমান। আর যে ইহা আদায়ের জন্য ব্যস্ত থাকে, তাহাকে পাগল মনে করা হয়। রেলওয়ে কর্মচারীরা বন্ধুবরকেও পাগল মনে করিয়া বলিয়া দিল—আপনি আসবাবপত্র লইয়া চলিয়া যান। আমরা অনুমতি দিলাম, কেহ কিছু বলিবে না। তিনি বলিলেন, আপনাদের এরূপ অনুমতি দেওয়ার কোন অধিকার নাই। আপনারা কোম্পানীর মালিক নহেন—কর্মচারী মাত্র। কাজেই রেলওয়ের প্রাপ্য মাফ করিবার আপনাদের কি অধিকার আছে? শেষ পর্যন্ত কোনক্রমেই তাহারা মালের ভাড়া লইল না। তিনি আসবাবপত্র উঠাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে খোদা! এখন আমি কি করিব? তখন হক তা'আলা তাহাকে সাহায্য করিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বান্দা গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। অন্যেরা তাহাকে গোনাহে লিপ্ত করিতে চায়, সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ বন্ধুবরের অন্তরে এই ধারণা জাগ্রত হইল যে, মালের ভাড়ার টাকা দ্বারা রেলওয়ে হইতে একটি টিকেট কিনিয়া ছিড়িয়া ফেলা উচিত। এইভাবে ভাড়া আদায় হইয়া যাইবে। অনন্তর তিনি তাহাই করিলেন।

বন্ধুগণ, আপনারা ধর্মের উপর আমল করিয়া দেখুন। ইন্শাআল্লাহ্ পদে পদে খোদার সাহায্য স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন।

**খোদার সাহায্যঃ** ইহা জানা কথা যে, খোদার সাহায্য ব্যতীত দ্বীনদারীতে পূর্ণতা অর্জন করা যায় না। আমি জোর দাবীর সহিত বলিতে পারি যে, প্রাথমিক পর্যায়ে হক্ তা'আলা পুরাপুরি সাহায্য করেন। কাজেই ধর্মের কাজে যখন শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত খোদার সাহায্য বিদ্যমান, তখন ভয়ের কোন কারণ নাই। অনেকেই বলে, ধর্মের উপর আমল করিব কিরূপে? ইহা যে খুব কঠিন। আমি বলি, যদি আপনার কাছে কঠিন হয়, তবে খোদার কাছে কিছুতেই কঠিন নহে। তিনি যখন সাহায্যের ওয়াদা করেন, তখন এই ওযর পেশ করা নফ্সের দুষ্টামি বৈ কিছুই নহে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○

অর্থাৎ, "যাহারা আমার পথে চলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, আমি তাহাদিগকে আমার পথ দেখাইয়া দেই এবং যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে, খোদা তাহার জন্য নিষ্কৃতির পথ বাহির করিয়া দেন।"

**চিন্তাহীনতা ঃ** পরিতাপের বিষয়, এর পরও মানুষ দ্বীনদারীতে উন্নতি করিতে চেষ্টিত হয় না। যাহার মধ্যে যতটুকু দ্বীনদারী আছে, সে উহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। আমি শুধু সাধারণ লোকের কথাই বলিতেছি না; বরং দুঃখের বিষয়, বিশিষ্ট লোকগণও উন্নতির চিন্তা করে না। যাহারা শিক্ষাদান কার্যে রত আছে, তাহারা উহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া মনে করে যে, বড় দ্বীনদার হইয়া গিয়াছে, সর্বদা খোদার কালাম ও রাসূলের বাণী লইয়া গবেষণা করিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাই যদি হইত, তবে শরীঅতে লেন-দেন ও সামাজিকতার শিক্ষা কেন রহিয়াছে? চরিত্র সংশোধনের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে কেন? এইগুলি দ্বীনদারীর অন্তর্ভুক্ত নহে কি? এইগুলির উপর আমল করার জন্য মুসলমানদিগকে বাদ দিয়া অন্য জাতি পয়দা হইবে কি? ফেকাহ্ শাস্ত্রে তাকওয়া সম্বন্ধে বহু খুঁটিনাটি মাসআলা বর্ণিত হইয়াছে। তোমরা সেগুলির উপর আমল কর না কেন? ফেকাহ্‌বিদগণ এই সমস্ত মাসআলা কেন বর্ণনা করিয়াছেন?

দুনিয়াদার ব্যক্তি সামান্য দ্বীনদারী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আলেমগণ অল্প দ্বীনদারী লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলে তদপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কারণ, দ্বীনদারী অল্প হইলেও দুনিয়াদাররা দুনিয়ার আরাম ও শান্তি লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে মৌলবী সাহেবরা দুনিয়ার ব্যাপারে তো রিক্তহস্ত থাকেনই; তদুপরি যদি দ্বীনদারীতেও রিক্তহস্ত হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের কোন দিক লাভ হইল না। দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় ক্ষেত্রেই অশান্তি। দুনিয়াতে তাঁহাদের অশান্তি লাগিয়াই আছে। বসবাসের জন্য না আছে সুউচ্চ দালান-কোঠা, চাকর-বাকর এবং না আছে টাকা-পয়সা ও সুস্বাদু আহার্য। রেশমী পোশাকও তাঁহারা পরিধান করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় এই সম্প্রদায়টি সামান্য দ্বীনদারী লইয়াই কেন যে সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং দুনিয়া ত্যাগের পরও দ্বীনদারীতে পূর্ণতা অর্জন করে না, তাহা বাস্তবিকই দুর্বোধ্য। ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেনঃ

أَرَى الْمُلُوْكَ بِأَدْنٰى الدِّيْنِ قَدْ قَنَعُوْا ـ وَمَا أَرَاهُمْ رَضُوْا فِى الْعَيْشِ بِالدُّوْنِ

فَاسْتَغْنِ بِالدِّيْنِ عَنْ دُنْيَا الْمُلُوْكِ ـ كَمَا اسْتَغْنَى الْمُلُوْكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّيْنِ

"রাজা বাদশাহ্‌দিগকে দেখি, তাহারা সামান্য দ্বীনদারীতে সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামান্য দুনিয়া লইয়া সন্তুষ্ট হইতে তাহাদিগকে কখনও দেখা যায় না। অতএব, তুমি দ্বীনদারী লইয়া তাহাদের দুনিয়াদারী হইতে বিমুখ হইয়া যাও—যেমন, তাহারা দুনিয়াদারী লইয়া দ্বীনদারী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।" অর্থাৎ, দুনিয়ার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ্‌দিগকে পিছনে ফেলা সম্ভব না হইলেও দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদিগকে পিছনে ফেলা যায়; সুতরাং তুমি তাহাই কর। অদ্য তাহাদের তোমা অপেক্ষা বেশী অগ্রসর দেখা যায় সত্য; কিন্তু কাল দ্বীনদারীতে তুমি তাহাদের অপেক্ষা অগ্রসর থাকিবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি দ্বীনদারীতেও পিছনে পড়িয়া থাক, তবে তাহারা সর্বক্ষেত্রেই তোমা হইতে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ইহা মারাত্মক ক্ষতির কথা। সোবহানাল্লাহ্! কি চমৎকার শিক্ষা! ঠিক এইরূপ অর্থেই অপর একজন কবি বলিয়াছেনঃ

یاد داری که وقت زادن تو ـ همه خنداں بدند و تو گریاں
آنچناں زی که وقت مردن تو ـ همه گریاں شوند و تو خنداں

(ইয়াদ দারী কেহ্‌ ওয়াক্‌ত যাদানে তূ + হামা খান্দাঁ বুদান্দ ও তূ গিরয়াঁ
আঁচুনা যী কেহ ওয়াক্‌ত মুর্দানে তূ + হামা গিরয়াঁ শাওয়ান্দ ও তূ খান্দাঁ)

"স্মরণ আছে কি? তোমার জন্মগ্রহণের সময় সকলেই হাসিতেছিল আর তুমি কাঁদিতেছিলে। এখন তুমি এইভাবে জীবনযাপন কর যেন তোমার মৃত্যুতে সকলেই কাঁদে আর তুমি হাসিতে থাক।"

**একটি চমৎকার বিষয়বস্তু ঃ** অর্থাৎ, তোমার স্মরণ আছে কি ? যখন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তখন সকলেই হাসিতেছিল; কিন্তু তুমি কাঁদিতেছিলে। তাহারা যালেমই বটে। কারণ, তোমার ক্রন্দনেও তাহাদের দয়া হয় নাই। তাহারা তখনও হাসিতেছিল। এখন তুমি ইহার প্রতিশোধ এইভাবে লও যে, তোমার মৃত্যুর সময় তাহারা যেন কাঁদে এবং তুমি হাসিতে থাক। অর্থাৎ, এইভাবে জীবনযাপন কর—যাহাতে তোমার মৃত্যুতে সকলেই শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়ে এবং তুমি খোদার সহিত মোলাকাতের কথা ভাবিয়া আনন্দিত হও। তাহারা কাঁদিতে থাকিবে আর তুমি হাসিতে থাকিবে। এমন যেন না হয় যে, মৃত্যুর সময়ও সকলেই আপদ দূর হইল ভাবিয়া আনন্দিত হয় এবং তুমিও কৃত গোনাহ্‌সমূহের জন্য কাঁদিতে থাক। পূর্বোল্লিখিত কবিতার ন্যায় এই কবিতার মধ্যেও তুলনামূলক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, তোমার কান্না দেখিয়া যেরূপ সকলেই হাসিতেছিল, এখন তুমিও তদ্রূপ তাহাদের কান্না দেখিয়া হাসিতে হাসিতে দুনিয়া ত্যাগ কর এবং আখেরাতের আরাম-আয়েশ দেখিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিতে থাক ঃ

يَالَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ○ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ*

'হাঁ আমার কওম যদি জানিত যে, খোদা আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের তালিকাভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।' তাহারা ইহা জানিতে পারিলে কাঁদাকাটি ত্যাগ করিয়া দিত। পূর্বোল্লিখিত কবিতায়ও এইরূপ তুলনামূলক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, দ্বীনদারীতে রাজা-বাদশাহ্‌দিগকে পিছনে ফেলিয়া দাও—যেমন তাহারা তোমাদিগকে দুনিয়াদারীতে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে। আজকালকার রাজা বাদশাহ্‌রা হযরত ছাহাবীদের ন্যায় নয় যে, তাহাদিগকে পিছনে ফেলা কঠিন হইবে।

**ছাহাবীদের অবস্থা ঃ** ছাহাবা (রাঃ)-এর অবস্থা ছিল এইরূপ ঃ একদা দরিদ্র মুসলমানগণ হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে অভিযোগ পেশ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ধনীরা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। আমরা যেমন নামায রোযা যিকর ইত্যাদি করি, তাহারাও তদ্রূপ করে। অধিকন্তু তাহারা যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে এবং জেহাদে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে। আমরা এগুলি করিতে পারি না। ইহার উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন ঃ তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর— سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ এই ওযীফা রীতিমত পাঠ কর। ইহাতে তোমরা ধনীদের ছদ্‌কা-খয়রাত হইতেও বেশী সওয়াব পাইবে। ধনী ছাহাবীগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহারাও এই ওযীফা পাঠ করিতে লাগিলেন। গরীবরা আবার হুযূর (দঃ) -এর খেদমতে অভিযোগ লইয়া হাযির হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি আমাদিগকে যে ওযীফা

শিখাইয়াছিলেন, ধনীরাও তাহা পাঠ করিতে শুরু করিয়াছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, এখন আমি কি করিব? খোদার অনুগ্রহের দরজা তাহাদের সম্মুখে আমি কিরূপে বন্ধ করিয়া দিবঃ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ 'ইহা খোদার অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করেন।

মালদার ছাহাবাগণ সর্বদাই দ্বীনদারীর উন্নতির পিছনে লাগিয়া থাকিতেন। তাঁহারা যখনই কোন নেক কাজের সংবাদ অবগত হইতেন, সকলের আগে উহা করার চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদিগকে দ্বীনদারীতে পিছনে ফেলিয়া দেওয়া গরীবদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাঁহাদের নিকট যদিও প্রচুর পরিমাণে মালদৌলত ছিল; কিন্তু তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও মনের টান ছিল না।

জনৈক ছাহাবী মৃত্যুকালে অঝোরে কাঁদিতেছিলেন। অন্যান্যরা তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন যে, খোদার ফযলে তুমি হযরতের সঙ্গী হইয়া অমুক অমুক জেহাদে শরীক হইয়া খোদার পথে ইসলামের বহু খেদমত করিয়াছ। ইনশাআল্লাহ্ হক তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করিবেন। অতএব, কান্নাকাটি করিয়া মন হাল্‌কা করিও না। তিনি উত্তরে বলিলেন, রাসূলে খোদা (দঃ)-এর আমলে আমরা খুবই নিঃস্ব ছিলাম। ওসমান ইবনে মায্‌ঊনের এন্তেকাল হইলে কাফনের জন্য মাত্র একটি ছোট কম্বল ছিল। উহা দ্বারা মাথা ঢাকিলে পা খোলা থাকিত। আর পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকিত। হুযূর (দঃ) নির্দেশ দেন যে, কম্বল দ্বারা মাথা ঢাকিয়া দাও এবং লতা-পাতা দ্বারা পা ঢাকিয়া দাও। অথচ আজ আমাদের কাছে এত মালদৌলত রহিয়াছে যে, মাটি ছাড়া উহার অন্য কোন জায়গা নাই।

ছাহাবীর এই উক্তির দুই রকম অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। (১) জমিনে পোঁতিয়া ফেলা ব্যতীত এই মালদৌলতের অন্য কোন জায়গা নাই। (২) দালান-কোঠা নির্মাণে ব্যয় করা ব্যতীত এই টাকা-পয়সা অন্য কোন কাজে আসিবে না। ইহাতে বুঝা গেল যে, ছাহাবীগণ অতিরিক্ত টাকা-পয়সা জমা হইয়া গেলে আনন্দিত না হইয়া বরং ক্রন্দন করিতেন।

বন্ধুগণ, এই জাতীয় ধনীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ছূফীগণ মতভেদ করিয়াছেন যে, ছবর উত্তম, না শোকর (কৃতজ্ঞতা) উত্তম? ছূফীদের উক্তিতে শাকের (কৃতজ্ঞ) বলিয়া ছাহাবীদের ন্যায় ব্যক্তিকেই বুঝানো হইয়াছে। আমাদের ন্যায় হারামখোর ধনীদিগকে বুঝান হয় নাই। আমরা অহরহ খোদার নেয়ামত ভোগ করিয়া পাপ কাজে আরও বেশী উৎসাহী হইয়া পড়ি। আমাদের যুগের ধনীদিগকে দেখিলে ছূফীগণ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা ধৈর্যশীল ব্যক্তিকেই উত্তম বলিতেন। (তবে কোন কোন ধনী ইহা হইতে স্বতন্ত্র)

এমতাবস্থায় আজকালের ধনীদিগকে ধর্ম বিষয়ে পিছনে ফেলিয়া যাওয়া মোটেই কঠিন নহে। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় না। আমরা যেমন দুনিয়াদারীতে ধনীদের পিছনে তদ্রূপ ধর্ম বিষয়েও তাহাদের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর নই। বিশেষ করিয়া আলেমদের এ বিষয়ে অবশ্যই লজ্জা হওয়া উচিত। তাহাদের কর্তব্য হইল—ধনীগণ যেরূপ দুনিয়ার ব্যাপারে উন্নতি করিতে ক্লান্ত হয় না, তদ্রূপ তাহাদেরও দ্বীনদারীর উন্নতিতে অক্লান্ত চেষ্টা করা। আমি যে আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাতে ইহার একটি সহজ পন্থা বর্ণিত হইয়াছে।

**তাকওয়ার ব্যাখ্যাঃ** আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

'হে বিশ্বাসীগণ! খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।' ইহাতে প্রথমতঃ তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক উদ্দেশ্য অর্জনের বেলায় উহার উচ্চস্তরই লক্ষ্য হইয়া থাকে। এখন প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাকওয়া ধর্মের উচ্চ স্তর কিনা। কোরআন ও হাদীসে মনোনিবেশ করিলে এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। কোরআন শরীফে তাকওয়ার নির্দেশ ও উহার ফযীলত সম্ভবতঃ অন্যান্য বিষয় হইতে অনেক বেশী উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। শরীঅতে তাকওয়া শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভয় করা ও বাঁচিয়া থাকা। গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাই তাকওয়ার আসল উদ্দেশ্য, তবে উহার কারণ হইল ভয় করা। কেননা, অন্তরে কোন জিনিসের প্রতি ভয় থাকিলেই মানুষ উহা হইতে বাঁচিয়া থাকে। اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً আয়াতে তাকওয়া ভয় করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বাঁচিয়া থাকা অর্থে বহু আয়াত ও হাদীসে ব্যবহৃত হইয়াছেঃ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'এক টুকরা খেজুর দান করিয়া হইলেও জাহান্নাম হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা কর।' এই হাদীসে 'তাকওয়া' বাঁচিয়া থাকা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মোটকথা, উভয় অর্থে তাকওয়া শব্দের ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাই 'তাকওয়ার' আসল উদ্দেশ্য। ভয় করা সাধারণতঃ আসল উদ্দেশ্য নহে; বরং উহা গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায় ও কারণ মাত্র। নিম্নোক্ত হাদীস ইহার দলীল। হুযূর (দঃ) এইরূপ দো'আ করিতেনঃ

وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ

"হে খোদা! আমি তোমার নিকট তোমার এই পরিমাণ ভয় প্রার্থনা করি, যাহা আমার মধ্যে ও গোনাহের মধ্যে আড়াল হয়।" ইহাতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ ভয় উদ্দেশ্য নহে। কেননা, যাহা উদ্দেশ্য, তাহার প্রত্যেকটি স্তর কাম্য হইয়া থাকে। হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, ভয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই কাম্য। ঐ সীমার অতিরিক্ত কাম্য নহে। এই সীমা হইল, যে পরিমাণ ভয় গোনাহ্‌র মধ্যে আড়াল হইতে পারে সেই পরিমাণ লাভ করা। হুযূর (দঃ) এই হাদীসে مَاتَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ কথাটি যুক্ত করিয়া এমন একটি তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, যাহা আধ্যাত্মপথের পথিকগণ বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার পর জানিতে পারে। হুযূর (দঃ) এই বিষয়টি মাত্র দুইটি শব্দে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই তত্ত্ব হইল, বাহ্যতঃ খোদার ভয় খুব ভাল জিনিস বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ইহা যত বেশী হইবে ততই মঙ্গল। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা গিয়াছে যে, খোদা-ভীতি সীমা ছাড়াইয়া গেলে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

প্রথমতঃ, বেশী ভীতির কারণে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সর্বদাই চিন্তায় ডুবিয়া থাকে। স্বাস্থ্যের ত্রুটি দেখা দিলে স্বভাবতঃই আমলে ত্রুটি না হইয়া পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ভীত ব্যক্তিকে দেখিয়া অন্যান্য মুসলমানদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা মনে করিতে বাধ্য হয় যে, খোদাকে রাযী করা বড় কঠিন ব্যাপার, সর্বদা চিন্তার অনলে দগ্ধ হইতে হয়।

তৃতীয়তঃ, খোদা-ভীতি সীমাতিরিক্ত প্রবল হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খোদার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, নৈরাশ্য কুফরের নামান্তর। তাছাড়া নিরাশ হওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। সে মনে করে, যখন আমি খোদার রহমতের যোগ্যই নহি, তখন এত পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? ফলে সে সমস্ত কাজকর্ম ছাড়িয়া দেয়।

www.almodina.com

খোদা-ভীতি প্রবল হইয়া গেলে উপরোক্ত অনিষ্টসমূহ দেখা দেয়। তখন আধ্যাত্মপথের পথিক উপলব্ধি করিতে পারে যে, ভীতির সকল স্তরই কাম্য নহে। কিন্তু হযরত (দঃ) মাত্র দুইটি শব্দের মাধ্যমে ইহার স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন।

অতএব, প্রমাণিত হইল যে, তাকওয়ার আসল উদ্দেশ্য হইল গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা। ইহা যে ধার্মিকতা তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা, যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি পালন করা এবং সমস্ত হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা ইত্যাদি সবকিছুই এই তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। শরীঅতের কোন উদ্দেশ্যই ইহার গন্ডীর বাহিরে নয়। নামাযও পড়িতে হইবে, কেননা, নামায ছাড়িয়া দেওয়া গোনাহ্। যাকাতও দিতে হইবে, কারণ, যাকাত না দেওয়াও গোনাহ্। এইরূপে সমস্ত আদিষ্ট কাজকর্ম পালন না করাও গোনাহ্। অতএব, বুঝা গেল যে, এই তাকওয়ার মধ্যে যাবতীয় আদিষ্ট বিষয় পালন করারও নির্দেশ আছে এবং সমুদয় হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকারও তাকিদ আছে। বলা বাহুল্য, এই দুইটিই হইতেছে পূর্ণ ধার্মিকতার অঙ্গ। অতএব, তাকওয়া যে পূর্ণ ধার্মিকতা ইহাতে কোন সন্দেহ রহিল না।

তাকওয়া যে পূর্ণ ধার্মিকতা তৎসম্বন্ধে আরও একটি দলীল আছে। তাহা হইল এই হাদীসঃ اَلَا اِنَّ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى صَدْرِهٖ "রাসূলে খোদা (দঃ) আপন পবিত্র বক্ষের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, শুন! তাকওয়া এখানে নিহিত আছে।" অর্থাৎ, তাকওয়ার স্থান হইল অন্তর। এই হাদীসের সহিত আরও একটি হাদীস যোগ করুনঃ

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ○

অর্থাৎ, "দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে। উহা ঠিক থাকিলে সমস্ত দেহই ঠিক থাকে। আর উহা বিগড়াইয়া গেলে সমস্ত দেহই বিগড়াইয়া যায়। জানিয়া রাখ, উহা হইল অন্তর।"

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্তরের সংশোধনই কামেল সংশোধন। আর প্রথমোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তাকওয়ার আসল আবাসস্থল অন্তর। কাজেই তাকওয়া দ্বারা অন্তরের সংশোধন হয়। অতএব, এই দুই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাকওয়া হইলে পূর্ণ সংশোধনও হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই পূর্ণ সংশোধনই হইল পূর্ণ ধার্মিকতা। এইভাবে তাকওয়ার অর্থ পূর্ণ ধার্মিকতা হওয়া প্রমাণিত হইয়া গেল।

হাদীসে অন্তরকে তাকওয়ার আবাসস্থল বলার কারণ এই যে, খোদা-ভীতির কারণেই তাকওয়া (গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা) লাভ হইয়া থাকে। আর অন্তরই খোদা-ভীতির প্রকৃত বাসস্থল। এ পর্যন্ত আয়াতের প্রথমভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

**ছাদেকীন (সত্যবাদীগণ)-এর ব্যাখ্যাঃ** দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ, كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ "সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও" সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে, ইহা প্রথম অংশে বর্ণিত উদ্দেশ্যটি হাছিল করার একটি উপায়। ইহার সারকথা হইল মোত্তাকী (খোদাভীরু)-দের সঙ্গ লাভ করা। আয়াতে ছাদেকীন শব্দের অর্থ কামেলীন (পূর্ণ ধার্মিকগণ)। এখানে ছাদেকীন শব্দ দ্বারা উহার প্রসিদ্ধ অর্থ —(যাহারা সত্য কথা বলে) বুঝান হয় নাই; বরং উহা দ্বারা পরিপক্ক ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে বুঝানো হইয়াছে। আমাদের পরিভাষায়ও 'পাক্কা' ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলা হয়। এই অর্থেই হক তা'আলা কোন কোন পয়গম্বরকে 'ছিদ্দীক' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا *

"ইব্‌রাহীমকে স্মরণ কর। তিনি ছিদ্দীক (পরিপক্ক) ও নবী ছিলেন।" মর্যাদা হিসাবে নবীর পরেই ছিদ্দীকের স্থান। এর পর শহীদ, এর পর ছালেহ। এক আয়াতে হক তা'আলা উক্ত শ্রেণী-সমূহকে এইরূপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

এই সমস্ত লোক খোদার নেয়ামতপ্রাপ্তদের অর্থাৎ নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহীনদের সহিত বসবাস করিবে। সঙ্গী হিসাবে তাঁহারা খুবই উত্তম।

ধর্মে পরিপক্ক হওয়া মানেই ধর্মে পূর্ণতা অর্জন করা। সুতরাং ছাদেকীন অর্থ যে কামেলীন, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। আরও একখানি আয়াত হইতে ইহার দলীল পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ الخ বরং অভূতপূর্বভাবে এই আয়াত হইতে আমার উভয় দাবী প্রমাণিত হইতেছে। অর্থাৎ, তাকওয়া ও ছিদক উভয়টির অর্থ পূর্ণ ধার্মিকতা। পূর্ণ আয়াত এইরূপঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

"তোমরা আপন মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া লইবে—ইহাতেই সমস্ত নেকী সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু (প্রকৃত) নেকী হইল—যে ব্যক্তি খোদার অস্তিত্ব ও গুণাবলীর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফেরেশতাদের (অস্তিত্বের) প্রতি, আসমানী কিতাবের প্রতি এবং সকল পয়গম্বরদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। আর খোদার মহব্বতে আপন (অভাবগ্রস্ত) আত্মীয়দিগকে, (নিঃস্ব) এতীমদিগকে, অন্যান্য দরিদ্রদিগকে, (রিক্তহস্ত) মুসাফিরদিগকে, (অপারগ অবস্থায়) যাচ্ঞাকারীদিগকে এবং (বন্দী ও গোলামদিগকে) মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়। যাহারা (কোন জায়েয কাজের) অঙ্গীকার করিয়া উহা পূর্ণ করে এবং যাহারা অভাব-অনটনে, অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যশীল উহারাই সত্যবাদী এবং উহারাই তাকওয়া অবলম্বনকারী।"

মোটকথা, যাহারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী, তাঁহারাই সত্যবাদী ও মোত্তাকী। ধর্মের যাবতীয় অঙ্গসমূহ এই আয়াতে মোটামুটি উল্লিখিত হইয়াছে। কোন অঙ্গ বাদ পড়ে নাই। সুতরাং এই গুণসমূহই হইতেছে পূর্ণ ধার্মিকতা। সর্বশেষ আয়াতে এইসব গুণের অধিকারীদিগকে সত্যবাদী ও মোত্তাকী বলায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পূর্ণ ধার্মিক হইলেই মোত্তাকী ও ছাদেক হওয়া যায়। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, তাকওয়া ও ছিদ্‌ক মানেই পূর্ণ ধার্মিকতা।

www.almodina.com

**উক্ত নেকীর আয়াতের তফ্সীর ঃ** উদ্ধৃত আয়াতসমূহে ধর্মের যাবতীয় অঙ্গই উল্লিখিত হইয়াছে কিনা, এক্ষণে তাহাই অনুধাবন করুন। শরীঅতে যে সমস্ত আদেশ নিষেধ রহিয়াছে, উহাদের সারমর্ম হইল তিনটি বিষয় ঃ (১) আকায়েদ, (২) আমল, (৩) চরিত্র। যাবতীয় খুঁটিনাটি মাসআলা মাসায়েল এই তিনটি বিষয় হইতেই উদ্ভূত। বর্ণিত আয়াতে এই তিনটি বিষয়ের প্রধান প্রধান বিভাগগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া এই আয়াতখানি 'ব্যাপক অর্থ-বোধক' বাক্যাবলীর অন্যতম। لَيْسَ الْبِرَّ এখানে بر অর্থ নেকী। ইহার সহিত (ال) আলিফ ও লাম যুক্ত করা হইয়াছে বিশেষ নেকী বুঝাইবার জন্য। কাজেই আয়াতের অর্থ হইবে—পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া লওয়াই যথেষ্ট নেকী নহে যে, ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট হওয়া যায়। আয়াতে প্রশ্ন হইতে পারিত যে, কেবলা মুখ হওয়া শরীঅতের নির্দেশ এবং শরীঅতের আদিষ্ট কাজ তো নেকী হওয়া অনিবার্য। তাসত্ত্বেও আয়াতে নেকী নহে বলা হইল কেন? উপরোক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর হইয়া গিয়াছে। অন্যান্যরা এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নরূপে দিয়াছেন। কিন্তু আমার বর্ণিত উত্তরটি সবচাইতে সহজ; উত্তরটি এই মুহূর্তেই আমার মনে জাগিয়াছে। ইহার সারমর্ম এই যে, আয়াতে কেবলামুখী হওয়া যে একেবারেই নেকী নহে, তা বলা উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহা যে, যথেষ্ট নেকী নহে তাহাই উদ্দেশ্য।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন জাগে যে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানো যথেষ্ট নেকী নহে—এই বিষয়টি কেন বর্ণনা করা হইল? উত্তর এই যে, ইহার পূর্বে কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারটি বর্ণনা করা হইয়াছে। কাফের ও মুশরিকদল ইহা লইয়া ব্যাপক হট্টগোল আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা জোরেসোরে প্রচার করিত যে, মুসলমানদের ধর্ম বেশ অদ্ভুত বৈচিত্রময় ধর্ম। তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে মুখ ফিরায়। ইহাতে হক তা'আলা কাফেরদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা এই আলোচনায় এমনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছ যে, মনে হয়, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোই ধর্মের বড় ও প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ ইহা উদ্দেশ্য নহে; বরং একটি উদ্দেশ্যের শর্ত বা উপায়সমূহের মধ্যে গণ্য। অতএব, উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া—উদ্দেশ্য নহে—এমন বিষয় লইয়া আলোচনায় মাতিয়া উঠা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহে। পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করা যথেষ্ট নেকী নহে; বরং যাহা যথেষ্ট নেকী, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। উহা পালন করিতে যত্নবান হও।

আয়াতে অন্যান্য দিকগুলিকে বাদ দিয়া শুধু পূর্ব ও পশ্চিম দিককে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। ইহার উদ্দেশ্য এই নয় যে, কেবলা কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম দিকদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা, যে সব দেশ হইতে মক্কা শরীফ উত্তর দিকে অবস্থিত, ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসীদের কেবলা উত্তর দিকে। তদ্রূপ যে স্থান হইতে মক্কা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, সে স্থানের কেবলা দক্ষিণ দিক। মদীনাবাসীদের কেবলা দক্ষিণ দিক। এই জন্য হাদীসে তাহাদের জন্য شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রস্রাব-পায়খানার সময় পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, কেবলা পূর্ব বা পশ্চিম দিকেই সীমাবদ্ধ নহে। তা সত্ত্বেও আয়াতে বিশেষ করিয়া এই দুইটি দিককে উল্লেখ করার সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, সকল দিক হইতে এই দুইটি দিক জনসমাজে প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন এইগুলি উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন অন্যান্য দিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

www.almodina.com

তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে পার্থক্য বাহ্যতঃ একটি অপরটির বিপরীত হওয়ার কারণে অধিক সুস্পষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে সর্বপ্রথম এই দুইটি দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। এর পর ইহাদের সাহায্যে আমরা অন্যান্য দিক সম্বন্ধে জ্ঞাত হই। পূর্ব ও পশ্চিম দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ উত্তর ও দক্ষিণ দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নহে। প্রত্যেকেই জানে যে, যে দিক হইতে সূর্য উঠে, উহা পূর্বদিক এবং যে দিকে অস্ত যায়, উহা পশ্চিম দিক। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম দিক জানা ব্যতীত উত্তর ও দক্ষিণ দিক জানা যায় না। তাই উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পরিচয় দিতে যাইয়া এইরূপ বলা হয়ঃ পূর্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে ডান হাত যে দিকে থাকে, উহা দক্ষিণ দিক এবং বাম হাত যে দিকে থাকে, উহা উত্তর দিক। অতএব, পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইল মূল দিক এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইল শাখা দিক। মূল দিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলে শাখা দিক যে হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদ্ব্যতীত নামাযে সামান্য দিকভ্রষ্টতা ক্ষতিকর নহে। যাহাদের কেবলা পূর্বদিক, তাঁহারা যদি সামান্য উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে বক্র হইয়া যায়, তবে উহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। এই হিসাবে দেখিলে আয়াতে উত্তর ও দক্ষিণ দিক বাদ পড়ে নাই; বরং পূর্ব ও পশ্চিমের সহিত গৌণভাবে ইহাদেরও উল্লেখ আছে।

মোটকথা, যে কোন দিকে মুখ করা যথেষ্ট নেকী নহে। যথেষ্ট নেকী পরে উল্লিখিত হইয়াছে وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ الخ অর্থাৎ, খোদার প্রতি ঈমান আনা............ ইত্যাদি। এই আয়াতের ব্যাখ্যা দুই প্রকারে করা যায়ঃ (১) مسند اليه -এর দিকে مضاف কে উহ্য মানিয়া, অর্থাৎ ولكن ذا البر من امن بالله الخ এবং (২) مسند -এর দিকে مضاف কে উহ্য মানিয়া। অর্থাৎ, ولكن البر بر من امن بالله الخ উভয় ব্যাখ্যারই সার এক।

**আকায়েদের বর্ণনাঃ** আয়াতে 'যথেষ্ট নেকী'র বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যত মাসায়েল আছে, সবগুলির প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনা প্রসঙ্গে পুরস্কার, শাস্তি, হিসাব-কিতাব, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদির মাসায়েল আসিয়া গিয়াছে। والملئكة 'ফেরেশতা-দের উপর ঈমান আনে'—ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ প্রসঙ্গে যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবে বিশেষ করিয়া ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, শরীঅত সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে তাহারাই নির্ভরযোগ্য মধ্যস্থল বা মাধ্যম والكتاب অর্থাৎ, 'আসমানী কিতাবে ঈমান আনে'—এখানে কিতাব শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ আসমানী কিতাব অনেক এবং সবগুলির উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। (অবশ্য রহিত কিতাবের উপর আমল করা জায়েয নহে।) এই কারণেই অন্যান্য আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমনঃ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ الخ কিন্তু এখানে একবচন ব্যবহার করিয়া এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই কোরআন এমন ব্যাপক যে, ইহাতে সমস্ত আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তুর সমাবেশ রহিয়াছে। কাজেই ইহার উপর ঈমান আনিলে সবগুলির উপর ঈমান আনা হইবে। এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, প্রত্যেক আসমানী কিতাব অপর আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনিতে নির্দেশ দেয়। সুতরাং সবগুলি মিলিয়া যেন একই কিতাব এবং সবগুলির উপর ঈমান আনা এক কিতাবের উপর ঈমান আনার ন্যায়। কেহ এক কিতাব মানিয়া অন্য কিতাব অস্বীকার করিলে সে প্রকৃতপক্ষে কোন কিতাবই মানে না। কিন্তু শুধু ঈমান আনা সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। সকল কিতাবের উপর আমল করা

www.almodina.com

জায়েয নহে। আমল শুধু সর্বশেষ কিতাবের উপরই করিতে হইবে। কেননা, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে 'মনসুখ' (রহিত) করিয়া দিয়াছে। والنبيين 'এবং পয়গম্বরদের প্রতিও ঈমান আনে'। এই পর্যন্ত মৌলিক আকায়েদ বর্ণিত হইয়াছে। এর পর আমল ও চরিত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

**আমলের প্রকারভেদঃ** শরীঅতের আমল দুই প্রকার। (১) এবাদত ও (২) পারস্পরিক ব্যবহার। ইহাও দুই প্রকার। একটির সম্পর্ক ধনদৌলতের সহিত ও অপরটির সম্পর্ক অন্যান্য বিষয়ের সহিত। যেমন—বিবাহ, তালাক, ক্রীতদাসকে মুক্ত করা, অপরাধীদিগকে শাস্তি দান ইত্যাদি। এবাদতও দুইভাগে বিভক্ত। শারীরিক এবাদত ও আর্থিক এবাদত। তদ্রূপ চরিত্রও দুই প্রকার। সচ্চরিত্রতা ও অসচ্চরিত্রতা। সচ্চরিত্রতা অর্জন ও অসচ্চরিত্রতা বর্জন শরীঅতের কাম্য। আয়াতে আকায়েদের বর্ণনার পর এবাদতের মৌলিক বিষয়গুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আর্থিক এবাদতকে প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, অনেকেই শারীরিক এবাদতের বেলায় সাহসিকতার পরিচয় দেয়, কিন্তু আর্থিক এবাদতের সময় তাহাদের অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

گر جاں طلبی مضائقہ نیست – گر زر طلبی سخن درین ست

(গর জান তলবী মুযায়াকা নীস্ত + গর যর তলবী সখুন দরীনাস্ত)

অর্থাৎ, "যদি প্রাণ চাও বিনা দ্বিধায় দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যদি টাকা পয়সা চাও, তবে ইহাতে কথা আছে।"

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ "এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়দিগকে ধনসম্পদ দান করে।" এখানে على حبه -এর সর্বনামটি যদি الله শব্দের দিকে ফিরে, তবে এখানে চরিত্রশাস্ত্রের একটি বড় মূলনীতি ব্যক্ত হইয়াছে বলা যায়। অর্থাৎ, খোদার পথে খোদার মহব্বতেই মাল দান করা উচিত। অতএব, আয়াতে দুইটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছেঃ (১) খোদার সহিত মহব্বত সৃষ্টি করা উচিত। শুধু আইনগত সম্পর্ক রাখা উচিত নহে। (২) এখলাছ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং দান করার সময় রিয়া ও প্রশংসা লাভের আশা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এখলাছ আধ্যাত্মিক চরিত্রেব একটি বড় স্তম্ভ।

আর যদি সর্বনামটি مال শব্দের দিকে ফিরে, তবে অর্থ হইবে—যে মালের প্রতি মহব্বত ও মনের টান থাকে, তাহা খোদার পথে ব্যয় করে। এমতাবস্থায় প্রথমতঃ, ইহাতে ব্যয় করার আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, খোদার পথে উত্তম মাল ব্যয় করা উচিত, নিকৃষ্ট মাল খরচ করা অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ, তাছাউফ শাস্ত্রের একটি মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, মালকে মহব্বত করা একটি হীন স্বভাব। ইহার প্রতিকার এই যে, কোন মালের প্রতি মহব্বত জন্মিলেই উহা খোদার পথে দান করিয়া দাও। কয়েকবার এরূপ করিলে মালকে মহব্বত করার রোগটি সারিয়া যাইবে।

বিবি-বাচ্চার ভরণ-পোষণ করা পুরুষের উপর ওয়াজিব। অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের খেয়াল রাখা এবং তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কিছু কিছু দান করা মোস্তাহাব। ذوى القربى শব্দ দ্বারা সকল প্রকার আত্মীয়বর্গকে বুঝানো হইয়াছে।

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ "এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদিগকেও দান করে।" ইহা নফল দান-খয়রাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাকাতের কথা পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে দুইটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম প্রশ্ন এই যে, আর্থিক এবাদতকে শারীরিক এবাদতের পূর্বে উল্লেখ করা হইল কেন? ইহার উত্তর পূর্বেও দেওয়া হইয়াছে যে, কোন কোন লোক খুব বেশী কৃপণ হইয়া থাকে। তাহারা শারীরিক এবাদতে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দেয়; কিন্তু অর্থ দান করার বেলায় গা বাঁচাইয়া চলে। কাজেই গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে প্রথমে আর্থিক এবাদতকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আর্থিক এবাদতের মধ্যেও নফল দান খয়রাতকে ওয়াজিব দান-খয়রাত তথা যাকাতের পূর্বে উল্লেখ করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, কোন কোন লোক খোদার সহিত শুধু আইনগত সম্পর্ক রাখিতে চায়। তাহারা ফরয যাকাত ব্যতীত অন্য কোনরূপ দান-খয়রাত করে না। এরূপ করা গোনাহ্ নহে সত্য, কিন্তু নিঃসন্দেহে খোদার সহিত দুর্বল সম্পর্কের পরিচায়ক। এই জন্য নফল দান-খয়রাতের কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়া হক তা'আলা ইঙ্গিত করিলেন যে, যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হেতু ইহা তো দিবেই—তৎসহ মাঝে মাঝে কিছু কিছু দান-খয়রাতও করা উচিত।

দেখুন, যদি কোন প্রিয়জন বা কোন বাদশাহ্ আমাদিগকে বলে, এই ব্যাপারে তোমরা দুই টাকা ব্যয় কর। চিন্তা করুন, তখন আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে কি? তখন আমরা দুইটি টাকা খরচ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না; বরং প্রিয়জন বা বাদশাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বা তাঁহার দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হওয়ার জন্য দুই-এর স্থলে দশ টাকা খরচ করিয়া ফেলিব। অতএব, খোদার সহিত শুধু আইনগত সম্পর্ক রাখা উচিত নহে।

এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য নফল দানকে ওয়াজিব দান এমন কি শারীরিক এবাদত অর্থাৎ, নামাযেরও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর যখন যাকাতের বর্ণনা আসিয়াছে, তখন আবার নামাযকে যাকাতের আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাতে বুঝা যায় যে, মর্যাদার দিক দিয়া নামাযই যাকাত হইতে উত্তম। তবে নামায ও যাকাতের পূর্বে আর্থিক ছদকার উল্লেখের পিছনে গুরুত্ব বুঝানই উদ্দেশ্য—মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে। আর্থিক এবাদত হইতে নামাযের মর্যাদা বেশী এবং আর্থিক নফল ছদকা হইতে যাকাতের মর্যাদা অধিক। সোব্‌হানাল্লাহ্, খোদার কালামে প্রত্যেক বিষয়ের মর্যাদার প্রতি কত লক্ষ্য রাখা হইয়াছে! এই সব কারণেই এই কালাম দেখিয়া মানব-বুদ্ধি ঘুরপাক খাইতে থাকে। মানুষের পক্ষে এতসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাস্তবিকই অসম্ভব।

وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ 'যাজ্ঞাকারীদিগকে দান করে এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার ব্যাপারেও অর্থ ব্যয় করে।' ইহাও নফল দান-খয়রাতের এক অংশ। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র যাহারা অপারগ অবস্থায় যাজ্ঞা করে এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানাইয়া না লয়, তাহাদিগকেই দান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা সবল দেহের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানাইয়া লয়, তাহাদিগকে দান করা জায়েয নহে, তাহাদের জন্য ভিক্ষা চাওয়াও জায়েয নহে।

এই যুগে হযরত মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ) সর্বপ্রথম এই মাসআলাটির প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি একদিন বলিলেন, একটি মাসআলা বলিতেছি। জানি, ইহাতে প্রচুর গালি খাইতে হইবে। সত্যসত্যই এই মাসআলাটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই চতুর্দিক হইতে আপত্তি ও নিন্দাবাদের বান বর্ষিত হইতে থাকে। কেহ বলিল, ইহার অর্থ হইল কোন ভিক্ষুককে কিছু দান

করিও না, সব আমাকে দান কর। আবার কেহ বলিল, নূতন মৌলবী আবির্ভূত হইয়াছেন। নতুবা আজ পর্যন্ত কেহ এই সব ভিক্ষুকদের দান করাকে হারাম বলে নাই।

**আশেকের মর্যাদাঃ** কিন্তু মাওলানা তো আল্লাহ্‌র শরীঅতের আশেক ছিলেন। আশেক কখনও গালিগালাজের পরওয়া করে না। কবি চমৎকার বলিয়াছেনঃ

گرچہ بدنامیست نزد عاقلاں ـ ما نمی خواہیم ننگ و نام را

(গরচে বদনামীস্ত নযদে আকেলাঁ + মা নামী খাহেম নঙ্গ ও নাম রা)

"যদিও ইহা জ্ঞানীদের নিকট বদনামী, কিন্তু আমরা বদনামী ও নেকনামীর আকাঙ্ক্ষা করি না।" এই অর্থেই উর্দুতেও একটি কাব্য পংক্তি আছে। তবে উহা কবিত্বের দিক দিয়া অনেক নিম্ন মানের। জানি না, ফারসী কবিতার সম্মুখে উর্দু কবিতা এত নিরস মনে হয় কেন? আলোচ্য বিষয়ের সহিত মিল থাকায় পংক্তিটি পড়িয়া দিতেছিঃ

عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا ـ اور جو خود ناکام ہو اسکو کسی سے کام کیا

"অপমানিত আশেকের আবার দুর্নাম ও সুনামের পরওয়া কিসের? যে নিজেই অকৃতকার্য তাহার আবার পরের সহিত কি সংস্রব?"

অকৃতকার্যতার অর্থ হযরত হাজী সাহেব (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা উচিত। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, ভাই! যাহারা কৃতকার্য হইতে চায়, তাহারা অন্য কোন বুযুর্গের নিকট গমন করুন। পক্ষান্তরে যাহারা অকৃতকার্য হইতে চান, তাহারা আমার নিকট আসুন। এর পর তিনি খুব আস্তে বলিলেন, অকৃতকার্যতার অর্থ কি জান? ইহার অর্থ হইল এশক। কারণ, আশেক প্রেমাস্পদের অন্বেষণ ও আগ্রহের আতিশয্যের কারণে প্রত্যেক স্তরে নিজকে অকৃতকার্যই মনে করে। কোন অবস্থা ও স্তরে পৌঁছিয়াও সে সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে না। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ থাকে। ফলে সে সব সময়ই অকৃতকার্য অবস্থায় থাকে। এই কারণেই চিশ্‌তিয়া তরীকায় সিদ্ধি লাভের পরও বিরহ জ্বালার পরিসমাপ্তি হয় না। তবে তাহা শুধু দুনিয়াতেই। এখানে মিলন হইতে পারে না বলিয়া তৃপ্তি লাভ হয় না। কিন্তু আখেরাতে তৃপ্তি লাভ হইয়া যাইবে।

জনৈক সাহেবে হাল ছুফী বলেনঃ

اِنَّ فِی الْجِنَانِ جَنَّةٌ لَّيْسَ فِيْهَا حُوْرٌ وَّلَا قُصُوْرٌ وَّلٰكِنَّ فِيْهَا اَرِنِیْ اَرِنِیْ

"জান্নাতসমূহের মধ্যে একটি জান্নাত আছে, যাহাতে কেবল হুর বা প্রাসাদ নাই। তথায় যাহারা বসবাস করিবে, তাহারা সর্বদাই হক তা'আলার নিকট শুধু 'দেখা দাও, দেখা দাও' নিবেদন করিতে থাকিবে।"

অনেকেই ভুলবশতঃ এই উক্তিটিকে হাদীস মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা জনৈক ছুফীর উক্তি। তাহাও আবার ভ্রান্তিপূর্ণ। আমার মনে হয়, এই ছুফী জান্নাতকে দুনিয়ার ন্যায় মনে করিয়াছে। জান্নাতে তো প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী প্রেমাস্পদের মিলন লাভ করিবে। ফলে পুরাপুরি সান্ত্বনা লাভ হইবে এবং কোনরূপ ব্যাকুলতা বাকী থাকিবে না। কোরআনের আয়াতের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জান্নাতে মোটেই কোনরূপ কষ্ট ও ব্যাকুলতা থাকিবে না। আশেকের প্রাণ তো আখেরাতের আশায়ই দুনিয়ার দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছে। যদি সেখানেও ব্যাকুলতা থাকে এবং সান্ত্বনা না হয়, তবে ইহার ন্যায় চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যর্থতা আর কি হইতে পারে?

www.almodina.com

অথচ বিভিন্ন আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, জান্নাতে কোনরূপ দুঃখ-বেদনা থাকিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ○

"জান্নাতে তোমাদের মনের আকাঙ্ক্ষিত সবকিছুই রহিয়াছে এবং তথায় তোমরা যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।"

দুনিয়াতে যেহেতু স্বভাবগত কারণে মিলন সম্ভব নহে—এইজন্য এখানে পুরাপুরি সান্ত্বনা হয় না, দুনিয়াতে মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি পূর্ণ মিলন বরদাশ্‌ত করিতে পারে না। কিন্তু আখেরাতে বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে। খোদার সহিত সম্পর্কশীল ব্যক্তিগণ দুনিয়াতেও মিলন লাভ করেন। তবে উহাকে প্রকৃত মিলন বলা যায় না; বরং উহা এক প্রকার উপস্থিতি। তাহাও আবার কোন সময় লাভ হয় এবং কোন সময় হয় না। তাই সাধক শীরাযী বলেনঃ

در بزم دور يك دو قدح دركش و برو ـ يعنى طمع مدار وصال دوام را

(দর বাযমে দওর এক দো কাদাহ্ দরকাশ ও বেরু + ইয়ানী তামা' মদার বেছালে দাওয়াম রা)

"শরাবের মজলিসে দুই এক পেয়ালা পান করিয়া চলিয়া যাও। অর্থাৎ, চিরমিলনের আশা করিও না।"

মোটকথা, আমি বলিতেছিলাম যে, আশেক দুর্নাম, অপমান ও গালিগালাজের পরওয়া করে না। তাই হযরত গঙ্গুহী (রঃ)ও ইহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। ফকীহগণও পরিষ্কার উল্লেখ করিয়াছেন যে, যাহারা অলিতে গলিতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং ইহাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম। তাহাদিগকে কিছু দান করিলে তাহারা ভবিষ্যতে আরও ভিক্ষা করিতে উৎসাহিত হইয়া পড়ে। কাজেই তাহাদিগকে দান করা হারাম, ভিক্ষাবৃত্তিতে সাহায্য করার শামিল এবং হারামের সাহায্য করাও হারাম। অতএব, বলিষ্ঠ ও সবল লোকদের পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম এবং তাহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়াও হারাম।

وَفِى الرِّقَابِ ইহাতে কয়েদী ও ক্রীতদাস মুক্ত করার কথা বলা হইয়াছে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাও এই পর্যায়ভুক্ত।

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ "এবং নামায পাবন্দির সহিত পড়ে এবং যাকাত আদায় করে।" এখানে মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাকাতকে নামাযের পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

**বান্দার হকের প্রকারভেদঃ** এ পর্যন্ত আয়াতে শারীরিক ও আর্থিক এবাদতের প্রধান বিষয়গুলি বর্ণিত হইল। এর পর বান্দার হক উল্লিখিত হইয়াছেঃ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا "এবং তাহারা যখন কোন অঙ্গীকার করে, তখন তাহা পূর্ণ করে।" বান্দার হকসমূহের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহা অঙ্গীকার পূর্ণ করা অপেক্ষা অগ্রগণ্য। যেমন, ঋণ পরিশোধ করা, আমানতে খিয়ানত না করা ইত্যাদি। তথাপি হক তা'আলা এখানে শুধু অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, তাহারা যখন বান্দার তাগাদাহীন হক আদায় করে (কারণ, অঙ্গীকার পূর্ণ করা পার্থিব আইনানুসারে জরুরী নহে, তবে কাহারও মতে দ্বীনদারী হিসাবে ওয়াজিব) তখন যেসব হকের পিছনে তাগাদা আছে, তাহা অবশ্যই আদায় করিবে। এই সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওছিয়তকে ঋণ হইতে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বান্দার হকের মর্যাদাও জানা গেল যে, হক তা'আলা তাগাদাহীন হকের প্রতি যখন এত গুরুত্ব আরোপ

করিলেন, তখন তাগাদাবিশিষ্ট হক কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা ছাড়া উদাহরণস্বরূপ এখানে কতিপয় হক উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা আরও অনেক প্রকার হক আছে। অনেকের ধারণা একমাত্র মালই বান্দার হক। অথচ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বান্দার হক মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহা ছাড়াও আরও অনেক প্রকার হক আছে।

হাদীসটি এইরূপঃ বিদায় হজ্জে প্রদত্ত খোৎবায় হুযূর (দঃ) ছাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا "ইহা কোন্ দিন?" ছাহাবাগণ উত্তরে বলিলেন, قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ "আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জ্ঞাত আছেন।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, اَلَيْسَ هٰذَا يَوْمُ النَّحْرِ 'ইহা কোরবানীর দিন নয় কি?' 'তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, قَالُوْا بَلٰى ইহা হইতে ছাহাবীদের চূড়ান্ত শিষ্টাচার জানা যায়। তাঁহারা যে বিষয়টি জানিতেন, তাহাও আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি সমর্পণ করিয়া দিতেন। নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিতেন না। অতঃপর হুযূর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কোন্ স্থান?" এর পর আবার বলিলেন, "ইহা পবিত্র (মক্কা) শহর নয় কি?" ছাহাবাগণ সমস্বরে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়'। অতঃপর তিনি মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে নিজেই বলিলেন, "ইহা যিলহজ্জ মাস নয় কি?" ছাহাবাগণ বলিলেন, 'নিশ্চয়'। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ

فَاِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا

"তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত পরস্পরের মধ্যে এমনি সম্মানিত, যেমন এই মাস, এই স্থান ও এই দিন সম্মানিত।" ইহাতে বুঝা গেল যে, কাহাকেও কষ্ট না দেওয়াও এক প্রকার বান্দার হক। যেমন, কাহাকেও অন্যায়ভাবে মারধর করা। দেশের শাসকবর্গ ও শিক্ষক ছাহেবান অহরহ এই হক নষ্ট করিতেছে। কাহারও ইজ্জত নষ্ট না করাও এক প্রকার বান্দার হক। সুতরাং কাহাকেও তিরস্কার করা, অপমান করা, অহেতুক কুধারণা পোষণ করা ইত্যাদি সবই হারাম। তদ্রূপ কাহারও গীবত করাও না-জায়েয। এমন কি কোরআন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইজ্জত সম্বন্ধীয় হকের মর্তবা যিনা ব্যভিচার ইত্যাদি হইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বিশেষতঃ কাহারও ইজ্জতের পরওয়া করি না। এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা অন্যের এক পয়সাও আত্মসাৎ করে না, আর্থিক হক আদায় করিতে ত্রুটি করে না। তাহারা নিজেদেরকে এই ভাবিয়া খুব পরহেযগার মনে করে যে, আমরা কাহারও হক নষ্ট করি না, কিন্তু অপরের ইজ্জত নষ্ট করার রোগে তাহারাও আক্রান্ত। আমাদের কোন বৈঠক গীবত হইতে খালি থাকে না। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, আলেমদের মজলিসেও নির্বিবাদে গীবত চলিতে থাকে। সবচেয়ে সর্বনাশের কথা এই যে, মাশায়েখের (পীর সাহেবদের) মজলিসও এই আপদ হইতে মুক্ত নহে। সাধারণ লোক তো সাধারণ লোকেরই গীবত করে। তাঁহাদের মধ্যে অনেক ফাসেকও রহিয়াছে, যাহাদের ইজ্জতের হক তত বেশী নহে। কিন্তু আলেমগণ গীবত করিলে সাধারণ লোকের গীবত করিবে না; বরং অপর আলেমেরই গীবত করিবে। তদ্রূপ মাশায়েখ সর্বদা মাশায়েখেরই গীবত করিবে। একজন যাহাতে অপরজন হইতে উন্নত না হইয়া যায় এবং একজনের শিষ্যসংখ্যা যাহাতে অপরজন হইতে বাড়িয়া না যায়—এই কারণে আলেম, পীরদের মজলিস গীবতে পরিপূর্ণ থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা খোদার প্রিয় ওলীদেরই গীবত করে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাহারা সাধারণ লোকদের চেয়ে বেশী দোষী। মনে রাখিও, ইহা মামুলী ব্যাপার নহে।

www.almodina.com

লোকেরা ইহাকে মামুলী মনে করিয়া থাকে। অথচ অবস্থা এই যে, ইহা সমস্ত নামায রোযাকে ডুবাইয়া দিবে। তুমি যাহার ইজ্জত নষ্ট করিবে, কিয়ামতের দিন তোমার নেকীসমূহ তাহাকে দেওয়া হইবে। কাজেই ইজ্জতের হকের প্রতি নামায-রোযা হইতেও বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত।

আরও একটি বিষয় মনে পড়িল। উহা এই যে, জান ও মালের হক মৃত্যুর পরই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু ইজ্জতের হক মৃত্যুর পরও বাকী থাকে। মৃত্যুর পর যদি কাহাকেও মার, তবে সে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। ফলে ইহার কেছাছস্বরূপ তোমাকে মারা হইবে না। তদ্রূপ মৃত্যুর পর কাহারও ধন চুরি করিলে তাহা মৃতব্যক্তির ধন চুরি করা হইবে না; বরং ওয়ারিসদের ধন চুরি করা হইবে। কিন্তু মৃতব্যক্তির প্রতি কোন অপবাদ লাগাইলে বা তাহাকে মন্দ বলিলে, তখন তাহার গীবতের গোনাহ্ হইবে। এই পাপের কাফ্‌ফারা হিসাবে দো'আ ও এস্তেগফার করিতে হইবে। ইহাতে আশা করা যায় যে, খোদা তাহাকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করাইয়া লইবেন।

**দেহ ও আত্মার সম্বন্ধঃ** আমি বলিয়াছি যে, মৃতব্যক্তি আঘাত অনুভব করিতে পারে না। অথচ হাদীসে বলা হইয়াছেঃ كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا كَكَسْرِهٖ حَيًّا "মৃত্যুর পর মুসলমানের অস্থি চূর্ণ করা জীবিতাবস্থায় তাহার অস্থি চূর্ণ করার ন্যায়।" ইহার উত্তর এই যে, এখানে মৃতাবস্থাকে সকল দিক দিয়াই জীবিতাবস্থার সহিত তুলনা করা হয় না। এরূপ করা হইলে বিচারে আঘাতের পরিবর্তে আঘাতকারীকেও আঘাত করা হইত। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা মৃতব্যক্তি ও জীবিত ব্যক্তি উভয়কেই সমান অনুভূতিশীল বলিয়া ধারণা করার অবকাশ নাই।

মৃত্যুর পরও দেহের সহিত আত্মার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকে। পরিহিত পোশাকের সহিত আমাদের দেহের যে সম্পর্ক ঐ সম্পর্কও তদ্রূপ। কেহ আমাদের পরিহিত পোশাক ছিঁড়িয়া ফেলিলে আমরা কষ্ট অনুভব করি। এই কিঞ্চিৎ সম্বন্ধের কারণেই কবরস্থানে পৌঁছিয়া যে সব ছালাম ও দো'আ করা হয়, কবরবাসীরা তাহা শুনে। সাধারণ মু'মিন অপেক্ষা শহীদদের মধ্যে এই সম্পর্ক আরও গাঢ় থাকে। ফলে মৃত্যুর পরও তাহাদের দেহ অক্ষত থাকে। মাটি উহাকে খাইতে পারে না। এই সম্পর্কের ফলেই কোন কোন ওলী মৃত্যুর পরও কার্যক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহাদের মাযারে যাইয়া মুরাদ চাহিতে হইবে। শরীঅতের দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ না-জায়েয। হাঁ, তাহাদিগকে উছিলা বানাইয়া দো'আ করায় কোন দোষ নাই। তাহাদিগকে দো'আর ফরমায়েশ করাও জায়েয নহে। কারণ, তাহারা এরূপ দো'আ করার অনুমতি পাইয়াছেন বলিয়া শরীঅতে কোথাও প্রমাণ নাই।

হাদীস দৃষ্টে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, কবরস্থানে পৌঁছিয়া মৃতদের জন্য দো'আ করিবে। আরও জানা যায় যে, জীবিতদের দো'আয় মৃতদের উপকার হইয়া থাকে। তাহারা দো'আর অপেক্ষায় থাকে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে দো'আ করিতে বলিলে তাহারাও জীবিতদের জন্য দো'আ করিবে, হাদীসে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওলীদের তুলনায় নবীদের দেহের সম্বন্ধ আত্মার সহিত আরও বেশী থাকে। ইহারই অন্যতম প্রতিক্রিয়া হিসাবে নবীদের মৃত্যুর পর তাহাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হয় না। তাহাদের বিবিদিগকে বিবাহ করাও অন্যের পক্ষে হারাম। হাদীসে এই মাসআলাটি শুধু হুযূর (দঃ)-এর সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন আলেমের মতে সকল নবীদের ক্ষেত্রেই ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। (খোদাই ভাল জানেন।)

www.almodina.com

অতএব, অস্থি চূর্ণ করিলে শারীরিক কষ্ট হয় না। তবে আত্মিক কষ্ট হইতে পারে। এই কারণেই হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন যে, মৃতের অস্থি চূর্ণ করা জীবিতের অস্থি চূর্ণ করার মতই।

হযরত উস্তাদ রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি (মাওলানা ইয়াকুব সাহেব) বলিতেন, কেহ তোমার পরিহিত চাদর খুলিয়া তোমার সম্মুখে পোড়াইয়া ফেলিলে তুমি যেরূপ কষ্ট অনুভব করিবে, মৃতের দেহ পোড়াইয়া ফেলিলে তাহার আত্মা তদ্রূপ কষ্ট অনুভব করে। চাদর পোড়াইয়া ফেলিলে আমরা শারীরিক কষ্ট পাই না—শুধু আত্মিক কষ্ট হয়। হাদীসে এই দিক দিয়াই তুলনা দেওয়া হইয়াছে।

তাছাড়া গোনাহের দিক দিয়া তুলনা দেওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ, জীবিত ব্যক্তির অস্থি চূর্ণ করিলে যেরূপ গোনাহ্ হয়, মৃতের অস্থি চূর্ণ করিলেও তদ্রূপ গোনাহ্ হয়। (আমার মতে এই ব্যাখ্যাটি উত্তম।) উভয় ক্ষেত্রে সমান গোনাহ্ হওয়ার কারণ হইল সম্মান না করা। অস্থি চূর্ণ করিলে ও দেহ পোড়াইয়া ফেলিলে মৃতের প্রতি সম্মান করা হয় না; বরং অসম্মান করা হয়। মোটকথা, মৃত্যুর পরও মৃতের সম্মান করিতে হইবে।

**মৃতদিগকে মন্দ বলিতে নাইঃ** এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরোক্ত হাদীসও ইজ্জতের হকের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া যাইবে এবং এই অর্থ হইবে যে, মৃতব্যক্তি সম্মানের অধিকারী। অস্থি চূর্ণ করিলে সম্মানের হানি হয়, কাজেই অস্থি চূর্ণ করা হারাম। অস্থি চূর্ণ করা অপেক্ষা মন্দ বলা বেশী ক্রিয়াশীল। অতএব, মৃতদিগকে মন্দ বলাও হারাম।

হাদীসে বলা হইয়াছে, মৃতদিগকে মন্দ বলিও না। কারণ, তাহারা বিচারের কাঠগড়ায় পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহারা আসলে মন্দ হইলে নিঃসন্দেহে শাস্তি ভোগ করিতেছে। কাজেই তোমার মন্দ বলা অনর্থক বৈ কিছুই নহে। আর যদি তাহারা আসলে ভাল লোক হয়, তবে তুমি মন্দ বলিয়া গোনাহ্‌গার হইবে। কাজেই মৃতদিগকে মন্দ বলা কিছুতেই শোভনীয় নহে। (তবে যাহারা জীবিতাবস্থায় কোন মন্দ প্রথা প্রচলিত করিয়া যায় এবং মৃত্যুর পরও মানুষ ঐ প্রথা পালন করে—তাহাদিগকে মন্দ বলা দূষণীয় নহে। কারণ, ইহাতে মানুষ এ প্রথা পালনে বিরত হইবে।) সুতরাং কথায় বা কাজে কোন প্রকারেই মুসলমান মৃতের মানহানি করা জায়েয নহে। এই মানহানির অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে একটি বিশেষ প্রকারের মানহানির প্রতি সম্প্রতি জনৈক সুহৃদ বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

তাহা এই যে, কিছু সংখ্যক লোক কবরস্থানে পেশাব করে এবং কবরস্থানের জমিনে ঘর উঠাইয়া বসবাস করে। মাসআলাটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। ইহা মনোযোগ সহকারে শুনা উচিত। কবরস্থান ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব হইলে কবরের চিহ্ন মিটাইয়া উহাতে ঘর উঠানো জায়েয। কিন্তু যে স্থানে কবরের চিহ্ন আছে, তথায় পায়খানা তৈরী করা কিংবা পেশাব করা হারাম। কবরস্থান ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হইলে উহাকে যে কোন রকমে ব্যবহার করা হারাম। তথায় ঘর নির্মাণ করা জায়েয নহে। আমাদের দেশে অধিকাংশ কবরস্থান ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি। কাজেই এই ধরনের ব্যবহার হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিত। ইহাতে আখেরাতের ক্ষতি অর্থাৎ, গোনাহ্ তো আছেই, প্রায়শঃ পার্থিব ক্ষতিও হইয়া থাকে। কোন কোন সময় কবর হইতে এরূপ অপকর্মকারীর প্রতি মরণাঘাত হানা হয়। এ ধরনের অনেক ঘটনাই বর্ণিত আছে। কিন্তু সবই যে সত্য—আমি এরূপ দাবী করি না, তবে অনেক ঘটনা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারাও প্রমাণিত আছে। অতঃপর এসবের প্রতি দৃষ্টি না করিলেও পেশাব-পায়খানা করিলে মৃতব্যক্তিদের যে কষ্ট হয়, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.almodina.com

**খোদার ওলীদের প্রতি সম্মানঃ** কবরবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ ওলীও আছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে হাদীসে বলা হইয়াছেঃ مَنْ اٰذٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ অর্থাৎ, যে কেহ আমার কোন ওলীকে কষ্ট দেয়, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেই। আল্লাহু আকবার! কত কঠোর শাস্তিবাণী! কার সাধ্য যে খোদার যুদ্ধ ঘোষণার মোকাবিলা করে! এই শাস্তিবাণী বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পায়। কোন সময় খোদা স্বয়ং ওলীদিগকে ব্যাপক কার্যক্ষমতা দান করেন। তাহারা এই ক্ষমতা বলে কষ্টদাতার ক্ষতিসাধন করেন। কখনও ওলী নিজে কোনরূপ ক্ষমতা ব্যবহার করেন না, কিন্তু প্রিয়জনের অসম্মান হইতে দেখিয়া হক তা'আলা স্বয়ং কষ্টদাতাকে কোন বিপদে ফেলিয়া দেন। মোটকথা, খোদার ওলীর সহিত ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করা মারাত্মক অপরাধ। ওলী স্বয়ং দয়াবশতঃ কিছু না করিলেও খোদার বন্ধুত্বের মর্যাদাবোধ অপরাধীকে রেহাই দেয় না। কাজেই বিষয়টি হইতে খুব বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।

সাধক শীরাযী বলেনঃ

بس تجربه کردیم دریں دیر مکافات — با دردکشاں هرکه در افتاد بر افتاد

(বস তাজরবা কারদেম দরী দায়রে মুকাফাত + বা দরদ কুশাঁ হর কেহ দর উফ্‌তাদ বর উফ্‌তাদ)

অর্থাৎ, "দান প্রতিদানের অভিজ্ঞতা দুনিয়াতে আমরা এই লাভ করিয়াছি যে, যে খোদা-প্রেমিকদের সহিত অশুভ আচরণে লিপ্ত হইয়াছে, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

মাওলানা রূমী বলেনঃ

هیچ قومے را خدا رسوا نه کرد — تا دل صاحب دلے نامد بدرد

(হীচ্ কওমে রা খোদা রসওয়া না কর্‌দ + তা দিলে ছাহেবদিলে নামদ বদরদ)

অর্থাৎ, "খোদা কোন জাতিকে ঐ পর্যন্ত লাঞ্ছিত করেন না, যে পর্যন্ত না কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার অন্তর ব্যথিত হয়।"

মনে রাখিও, কোন জাতি যদি কোন ওলীকে কষ্ট দেয়, তবে তাঁহার ধৈর্য বিফলে যায় না। কোন না কোন সময় হক তা'আলা তাঁহার পক্ষ হইতে এমন ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, যাহা স্বয়ং ওলীও কল্পনা করিতে পারেন না। এরূপ মনে করিও না যে, বান্দার হক শুধু জান ও মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; বরং ইজ্জতও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইজ্জতের হক জান ও মালের হক হইতে অনেক বেশী। কেননা, মৃত্যুর পরও এই হক বাকী থাকে। মৃত্যুর পর কবরের অসম্মান না করা ইহার অন্যতম। বিষয়টি আমি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করিয়া দিলাম। বন্ধুবর কয়েকবারই আমাকে বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ওয়াযের মধ্যেই আমি উহা ভুলিয়া যাইতাম। কারণ, ফরমায়েশী আলোচ্য বিষয় খুব কম স্মরণ থাকে। এইবার ভুলি নাই এবং খোদার ফযলে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বর্ণনা হইয়া গিয়াছে।

আমি আরও শুনিয়াছি যে, কোন কোন মোখলেছ লোক কবরস্থানের হেফাযতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন। সর্বপ্রকারে তাহাদের সাহায্য ও সহায়তা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে—আপনি বলিয়াছেন যে, কবরস্থানের অসম্মান করিলে বিপদাপদ আসে। কিন্তু আমরা এ যাবৎ কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা করিয়া আসিতেছি, আমাদের উপর তো কোন বিপদাপদ আসিল না। আমরা তো বেশ সবল ও সুস্থ আছি।

আমি বলিব, এই প্রশ্নটি কাফেরদের উক্তির ন্যায়। তাহারা নবীদিগকে বলিত, তুমি রোযই আমাদিগকে আযাবের ভয় দেখাইয়া বল যে, কুফরী করিলে এই বিপদ আসিবে, ঐ বালা মুছীবত নাযিল হইবে ইত্যাদি। অথচ আমরা বহু দিন ধরিয়া কুফরী করিতেছি; কিন্তু খোদার আযাব আসিল কই? সুতরাং কাফেরদের এই প্রশ্নের যে পরিণাম হইয়াছিল, উপরোক্ত প্রশ্নকারীদেরও সেই পরিণাম-চিন্তা করা উচিত। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর কোন বিপদ নাযিল হয় নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও হইবে না বলিয়া তোমরা খোদার তরফ হইতে কোন ওহী প্রাপ্ত হইয়াছ কি?

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যাহারা এই ধরনের প্রশ্ন করে, তাহারা এখনও বিপদে পতিত আছে। তবে বিপদ দুই প্রকার—প্রকাশ্য ও গুপ্ত। জান ও মালের ক্ষতি হওয়া প্রকাশ্য বিপদ। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজ। অপরপক্ষে অন্তর কাল হইয়া যাওয়া গুপ্ত বিপদ। এই বিপদে পতিত হইলে অন্তরে নেক আমল করার যোগ্যতা থাকে না। নেক কাজে মন পিছাইয়া থাকিতে চায়। এই বিপদটি খুবই মারাত্মক। কেননা, অন্তর কাল হইয়া গেলে কোন কোন সময় ঈমানও চলিয়া যায়। ঈমানহীনতার পরিণাম চিরকাল দোযখ ভোগ করা। কাজেই আমি বলি, উপরোক্তরূপ প্রশ্নকারীরা এখনও বিপদমুক্ত নহে। তাহারা গুপ্ত বিপদে পতিত আছে। তাহাদের অন্তর হইতে খোদার ভয় উঠিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা খোদার গযবের কথা শুনিয়াও আপন দুষ্কর্ম হইতে বিরত হয় না; বরং উহার প্রতি উল্টা পরিহাস করে। তাহাদের অন্তরে খোদার গযবের ভয় থাকিলে যে কাজে ইহার সন্দেহ হয়, তাহাও অনতিবিলম্বে বর্জন করিত। মাওলানা এই বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

آتشی گر نامدست ایں دود چیست ـ جاں سیه گشت و رواں مردود چیست

অর্থাৎ, পাপ করিয়াও শাস্তি পাইতেছ না বলিয়া তোমরা যে বলিয়া বেড়াইতেছ, সে সম্বন্ধে মাওলানা বলিতেছেন যে, "তোমাদের ভিতরে গযবের আগুন জ্বলিতেছে। তোমাদের ভিতরে আগুন না জ্বলিলে এই ধোঁয়া কোথা হইতে আসিল?" অর্থাৎ, এইরূপ ধৃষ্টতা ও নির্ভীকতাপূর্ণ উক্তি তোমাদের মুখ হইতে কিরূপে উচ্চারিত হইতেছে? ইহা তোমাদের অন্তর মলিন হইয়া যাওয়ার পরিচয় দিতেছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য গযব হইতেও বড় গযব।

এ পর্যন্ত বান্দার হক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এর পর চরিত্রের উল্লেখ করা হইতেছে।

**ছবরের স্বরূপ ও প্রকার ঃ** وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْس "তাহারা অভাব-অনটন, অসুখ-বিসুখ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ধৈর্য অবলম্বন করে।"

আত্মিক চরিত্রের বহু প্রকার রহিয়াছে। তা সত্ত্বেও হক তা'আলা এখানে শুধু ছবরকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার তিনটি স্থান বর্ণনা করিয়াছেন। নির্দিষ্টভাবে ইহাকে বর্ণনা করার কারণ এই যে, ছবর হাছিল হইয়া গেলে অন্যান্য গুণাবলী আপনাআপনি লাভ হইয়া যায়। কেননা, শুধু আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে স্থিরচিত্ত থাকার নামই ছবর নহে। ইহা ছবরের একটি ক্ষেত্র মাত্র। ছবরের আসল স্বরূপ ইহা হইতেও ব্যাপক। ইহার আভিধানিক অর্থ বিরত রাখা। শরীঅতের পরিভাষায় ইহার অর্থ নফ্সকে অপছন্দনীয় কাজকর্ম হইতে বিরত রাখা। অপছন্দের দিক দিয়া শরীঅতের ছবর তিন ভাগে বিভক্তঃ (১) ছবর আলাল আমল (২) ছবর ফিল আমল ও (৩) ছবর আনিল আমল।

www.almodina.com

(১) ছবর আলাল আমলের অর্থ হইল নফসকে কোন কাজে আবদ্ধ রাখা এবং উহাতে দৃঢ়তার সহিত কায়েম থাকা। উদাহরণতঃ নামায, রোযা ইত্যাদির পাবন্দী করা এবং নিয়মিত উহা আদায় করা।

(২) ছবর ফিল আমলের অর্থ—আমল করার সময় নফসকে অন্যান্য দিক হইতে বিরত রাখা এবং আপাদমস্তক একাগ্রতা সহকারে কাজ সম্পাদন করা। উদাহরণতঃ নামায অথবা যিকরে মশগুল হওয়ার সময় নফসকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া যে, বাচাধন! এতটুকু সময়ের মধ্যে তুমি নামায অথবা যিকর ব্যতীত অন্য কিছু করিতে পারিবে না। এই সময়ের মধ্যে অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া অনর্থক কাজ। কাজেই নামায অথবা যিক্‌রের প্রতিই তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা উচিত। এই ক্ষমতা অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেলে যাবতীয় আমল ঠিক ঠিক আদায় করা যায়। অনেকেই শরীঅতের ফরয আমলসমূহ পাবন্দীর সহিত সম্পাদন করিতে পারে। কাজেই বলা যায় যে, তাহারা ছবর আলাল আমল লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই আমলগুলি পালন করার সময় তাহারা ইহাদের আদব ও যথার্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখে না—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, তাহারা ছবর ফিল আমল হাছিল করিতে সক্ষম হয় নাই।

(৩) ছবর আনিল আমলের অর্থ—নফসকে শরীঅতের নিষিদ্ধ কার্যাবলী হইতে বিরত রাখা। তন্মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ছবর হইল নফসকে কাম-প্রবৃত্তি হইতে ফিরাইয়া রাখা। ইহা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, অন্যান্য আকাঙ্ক্ষা হইতে নফসকে বিরত না রাখিলেও পরে নফস স্বয়ং উহাতে কষ্ট অনুভব করে। কাজেই কষ্ট ভাবিয়া নফস স্বয়ং পরে ঐসব আকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত থাকে।

উদাহরণতঃ, ক্রোধ হইতে ছবর করা খুব সহজ। কেননা, ক্রোধের সময় নফস যদিও আনন্দ পায়; কিন্তু পরে খুবই যন্ত্রণা অনুভব করে। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, ক্রোধের পরেই এক প্রকার অনুশোচনা এই দেখা দেয় যে, অনর্থক কেন রাগ করিলাম—বিষয়টি এড়াইয়া গেলাম না কেন? রাগ করিয়া কেহই আত্মতৃপ্তি পায় না। তাছাড়া কোন কোন সময় অন্যের প্রতি রাগ করিলে তাহার সহিত শত্রুতা জন্মে। ফলে সে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধনের চিন্তায় লাগিয়া যায়। এই সব অনিষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানুষ নিজে নিজেই ক্রোধকে দমন করিতে সচেষ্ট হয়।

কিন্তু কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করা যারপরনাই কঠিন। কারণ, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সময় আনন্দ পাওয়া যায় এবং পরেও ঐ আনন্দ বাকী থাকে। কোনরূপ যন্ত্রণাও দেখা দেয় না। কাহারও হয়ত আত্মিক যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে; কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সাধারণ অবস্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পর যদিও সাময়িকভাবে কামনা দমিত হইয়া যায়; কিন্তু পরে তাহা আরও বহুগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

**পুংমৈথুনঃ** ইহা স্ত্রীমৈথুন (যিনা) হইতেও মারাত্মক। আজকাল কিশোরদের সহিত এ সম্পর্ক ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কয়েকটি। প্রথমতঃ, মহিলাদের মধ্যে জন্মগতভাবেই লজ্জা বেশী। কাজেই তাহাদের সহিত কামভাব প্রকাশ করিতে যথেষ্ট সময় লাগে। অপর পক্ষে বালকদের লজ্জা খুব কম।

দ্বিতীয়তঃ, মহিলাদিগকে খুব হেফাযতে রাখা হয়। তাহাদের নিকট পৌঁছা সহজ নহে। কেহ পৌঁছিয়া গেলেও সত্বরই লাঞ্ছিত হইয়া যায়। বালকদের মোটেই হেফাযত করা হয় না। কাহারও কাছে তাহাদের পর্দা নাই।

তৃতীয়তঃ, ইহাতে অপবাদের ভয় কম। বালকদের মাথায় স্নেহবশে ও কামবশে উভয় অবস্থায়ই হাত বুলানো যায়। কোন বালককে আদর করিলে সকলেই মনে করিবে যে, লোকটি ছেলেদের প্রতি বেশী স্নেহপরায়ণ। কাম-প্রবৃত্তির খবর কে রাখে?

উপরোক্ত কয়েকটি কারণে আজকাল বালকদের সহিত এই কুকর্ম ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। স্ত্রীমৈথুন অপেক্ষা পুংমৈথুন অধিক জঘন্য। কারণ, স্ত্রীমৈথুন মাহ্‌রাম ব্যক্তির সহিত খুব কম ঘটে। অধিকাংশই মাহ্‌রাম নহে এরূপ ব্যক্তিদের সহিত ঘটিয়া থাকে। ইহা কোন না কোন সময় হালাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কুমারী হইলে সঙ্গেসঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব চলিতে পারে। বিবাহিতা হইলে স্বামী মারা যাওয়ার কিংবা তালাক দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এর পর তাহাকে বিবাহ করা যায়। মোটকথা, স্ত্রীমৈথুনের বেলায় কোন না কোন পর্যায়ে হালাল হওয়ার আশা আছে। যদিও ঐ আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু বালকদের সহিত কুকর্ম কোন অবস্থাতেই হালাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কতিপয় গোনাহ্ আছে—যাহা জান্নাতে পৌঁছার পর গোনাহ্ থাকিবে না। যেমন, মদ্যপান দুনিয়াতে পাপকাজ, কিন্তু জান্নাতে তাহা পান করার জন্য সরবরাহ করা হইবে। কিন্তু পুংমৈথুন এতই জঘন্য কাজ যে, জান্নাতেও ইহার স্থান নাই। অতএব, ইহা যিনা ও মদ্যপান হইতেও জঘন্য। নেশার কারণে মদ হারাম। কিন্তু কোন উপায়ে মদ হইতে নেশা দূর হইয়া গেলে, যেমন সিরকা হইয়া গেলে উহা পান করা হালাল হইয়া যায়। কিন্তু পুংমৈথুনের জঘন্যতা কোন উপায়েই দূর হইতে পারে না। সুতরাং এই কুকর্ম সবচেয়ে বেশী হারাম। কেননা, ইহা হালাল হওয়ার কোন অবকাশ নাই।

এই অপবিত্র কাজটি সর্বপ্রথম লূত (আঃ)-এর কওমে প্রচলিত হয়। এর পূর্বে মানবজাতির ইতিহাসে ইহার কোন অস্তিত্ব মিলে না। লূত (আঃ) আপন জাতিকে বলিয়াছিলেনঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَآ اَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ

“তোমরা কি এমন সব ব্যভিচারে লিপ্ত আছ, যাহা ইতিপূর্বে জগতের কেহই করে নাই?” কথিত আছে, কোন কোন জন্তুর মধ্যে পূর্ব হইতেই এই কুকর্মের প্রচলন ছিল। হক তা'আলা এই কারণে কওমে লূতের উপর যে আযাব নাযিল করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহাতেই বুঝা যায়, কাজটি কত জঘন্য! কারণ, কুফ্‌রী, সকল কাফের জাতির মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। তাসত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির উপর বিভিন্ন আযাব তাহাদের বিশেষ বিশেষ কার্যাবলীর জন্যই নাযিল করা হইত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই কুকর্মটি স্বয়ং কওমে লূতের আবিষ্কৃত নহে; বরং শয়তান তাহাদিগকে ইহা শিখাইয়াছিল। নফস স্বভাবতঃই মানুষকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করে। তা সত্ত্বেও এই কুকর্মটির প্রতি নফস স্বয়ং আকৃষ্ট হয় নাই; বরং খবীস শয়তানই মানুষকে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

**পুংমৈথুনের সূচনাঃ** কিতাবাদিতে লিখিত আছে যে, শয়তান সুশ্রী বালকের আকৃতি ধারণ করিয়া জনৈক ব্যক্তির বাগান হইতে আঙ্গুর ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইত। বাগানের মালিক তাহাকে প্রায়ই ধমকাইত ও মারধর করিত। কিন্তু সে ইহাতে বিরত হইত না। অবশেষে এক দিন অতিষ্ঠ হইয়া মালিক তাহাকে বলিল, হতভাগা! তুই আমার বাগানের পিছনে পড়িয়াছিস কেন? সবগুলি গাছই যে নষ্ট করিয়া দিলে। তুই আমার কাছ হইতে কিছু টাকা লইয়া যা এবং বাগানের পিছু ছাড়িয়া দে। ইহাতে বালকরূপী শয়তান বলিল, আমি এভাবে বিরত হইব না। যদি আমাকে বাগানের

ক্ষতিসাধন হইতে বিরত রাখিতে চাও, তবে আমি যাহা বলি, তাহা কর। মালিক বলিল, তাহা কি? অতঃপর শয়তান তাহাকে এই কুকর্ম শিক্ষা দিয়া বলিল, আমার সহিত এই কুকর্ম কর। তাহা হইলে আমি তোমার বাগান ছাড়িয়া দিব।

সেমতে লোকটি প্রথমবার আপন বাগান রক্ষার খাতিরে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই কুকর্ম করিল। এর পর আর কি? সে উহার মজা পাইয়া বসিল। সে বালককে খোশামোদ করিয়া বলিল, তুই প্রত্যহ আসবি এবং যত ইচ্ছা আঙ্গুর খাইয়া যাইবি। এর পর সে অন্যান্য লোককেও এই কুকর্মের সংবাদ দিল। ফলে তাহারাও ইহাতে লিপ্ত হইয়া গেল। এইভাবে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িল। এর পর শয়তান তো অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু কুকর্ম বন্ধ হইল না। তাহারা বালকদের সহিত এই কুকর্ম শুরু করিয়া দেয়। এই কাজটি খোদা তা'আলার অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তাই তিনি লূত (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, জাতিকে এই কুকর্মে বাধা দান কর। নতুবা ভয়াবহ আযাব আসিবে। লূত (আঃ) জাতিকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কেহই তৎপ্রতি কর্ণপাত করিল না। অবশেষে আযাব নাযিল হইল এবং সকলেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

বন্ধুগণ, এই কুকর্মটি এতই জঘন্য যে, যে ইহাতে লিপ্ত হয়, সেই কুখ্যাত হয়। তাছাড়া ইহাতে আরও একটি অনিষ্ট আছে। তাহা এই যে, কেহ লূতী আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়া পছন্দ করে না। অথচ লূতী শব্দের মধ্যে ى অক্ষরটি সম্বন্ধবোধক এবং পয়গম্বর লূত (আঃ)-এর প্রতি সম্বন্ধ বুঝায়। ইহা মোহাম্মদী, মূসবী, ঈসবী ও ইউসূফী শব্দের ন্যায়। লূত (আঃ)-এর কওম যদি এই কুকর্ম না করিত, তবে আজ লূতী শব্দটিও মোহাম্মদী ও ইউসুফী শব্দের ন্যায় গৌরবজনক থাকিত। কিন্তু এই হতভাগা কওম আপন নবীর নামকেও ছাড়িল না।

**লেওয়াতাত (পুংমৈথুন) শব্দের অপপ্রয়োগ ঃ** বন্ধুগণ, এই কুকর্ম বুঝাইবার জন্য 'লেওয়াতাত' শব্দটি ব্যবহার করা আমার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। কেননা, লেওয়াতাত শব্দটির উৎপত্তি লূত (আঃ)-এর নাম হইতে। সুতরাং এমন নোংরা কাজের নাম একজন পয়গম্বরের নাম হইতে লওয়া খুবই অশোভনীয়। এই শব্দটি সর্বপ্রথম যে প্রয়োগ করিয়াছে, সে ঘোর অবিচার করিয়াছে। আমার মতে ইহা মূল আরবী শব্দ নহে; বরং অন্য ভাষা হইতে ইহা আরবীতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বিশুদ্ধভাষী আরবদের উক্তিতে কোথাও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না। আরবীতে এই অর্থ বুঝাইবার জন্য اِتْيَانٌ فِى الدُّبُرِ শব্দ আছে বলিয়া জানা যায়। অথবা অন্য কোন শব্দও থাকিতে পারে। ফলকথা, লেওয়াতাত শব্দটি বর্জন করার যোগ্য। আমার মতে ইগ্‌লাম اِغْلَامْ (সমমৈথুন) শব্দটি মূল আরবী নহে। মূল আরবীতে ইহার ব্যবহার নাই। এসবগুলি পরবর্তী কালের আবিষ্কৃত।

মোটকথা, এই কার্যের জঘন্যতা যুক্তি, কোরআন, হাদীস ইত্যাদি সবকিছু দ্বারা প্রমাণিত। সুস্থস্বভাব লোক আপনাআপনিই ইহাকে ঘৃণা করে। বদস্বভাব লোক ছাড়া কেহই এই কুকর্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না। পুংমৈথুন ও স্ত্রীমৈথুনের মধ্যে একটি প্রকাশ্য পার্থক্য এই যে, মহিলাদের সহিত মৈথুনের পর উভয়ের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। মহিলাটির দৃষ্টিতে পুরুষটির সম্মান বাড়িয়া যায়। সে তাহাকে পুরুষ মনে করে—কাপুরুষ মনে করে না। কিন্তু বালকের সহিত মৈথুন করার পরমুহূর্তেই একে অপরের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া যায়। অতঃপর সত্বরই বালকের মনে এমন শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়া উঠে যে, সে প্রতিপক্ষের চেহারা দেখাও পছন্দ করে না।

**দৃষ্টি-রোগঃ** অনেকেই পুংমৈথুন দোষ হইতে মুক্ত হইলেও দৃষ্টি-রোগে আক্রান্ত রহিয়াছে। কেননা, হাদীস দৃষ্টে জানা যায় যে, চক্ষু দ্বারাও যিনা হয়। অতএব, কিশোর বালকদিগকে কামপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখাও হারাম। খুব কম সংখ্যক লোকই এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে। দৃষ্টি কুকর্মের ভূমিকা। ফেকাহ্‌শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী হারাম কাজের ভূমিকাও হারাম। সুতরাং দৃষ্টির হেফাযত করাও অত্যন্ত জরুরী।

কোন কোন বুযুর্গ বলেন, খোদা যাহাকে আপন দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিতে চান, তাহাকে বালকদের মহব্বতে লিপ্ত করিয়া দেন। মহব্বত ইচ্ছাধীন ব্যাপার নহে সত্য; কিন্তু উহার উপায়াদি অর্থাৎ, তাহাদিগকে দেখা ও তাহাদের সহিত মেলামেশা করা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কাজেই উপরোক্ত উক্তির অর্থ এই যে, হক তা'আলা যাহাকে দরবার হইতে বিতাড়িত করিতে চান, সে বালকদের প্রতি কু-দৃষ্টি করে ও তাহাদের সহিত মেলামেশা করার কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এইগুলি ইচ্ছাধীন কাজ। ইহার ফলে মহব্বত সৃষ্টি হইয়া যায় এবং পরিণামে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি খোদার দরবার হইতে বহিষ্কৃত হয়। (খোদা আমাদের হেফাযত করুন।)

তাছাড়া বালকদের সাথে এশ্‌ক হওয়ার গোটা ব্যাপারটি আমার বুঝে আসে না। আজকাল লোকেরা ফেস্‌কের (পাপাচারের) নাম রাখিয়াছে এশ্‌ক। মাওলানা বলেনঃ

عشق ھائے کز پائے رنگے بود – عشق نبود عاقبت ننگے بود

(এশ্‌কহায়ে কিয পায়ে রঙ্গে বুয়াদ + এশ্‌ক নাবুয়াদ আকেবাত নঙ্গে বুয়াদ)

"রূপরঙ্গের মোহে যে এশ্‌ক হয়, তাহা আসলে এশ্‌ক নহে; বরং উহার পরিণাম লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া কিছুই নহে।" অপর একজন বলেনঃ

ایں نہ عشق است آنکہ در مردم بود – ایں فساد خوردن گندم بود

(ঈঁ না এশ্‌ক আস্ত আঁকেহ দর মরদুম বুয়াদ + ঈঁ ফসাদে খুরদানে গন্দম বুয়াদ)

"মানুষের মধ্যে প্রচলিত এশ্‌ক আসলে এশ্‌ক নহে; বরং ইহা গন্দম খাওয়ার অশুভ পরিণতি।"

যদি হাজারের মধ্য হইতে কোন একজন প্রকৃত এশ্‌কে পতিত হইয়া যায়, তবে তাহাকে এশ্‌কের কারণে তিরস্কার করা হইবে না। তবে পরবর্তী পর্যায়ে সে যে সমস্ত কাণ্ডকীর্তি করিবে, তজ্জন্য তাহাকে ধিকৃত করা হইবে। কেননা, উহা ইচ্ছাধীন কাজ। এমন কি মনে মনে বালকের কল্পনা করিয়া স্বাদ উপভোগ করাও ইচ্ছাধীন কাজ। ইহা ত্যাগ করা ওয়াজিব। অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা গিয়াছে যে, এমতাবস্থায় প্রিয়জন হইতে দূরে সরিয়া থাকা খুবই উপকারী। ইহাতে প্রায়ই এই রোগটি দুর্বল হইয়া পড়ে। 'তাকাশ্‌শুফ' নামক কিতাবে আমি ইহার যে চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহা দ্বারাও অনেকে উপকার পাইয়াছে। সুতরাং উহাও আমলে রাখা দরকার। এই ব্যাপারে বিশেষতঃ খোদার পথের পথিকদিগকে এবং ব্যাপকভাবে সমস্ত মুসলিমদিগকে অত্যধিক সতর্ক থাকা উচিত।

আমাদের এলাকায় একজন যাকের ছিলেন। একদা যিকরের সময় তিনি অনুভব করিলেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতখানি যেন তাঁহার অন্তরে উপস্থিত হইয়া গ্রথিত হইয়াছেঃ

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

"আমি এই বস্তিবাসীদের উপর তাহাদের কুকর্মের দরুন ভীষণ আযাব নাযিল করিব।"

বলা বাহুল্য, ইহা খোদার তরফ হইতে এলহাম (খোদা প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রেরণা) ছিল এবং 'হাতেফ' (অদৃশ্য স্থান হইতে আহ্বানকারী ফেরেশতা) মারফত তাঁহার অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইহার অর্থ এই বুঝিলেন যে, তিনি যে বস্তিতে বসবাস করেন, উহার উপর খোদার আযাব নাযিল হইবে এবং তাহা হইবে প্লেগ রোগ। কোন কোন হাদীসে প্লেগ রোগকেই রিজ্‌য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যেহেতু এই আয়াতখানি কওমে লূত সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছিল, এই কারণে তিনি ইহাও বুঝিলেন যে, এই আযাবের কারণ হইল কওমে লূতের কুকর্ম। তাঁহার বস্তির লোকগণ তখন এই কুকর্মে ব্যাপকভাবে লিপ্ত ছিল।

অতঃপর এক জুমুআর নামাযে তিনি উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, কওমে লূতের কুকর্ম ব্যাপকহারে প্রচলিত হওয়ার দরুন এই বস্তির উপর আযাব নাযিল হইবে এবং তাহা হইবে প্লেগ রোগ। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত এই কুকর্ম ত্যাগ করিয়া খোদার দরবারে তওবা ও এস্তেগফার করা। কিন্তু এই হীন কুকর্মের ফলে মানুষের অন্তর এতই কাল হইয়া যায় যে, উহাতে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতাও থাকে না। তাই সকলে তাঁহার কথায় টিট্‌কারী আরম্ভ করিয়া দিল। 'সোবহানাল্লাহ্! আজকাল তিনি ওহী পাইতে শুরু করিয়াছেন।' উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে তাহারা উল্টা খুব ঠাট্টা করিতে লাগিল। অবশেষে অল্পদিনের মধ্যেই তথায় এমন ভয়াবহরূপে প্লেগ দেখা দিল যে, বাড়ীর পর বাড়ী জনশূন্য হইয়া গেল।

মনে রাখুন, এই কুকর্মের ফলে প্রকাশ্য আযাব ছাড়া গুপ্ত আযাবও নাযিল হয় অর্থাৎ, অন্তর বিকৃত হইয়া যায়। খোদা সকল মুসলমানকে ইহা হইতে নিরাপদে রাখুন। আমীন!

**খোদা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টাঃ** সুতরাং কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করা ক্রোধ হইতে ছবর করা অপেক্ষা কঠিন। এই কারণে কামরোগে ব্যাপকভাবে লোক আক্রান্ত। কিন্তু যতক্ষণ আপনি উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা না করেন, ততক্ষণ ইহা কঠিন। আপনি যেদিন হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা আরম্ভ করিবেন, সেদিন হইতেই ইহা সহজ হইয়া যাইবে। কারণ, উহা আপনার পক্ষে কঠিন, খোদার পক্ষে কঠিন নহে। আপনি ইচ্ছা করিয়া দেখুন—খোদা সত্বরই উহা সহজ করিয়া দিবেন। মাওলানা বলেনঃ

تو مگو ما را بداں شه بار نیست – بر کریماں کارها دشوار نیست

(তূ মগু মারা বদাঁ শাহ্ বার নীস্ত + বর করীমাঁ কারহা দুশ্‌ওয়ার নীস্ত)

'অর্থাৎ, তুমি এই কথা বলিও না যে, আমি খোদার দরবারে পৌঁছিতে পারি না। কেননা, পৌঁছা তোমার এখ্‌তিয়ারভুক্ত নহে; বরং তাহা খোদার এখ্‌তিয়ারে। তিনি দয়ালু। স্বীয় করুণায় তিনি নিজেই তোমাকে পৌঁছাইয়া দিবেন। কারণ, দয়ালু ব্যক্তিদের কাছে কোন বড় কাজই কঠিন নহে। সুতরাং আমরা উপযুক্ত না হইলেও আমাদিগকে আপন দরবারে পৌঁছানো খোদার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। অতএব, নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। আপন চেষ্টায় পৌঁছা বাস্তবিকই মুশ্‌কিল। কিন্তু চেষ্টার পরই খোদা সাহায্য করেন। তুমি ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে তিনি পৌঁছাইয়া দিবেন এবং জটিলতা সহজ করিয়া দিবেন।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, চেষ্টা করিলে খোদা পৌঁছাইয়া দেন সত্য; কিন্তু তজ্জন্য তো চেষ্টারও দরকার। অথচ আমরা চেষ্টা করি না বা যাহা করি তাহাও নিছক অসম্পূর্ণ। কাজেই হক তা'আলা আমাদিগকে পৌঁছাইবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা বলেনঃ

www.almodina.com

هم بایں دلهـا نمـایـد خویش را ـ هم بدوزد خرقـهٔ درویش را

(হাম বঙ্গ দিলহা নুমায়াদ খেশ রা + হাম বদুযাদ খেরকায়ে দরবেশ রা)

এখানে خرقهٔ درویش বলিয়া সাধকের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ, খোদা এমনি দয়ালু যে, তোমাদের অসম্পূর্ণ চেষ্টাকেও তিনি নিজেই সম্পূর্ণ করিয়া দেন। তোমাদের ছিন্ন বস্ত্রকে নিজেই সেলাই করিয়া দেন এবং সাধকদের অন্তরে আপন জ্যোতিঃ বিকিরণ করেন। দয়াবশতঃ না হইলে আমাদের অন্তর কিছুতেই হক তা'আলার জ্যোতিঃ লাভের যোগ্য নহে। কিন্তু তুমি যে অবস্থাতেই খোদার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা কর, তোমার চেষ্টা অসম্পূর্ণ হইলেও তিনি আপন রহমতে উহা সম্পূর্ণ করিয়া দেন। তোমার অন্তরকে আপন জ্যোতিঃ বিকিরণের যোগ্য করিয়া তারপর উহাতে জ্যোতিঃ বিকিরণ করেন। তখন আয়না তালাশ করারও প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজেই ডাকিয়া আয়না দান করেন যে, লও উহাতে আমার সৌন্দর্য অবলোকন কর। সোবহানাল্লাহ্, কি দয়া! সুতরাং এখন আর কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না। এখন আপনার চেষ্টা ও সন্ধানে কোন বাধাও নাই।

সুতরাং আপনি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ ইত্যাদি চিন্তা বাদ দিয়া চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিন। অসম্পূর্ণ চেষ্টাও সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। হাদীসে কুদ্সীতে বলা হইয়াছেঃ

مَنْ تَقَـرَّبَ اِلَىَّ شِبْـرًا تَقَـرَّبْتُ اِلَيْـهِ ذِرَاعًـا وَّمَنْ تَقَـرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًـا تَقَـرَّبْتُ اِلَيْـهِ بَاعًا وَّمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُ اِلَيْهِ هَرْوَلَةً اَوْ كَمَا قَالَ

"যে আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তাহার দিকে দুই হাত প্রসারিত পরিমাণ অগ্রসর হই এবং যে আমার দিকে হাঁটিয়া আসে, আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।"

এই হাদীসে অর্ধ হাত, এক হাত ইত্যাদি শুধু বুঝাইবার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে। আসল অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি আমার দিকে সামান্য মনোযোগ দেয়, আমি তাহার দিকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মনোযোগ দেই।

সত্যই হক তা'আলার এইরূপ মনোযোগ ও দয়া না হইলে বান্দার সাধ্য কি যে, তাঁহার দরবার পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে? খোদার সহিত মানুষের সম্পর্কই বা কি? তিনি তো মানুষ হইতে বহু ঊর্ধ্বে। বান্দার কল্পনাও সে পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। যিনি এত মহান ও ঊর্ধ্বে, তাঁহার পরিচয়, মহব্বত ও মোশাহাদা (প্রত্যক্ষকরণ) মানুষ কিরূপে লাভ করিতে পারে? মানুষ তাঁহার যে পরিচয় পায়, তাহা একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহে। নতুবা তাঁহার দূরত্ব এইরূপঃ

نه گردد قطع هرگز جادهٔ عشق از دویدنها

که می بالد بخود ایں راه چوں تاك از بریدنها

(নাগরদাদ কাতা হরগিয জাদায়ে এশ্ক আয দবীদানহা
কেহ মীবালাদ বখুদ ইঁ রাহ্ চুঁ তাক আয বোরীদানহা)

"এশ্কের এই দূরত্ব দৌড়িয়া অতিক্রম করা সম্ভব নহে। কেননা, আঙ্গুরের বৃক্ষ কাটিয়া দিলে যেমন বাড়ে তেমনি এশ্কের ঐ রাস্তা আপনাআপনিই বাড়িয়া যায়।"

www.almodina.com

সীমাহীন দূরত্ব,. যাহা অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত, তাহা কিরূপে অতিক্রম করা যাইবে? শুনুন।

خود بخود آں شہ ابرار ببرمی آید ــ نہ بزور و نہ بزاری نہ بزر می آید

(খোদবখোদ আঁ শাহে আবরার বর মীআয়াদ + না বযোর ও না বযারী না বযর মীআয়াদ)

"এই শাহানশাহ্ নিজেই চলিয়া আসেন। জোরে, কান্নাকাটিতে ও টাকা পয়সার প্রভাবে তিনি আসেন না।"

**খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উপায়ঃ** প্রথমতঃ, সাধক ও মাহ্‌বুবের মধ্যে সীমাহীন দূরত্ব থাকে, যাহা সাধকের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কিন্তু সাধক যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন হক তা'আলা তাহার দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দয়া প্রদর্শন করেন। ফলে তিনি নিজেও চলিতে আরম্ভ করেন। হক তা'আলার পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা মোটেই কঠিন নহে। তিনি নিজেই সাধকের নিকট পৌঁছিয়া যান এবং এইভাবে মিলন হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বান্দা পৌঁছে না, হক তা'আলা স্বয়ং বান্দার নিকট পৌঁছেন। কিন্তু কি অপার করুণা! এতদ্‌সত্ত্বেও বান্দাকে 'ওয়াছেল' (পৌঁছানেওয়ালা) উপাধি দান করা হইয়াছে।

বান্দার পৌঁছার স্বরূপ সম্বন্ধে আমি একটি উদাহরণ মনোনীত করিয়াছি। তাহা এই যে, মনে করুন, আপনার একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু আপনার নিকট হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে। আপনি তাহাকে বলিতেছেন যে, দৌড়াইয়া চলিয়া আস। অথচ আপনি জানেন যে, এই কচি শিশুর পক্ষে এই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নহে—এখন শিশু সাহস করিয়া দুই এক পা অগ্রসর হয়, আর পড়িয়া যায় এবং কাঁদিতে থাকে। এমতাবস্থায় পিতা স্বয়ং জোশে আসিয়া যাইবে এবং সে নিজেই দৌড়াইয়া শিশুর নিকট পৌঁছিবে এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবে। এখানে দেখুন, যে দূরত্ব সাক্ষাৎলাভে বাধা হইয়া রহিয়াছিল, তাহা কিরূপে অতিক্রান্ত হইয়া গেল!

খোদার পথ অতিক্রমের বেলায়ও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। প্রথমে তুমি অসম্পূর্ণ চেষ্টা ও স্পৃহা প্রকাশ কর। তোমার এই চেষ্টা খোদা পর্যন্ত পৌঁছার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নহে, কিন্তু দুই এক পা চলার পর পড়িয়া যাইতেই হক তা'আলার দয়ার সমুদ্র উথলিয়া উঠে। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া লন। তবে হাঁ, শিশুর ন্যায় এক পা দুই পা অগ্রসর হইয়া অবশ্য কান্নাকাটি আরম্ভ করারও প্রয়োজন আছে। মাওলানা বলেনঃ

ہر کجا پستی ست آب آنجا رود ــ ہر کجا مشکل جواب آنجا رود

ہر کجا دردے دوا آنجا رود ــ ہر کجا رنجے شفا آنجا رود

گرنہ گرید طفل کے جوشد لبن ــ گرنہ گرید ابر کے خندد چمن

"যেখানে নিম্নভূমি, পানি সেখানেই যায়। যেখানে সমস্যা সেখানেই সমাধান। যেখানে ব্যথা, সেখানেই ঔষধ। যেখানে রোগ, সেখানেই রোগমুক্তি। শিশু কান্নাকাটি না করিলে দুধে জোশ মারিবে কিরূপে এবং মেঘমালা ক্রন্দন না করিলে বাগান কিরূপে হাসিবে?" কাঁদা ও পড়িয়া যাওয়ার অর্থ এই নহে যে, সজোরে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দাও। সাধকের কাঁদা ও পড়িয়া যাওয়ার অর্থ হইল, আপন অক্ষমতাকে মনে প্রাণে উপলব্ধি করা, হক তা'আলার সম্মুখে কাকুতি মিনতি করা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং অহংকার ও ফেরআউনী মনোভাব

মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া ফেলা। এর পর খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেরী লাগে না। তুমি চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দেখ।

মাওলানা বলেনঃ

سالهـا تو سنـگ بودی دلخـراش ـ آزمـون را یك زمـانـه خاك باش
در بهاراں کے شود سر سبز سنگ ـ خاك شو تا گل برویـد رنـگ برنگ

(সালহা তু সঙ্গ বূদী দিল খারাশ + আযমুঁরা এক যমানা খাক বাশ
দর বাহারাঁ কায় শাওয়াদ সর সব্‌য সঙ্গ + খাক শো তা গোল বরুয়াদ রঙ্গ বরঙ্গ)

'তুমি বহু বৎসর নির্মম পাথর হইয়া রহিয়াছ। এখন পরীক্ষামূলকভাবে কিছু দিনের জন্য মাটি হইয়া দেখ; বসন্তকালে পাথর কিরূপে শস্যশ্যামলা হইবে? মাটি হও, তাহা হইলে উহা হইতে নানা রঙ্গের ফুল উৎপন্ন হইবে।'

**খোদার দড়িঃ** আমি খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উদাহরণস্বরূপ দুগ্ধপোষ্য শিশুর অবস্থা উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে জনৈক বাদশাহের গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক বুযুর্গের মুখে এই গল্পটি শুনিয়াছি। জনৈক বাদশাহ্ বালাখানায় উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় নীচে পথের মধ্যে জনৈক দরবেশকে পথ চলিতে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার নিকট আসুন; আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে।' দরবেশ উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমি কিরূপে আসিব? আপনি বালাখানায় বসিয়া আছেন, আর আমি বহু নীচে, মহলের দরজাও আমা হইতে অনেক দূরে।' শাহী মহলের দরজা বাস্তবিকই তথা হইতে অনেক দূরে ছিল। বাদশাহ্‌র বালাখানা পর্যন্ত পৌঁছিতে অনেক দরজা ও সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইত। বাদশাহ্ তৎক্ষণাৎ একটি দড়ি লটকাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহা শক্ত করিয়া ধরুন।' দরবেশ দড়ি ধরিলে বাদশাহ্ টান দিয়া দুই মিনিটের মধ্যেই তাহাকে উপরে উঠাইয়া লইলেন। উপরে পৌঁছার পর বাদশাহ্ দরবেশকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি খোদা পর্যন্ত পৌঁছিলেন কিরূপে?" দরবেশ উত্তর দিলেন, 'যেভাবে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছি।' খোদা পর্যন্ত পৌঁছা আসলে খুবই কঠিন ছিল; কিন্তু আমি তাঁহার দড়ি খুব শক্ত করিয়া ধরায় তিনি নিজেই আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সোবহানাল্লাহ্! কি চমৎকার জওয়াব!

বন্ধুগণ! যদি তোমরাও খোদার দড়ি শক্ত ধরিতে, তবে তাঁহার আকর্ষণে তোমরাও তথায় পৌঁছিয়া যাইতে। পরিতাপের বিষয়, মানুষ খোদার দড়িকে কাটিয়া দিতেছে। পয়গম্বরগণ হইলেন খোদার দড়ি। তাঁহারা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। পয়গম্বরগণের পর হক্কানী আলেম ও আওলিয়া পয়দা হইয়াছেন। তাঁহারাও সর্বদা মুসলমানদিগকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা দেখান এবং উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা খোদার মহব্বত ও মা'রেফাতের ফযীলত এবং আত্মার সংশোধনের উপায় বর্ণনা করিতেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ এদিকে কর্ণপাত করে না। তাহারা পূর্ববৎ অন্যমনস্কতায় ডুবিয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কেহ তাহাদিগকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইতে চাহিলে চতুর্দিক হইতে তাহার উপর বিদ্রূপ ও তিরস্কারের বান বর্ষিত হইতে থাকে। শুধু এই কারণে যে, যেসব কাজকর্ম খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে বাধা সৃষ্টি করে, আলেমগণ তাহা করিতে নিষেধ করেন। বলিতে কি, খোদার দড়ি কাটার অর্থ ইহাই। তুমি নিজেই যখন পৌঁছিতে চাও না, তখন খোদার কি ঠেকা পড়িল যে, তিনি খোশামোদ করিয়া পৌঁছাইবেনঃ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ "তোমরা হেদায়ত পছন্দ না করিলেও কি আমি উহা জবরদস্তি তোমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিব?"

**কাম-প্রবৃত্তির প্রকারভেদঃ** মোটকথা, কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করা স্বয়ং কঠিন হইলেও মানুষ ছবরের ইচ্ছা করিয়া ফেলিতেই তাহা সহজ হইতে থাকে। এর পর উহা আর কঠিন থাকে না।

আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। কাম-প্রবৃত্তি শুধু মহিলা ও কিশোর বালকদের সহিত সম্পর্ক রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং সুস্বাদু খাদ্যের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকা, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদের ফিকিরে মগ্ন থাকা এবং সদাসর্বদা গল্পগুজবে মাতিয়া থাকার অভ্যাসও কাম-প্রবৃত্তি। এই সমস্ত হইতে নফস্‌কে বিরত রাখাও কাম-প্রবৃত্তি হইতে ছবর করার মধ্যে গণ্য।

আজকাল মানুষের মধ্যে গল্পগুজবে মাতিয়া থাকার রোগটি খুব ব্যাপকাকারে দেখা দিয়াছে। একটু অবসর পাইলেই তাহারা আড্ডা জমাইয়া অনর্থক গল্পগুজবে মাতিয়া উঠে। আমি শুধু সাধারণের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিতেছি না; বরং ওলামা ও মাশায়েখকেও গল্পের বৈঠক বসাইতে নিষেধ করিতেছি। কারণ, এই রোগটি তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোন কোন পীর সাহেবের বাড়ীতে এশার পরও আসর জমে। ইহাতে অনর্থক ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তাহাতে শায়খের কার্যক্রমে যদি ব্যাঘাত না-ও ঘটে, তবুও বৈঠকের সকলেই সমান নহে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ফজরের নামাযও গায়েব করিয়া বসে। তাছাড়া বিনা প্রয়োজনে গল্পগুজব করাতে অন্তরও অন্ধকার হইয়া যায়। সুতরাং অন্য ক্ষতি না হইলেও ইহাও কি কম ক্ষতি? বিশেষতঃ খোশামোদী মুরীদের রচিত শায়খের প্রশংসাসূচক আলাপ-আলোচনা হইলে তাহাতে প্রশংসিত ব্যক্তির সর্বনাশ ঘটে। মাওলানা বলেনঃ

تن قفس شکل ست وزاں خار جاں ـ از فریب داخلاں و خارجاں
اینش گوید من شوم همراز تو ـ آنش گوید نے منم انبار تو
او چو بیند خلق را شد مست خویش ـ از تکبر میرود از دست خویش

"দেহ পিঞ্জরের ন্যায়। এই কারণেই ইহা আত্মার জন্য কন্টকস্বরূপ। (কাঁটা যেমন বাগানে পৌঁছার জন্য প্রতিবন্ধক, তদ্রূপ খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেহ আত্মার জন্য প্রতিবন্ধক।) যাতায়াতকারীদের চাটুকারিতার কারণে এই প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়াছে। একজন বলেন, আমি তোমার ভেদের সাথী। অন্যজন বলে, আমি তোমার ন্যায় অবস্থাবিশিষ্ট। এইভাবে সে যখন বহু লোককে তাহার গুণগান করিতে দেখে, তখন অহঙ্কারে ডুবিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে।"

**একটি ব্যাপক চরিত্রগুণঃ** উপরোক্ত আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ছবর একটি ব্যাপক চরিত্রগুণ। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ শুধু বিপদের সময় কান্নাকাটি না করাকেই ছবর মনে করে। অথচ কাম-প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে দমন করাও ছবর। বালক, নারী, খাদ্য, পোশাক, গল্পগুজব ইত্যাদি সম্পর্কিত কামনাও কাম-প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ যাবতীয় গোনাহ্ হইতে নফ্‌সকে বিরত রাখা এবং সকল প্রকার এবাদতের পাবন্দি করাও ছবরের মধ্যে গণ্য। এবাদত পালন করার সময় উহার হক ও আদব স্থিরতা ও ধীরতাসহ প্রতিপালন করাও এক প্রকার ছবর। সুতরাং ইহা এমন ব্যাপক একটি গুণ—যাহাতে অনেকগুলি চরিত্র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই কারণেই হাদীসে বলা হইয়াছেঃ اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ "ছবর অর্ধেক ঈমান" এবং এই কারণেই হক তা'আলা এখানে যাবতীয় চরিত্রের মধ্য হইতে শুধু ছবরের উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন বোধ হয় আপনাদের বুঝিতে বাকী নাই যে, উপরোক্ত আয়াতে ধর্মের যাবতীয় অঙ্গই সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এর পর ছবরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান বর্ণনা করিয়াছেনঃ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ অর্থাৎ, তাহারা ছবর করে, بأساء ضراء بأس -এর বেলায়। তফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, بأساء শব্দ দ্বারা অভাব অনটন, ضراء শব্দ দ্বারা অসুখ-বিসুখ এবং بأس শব্দ দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহ বুঝান হইয়াছে। কিন্তু শব্দের ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাও বলা যায় যে, অভাব অনটনে ছবর করার সারমর্ম হইল, খোদার দিকে দৃষ্টি রাখা, অন্যের ধনদৌলতের প্রতি লালসার দৃষ্টি না করা এবং অন্যের কাছ হইতে কোনকিছু আশা না করা। সুতরাং এই প্রসঙ্গে 'কানা'আত' (অল্পেতুষ্টি) ও 'তাওয়াক্কুল' (খোদার উপর ভরসা রাখা) এই দুইটি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ ضراء শব্দ দ্বারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যে কোন অসুখ-বিসুখ বুঝান হইয়াছে। বাহ্যিক অসুখে ছবর করার অর্থ মানুষের সম্মুখে হা হুতাশ না করা এবং অন্তরে খোদার প্রতি কোনরূপ মলিন ভাব না রাখা। সুতরাং ইহাতে 'তাসলীম' (খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করা) ও 'রেযা' (খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা)—এই দুইটি বিষয়েও শিক্ষা নিহিত আছে। আভ্যন্তরীণ অসুখে ছবর করার অর্থ আভ্যন্তরীণ রোগসমূহের চাহিদার সম্মুখে নতি স্বীকার না করা এবং সাহসিকতার সহিত উহার মোকাবিলা করা। উদাহরণতঃ কাহারও মধ্যে নারী কিংবা বালকদের প্রতি কাম-প্রবৃত্তি রোগ থাকিলে তাহার উচিত হইবে এই প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা এবং সাহসিকতার সহিত নারী ও বালকদের তরফ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা না করা। তদ্রূপ কৃপণতার রোগ থাকিলে তাহার উচিত হইবে তদনুযায়ী আমল না করা এবং মনের উপর জোর দিয়া খোদার পথে ধনদৌলত দান করিয়া দেওয়া। অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রেও এইরূপ মনে করিতে হইবে।

بأس শব্দ দ্বারাও যে কোন পেরেশানী ও হয়রানী বুঝান হইয়াছে বলা যায়। এমতাবস্থায় ইহা ছবরের বিশেষ বিশেষ স্থান উল্লেখের পর অবশেষে ব্যাপক স্থান উল্লেখের মধ্যে পরিগণিত হইবে। অর্থাৎ, অভাব-অনটন এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অসুখ-বিসুখেও সাহসিকতা দেখাইবে। তাছাড়া যে কোন পেরেশানী আপতিত হউক, উহাতেও স্থিরচিত্ত থাকিবে। এই ব্যাপক স্থানসমূহের মধ্যে একটি হইল যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ছবর করা। জেহাদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অটল অনড় হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব, ছবরের সারমর্ম হইল এই যে, পূর্ণরূপে মুওয়াহ্‌হেদ (মু'মিন) হইতে হইবে। এরূপ লোকের শান নিম্নরূপঃ

موحد چه بر پائے ریزی زرش – چه فولاد هندی نهی بر سرش

امید و هراسش نباشد ز کس – همین است بنیاد توحید و بس

"তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির পায়ে স্বর্ণরৌপ্য স্তূপীকৃত করিলে বা তাহার মাথার উপর হিন্দী তলোয়ার রাখিলেও (হানিলে) সে তাহাতে মোটেই প্রভাবান্বিত হয় না। সে কাহারও নিকট কিছু আশা করে না এবং কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না। ইহাই তওহীদের মূল ভিত্তি।"

ছবরের স্থানগুলি পূর্ণরূপে আমলে আসিয়া গেলে তওহীদ পূর্ণরূপ ধারণ করে। ধর্মের এই অঙ্গসমূহ বর্ণনা করার পর এখন ইহাদের ফল স্বরূপ বলিতেছেন, أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ "তাহারাই সত্যবাদী এবং তাহারাই মোত্তাকী।" এই বাক্যটি মোহরস্বরূপ। সমস্ত বিষয় বর্ণনা করার পর যেন অবশেষে মোহর মারিয়া দিলেন যে, তাহারাই সত্যবাদী ও মোত্তাকী।

www.almodina.com

পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী জানা গিয়াছে যে, এই আয়াতে ধর্মের যাবতীয় অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ বলায় পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, 'ছাদেক' ও মোত্তাকী পূর্ণ ধার্মিক ব্যক্তিকেই বলে এবং তাকওয়া ও ছিদ্‌ক পূর্ণ ধার্মিকতারই অপর নাম। প্রথমোক্ত আয়াত সম্বন্ধে আমি দাবী করিয়াছিলাম যে, اِتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ "খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।" এর অর্থ হইতেছে اَكْمِلُوْا فِى الدِّيْنِ وَكُوْنُوْا مَعَ الْكَامِلِيْنَ "ধর্মে পূর্ণতা অর্জন কর এবং পূর্ণ ধার্মিকদের সঙ্গী হইয়া যাও।" উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই দাবী সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন হইতেই এই দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেল। (যে তফসীরের সমর্থন কোরআনের অন্যান্য আয়াত হইতে পাওয়া যায়, তাহা যে সর্বোৎকৃষ্ট, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।)

**কামেল হওয়ার উপায়ঃ** আয়াতের অর্থ হইল, "হে মুসলমানগণ! ধর্মে কামেল হইয়া যাও।" অতঃপর হক তা'আলা ইহার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। উহা হইল কামেল ধার্মিকদের সঙ্গী হইয়া যাও। বন্ধুগণ, খোদার কসম, হক তা'আলার বর্ণিত এই উপায়টি কোন সাধক বা বিচক্ষণ ব্যক্তি কস্মিনকালেও ব্যক্ত করিতে পারিবে না। কামেলদের সঙ্গলাভ দ্বারাই যে কামেল হওয়া যায় ইহা কেহ বুঝিতে পারিত না। কিন্তু ইহার অর্থ ইহাই নহে যে, শুধু কামেলদের সঙ্গ লাভ করাই বুযুর্গী ও কামালত হাছেলের জন্য যথেষ্ট। কেননা, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শুধু কামেলদের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করিলে এবং নিজে কিছুই না করিলে কেহ কামেল হইতে পারিবে না; বরং ধর্মে কামেল হওয়ার আসল উপায় হইল আমলে পূর্ণতা অর্জন করা। ইহা এবাদত পালন করিলে এবং গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকিলে অর্জিত হয়। তাই لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا الخ আয়াতে এই সমস্ত আমলকেই 'যথেষ্ট নেকী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি বর্ণনা করার পরই যাহারা উহা আমলে আনে তাহাদিগকে মোত্তাকী ও ছাদেক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যদ্দ্বারা আমলের উপরই কামালত নির্ভরশীল হওয়া স্পষ্ট হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইল, আমলে কামেল হওয়ার উপায় কি? কেননা, আমলে পূর্ণতা অর্জনের পথে একটি বাধা আছে, তাহা হইল নফ্‌স। প্রত্যেক আমলের মধ্যেই ইহার এক একটি কামনা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। শরীঅত আদেশ করে, শীতকালেও পাঁচ ওয়াক্তেই ওযূ কর, কিন্তু নফ্‌সের আরামপ্রিয়তা ইহাতে বাধা দেয়। শরীঅতের নির্দেশ হইল—প্রতি বৎসর যাকাত আদায় কর। কিন্তু নফ্‌সের কার্পণ্য ইহাতে প্রতিবন্ধক সাজে। শরীঅত বলে, ঘুষ ও সুদ গ্রহণ করিও না, কিন্তু নফ্‌সের লোভ ইহাতে বাধা দেয়। শরীঅত নির্দেশ দেয়, বালক ও বেগানা মহিলাদিগকে কু-দৃষ্টিতে দেখিও না, কিন্তু নফসের কাম-প্রবৃত্তি ইহাতে ঘোর আপত্তি জানায়। তদ্রূপ শরীঅতের নির্দেশ আছে, অভাব-অনটনে অন্যের ধনদৌলতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। কিন্তু লোভ এই নির্দেশের প্রতি কর্ণপাতও করিতে দেয় না। এইরূপে শরীঅতের প্রত্যেকটি আমলের মোকাবেলায় নফ্‌সের একটি না একটি আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। উহা শরীঅতের আদেশ পালনে বাধা দান করে। খোদা তা'আলা পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন করার আদেশ দান করিয়া আমল সঞ্চয় করাকে উহার উপায় বলিয়া দিয়াছেন।

**নফসের আকাঙ্ক্ষা দমন করাঃ** কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, প্রত্যেক আমল করার সময় নফ্‌সের যে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া বাধার সৃষ্টি করে, উহার প্রতিকার কি? হক তা'আলা

كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ বলিয়া ইহার প্রতিকারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার সারমর্ম এই যে, কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গের মধ্যেই এই গুণ নিহিত আছে যে, উহা বাহ্যিক ও আন্তরিক আমলসমূহকে পূর্ণতা দানের ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা দূর করিতে পারে। অর্থাৎ, ইহার ফলে নফ্সের আকাঙ্ক্ষা তেমন প্রবল থাকে না। যাহা থাকে, তাহার মোকাবিলা করা খুব সহজ হইয়া যায়। ফলে আমলে পূর্ণতা অর্জন সহজে সম্পন্ন হইতে পারে।

দেখুন, এই প্রতিকার কত সহজ! যেন কানাকড়ি দামের ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু উপকার হাজার টাকার। ইহাকে লতা-পাতার চিকিৎসাও বলিতে পারেন, যাহাতে এক পয়সাও খরচ হয় না। অতএব, এই আয়াতে পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের যে উপায় বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা আসল উপায় নহে; বরং আসল উপায়ের মধ্যে যে সব বাধা ছিল—উহা দূরীকরণের পন্থা। তবে যেহেতু বাধা দূরীকরণ ব্যতীত আসল উপায়টি খুবই কঠিন—এই জন্য ইহাকেই পূর্ণতা অর্জনের আসল উপায় বলিয়া দিলে অত্যুক্তি হইবে না; নফসের আকাঙ্ক্ষা দুর্বল করার যে উপায় এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, খোদার কসম, তদপেক্ষা সহজ ও সরল উপায় আর কেহ বর্ণনা করিতে পারিবে না। শাস্ত্রবিদগণ নফসকে সংশোধিত করার নিমিত্ত না জানি কত শত উপায় নির্ধারিত করিয়াছেন। উহাদের আমল করা সাহসী লোকদের কাজ। কিন্তু এই উপায়টিকে আমলে আনা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন নহে। ইহা কোরআনের নিরেট দাবীই নহে; বরং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কামেল ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে নফসের আকাঙ্ক্ষা দুর্বল হইয়া পড়ে।

**সাধারণ ওলী ও বিশেষ ওলীর পার্থক্যঃ** যাঁহারা কামেল ধার্মিক, তাহাদের কথা বাদ দিয়াও আমি বলি যে, সাধারণ মু'মিনদের সমাবেশে উপস্থিত হইয়া দেখ। যখন সকলেই নামাযের প্রতি ধাবিত হয়, তখন বেনামাযীর অন্তরেও নামায পড়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। কেন জাগিবে না? সাধারণ মু'মিনগণও তো খোদার ওলী। কেননা, বেলায়েত দুই প্রকার। একটি সাধারণ বেলায়েত অপরটি বিশিষ্ট। যে কোন মুসলমান সাধারণ ওলীর শ্রেণীভুক্ত। এই কারণে সাধারণ মু'মিনদের সংসর্গেও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়, তবে শুধু বদমায়েশ ধরনের লোক একত্রিত না হওয়া চাই; বরং সাধারণ জনসমাবেশ হওয়া চাই। তাহা হইলেই তাহাদের সংসর্গ ক্রিয়াশীল হইবে। ইহা শুনিয়া কেহ যেন গর্ব না করে যে, যখন সাধারণ মুসলমানও ওলী তখন আমাদের অন্য ওলীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কি? কেন আমরা অন্যের কাছে যাইব? আমি বলি, তবুও যাওয়ার প্রয়োজন আছে। কেননা, সাধারণ ওলীগণ খোদার যে বন্ধুত্ব লাভ করেন, তাহা বিদ্রোহী ও শত্রুদের মোকাবিলায় বাদশাহ্র সহিত সাধারণ প্রজাদের বন্ধুত্বের ন্যায়। বিদ্রোহী ও শত্রুদের প্রতি লক্ষ্য করিলে সাধারণ প্রজাদিগকে বাদশাহ্র বন্ধু ও অনুগত বলা যায়। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা বিদ্রোহী ও শত্রু নহে। কিন্তু ইহাকেই যথেষ্ট মনে করা হয় না। এই ধরনের বন্ধুত্বের ফলে সাধারণ প্রজাগণ বাদশাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে? কখনও নহে। কেননা, কোন কোন প্রজাকে চুরি ও বদমায়েশীর কারণে কয়েদখানায়ও বন্দী করা হয়। তথায় দৈনিক তাহাদের পিঠে একশত বেত্রাঘাত করা হয়। এই অবস্থায়ও এই ব্যক্তি বিদ্রোহীর প্রতি লক্ষ্য করিলে বাদশাহ্র অনুগত প্রজা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। যাহার ফলে কখনও তাহাকে শাহী করুণায় মুক্তিও দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্রোহী এই ধরনের অনুগ্রহের যোগ্য নহে। অতএব, বিশেষ শ্রেণীর ওলী না হইয়া শুধু সাধারণ শ্রেণীর ওলী হইলে সে বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় জেলে আবদ্ধ কয়েদীর ন্যায় হইবে। বাদশাহ্র সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে বটে, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই সম্পর্ককে

www.almodina.com

যথেষ্ট মনে করিতে পারে না। বুদ্ধিমান মাত্রই বিশেষ সম্পর্ক অর্জনের জন্য চেষ্টিত থাকে। তাই আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, প্রত্যেক উদ্দেশ্যের বেলায় পূর্ণতা অর্জনই লক্ষ্য থাকে। তবে সাধারণ মু'মিনদের সংসর্গের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করার মূলে আমার উদ্দেশ্য এই যে, যখন অপূর্ণ লোকদের সংসর্গেরই এই প্রতিক্রিয়া, তখন কামেলদের সংসর্গের কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে নিজেই বুঝিয়া লও।

جرعه خاك آميز چوں مجنوں كند ـ صاف گر باشـد ندانم چوں كنـد

'এক গ্রাস মাটি মিশ্রিত মদই যদি এমন নেশাগ্রস্ত করিতে পারে; তবে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মদে না জানি কি পরিমাণ নেশা হয়?' পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লউন, অতিরিক্ত ঘুমের কারণে যাহার রাত্রি বেলায় চক্ষু উন্মীলিত হয় না, সে কিছুদিন এমন লোকদের সহিত বসবাস করুক—যাহারা রাত্রে জাগ্রত হইয়া নামায পড়ে। খোদা চাহে তো তাহারও তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস হইয়া যাইবে। তদ্রূপ খোদার যিকরের সহিত যাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, কিছুদিন যিকরকারীদের দলে উঠাবসা করিলে সত্বরই যিকরের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাইবে। কেননা, তাহাদের দলে থাকিলে আপনাআপনিই অন্তরে যিকরের আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। এইরূপে প্রথম দিন হইতেই তাহার মনে যে যিকর বিরোধী আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা দুর্বল হইতে থাকিবে। অতএব, কামেলদের সংসর্গে থাকিলে কি পরিমাণ উপকার হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহেঃ

آهـن كه بپـارس آشـنـا شد ـ فى الحـال بصـورت طلا شد

'পরশ পাথর নামে একটি প্রসিদ্ধ পাথর আছে। উহাতে লোহা ছোঁয়াইয়া দিলেও নাকি খাঁটি স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া যায়।' কামেলদের সংসর্গেও তদ্রূপ ফল লাভ হয়।

**কামেলদের সংসর্গের শর্তঃ** কিন্তু কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গ প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য একটি শর্ত ও একটি সংযম রহিয়াছে। সংযম এই যে, কাজকর্ম ইত্যাদিতে কামেল ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। শর্ত হইল আপন সমুদয় অবস্থা তাঁহাকে জানাইতে থাকিবে। তোমার অন্তরে যে-কোন রোগ থাকুক, তাহা পরিষ্কার তাঁহাকে জানাইয়া দিতে কোনরূপ লজ্জা করিবে না। কেননা, চিকিৎসকের সম্মুখে চিকিৎসার খাতিরে গুপ্ত অঙ্গ খোলা জায়েয। তদ্রূপ আত্মার চিকিৎসকের সম্মুখে নফ্‌সের রোগ বর্ণনা করিয়া দেওয়াও জায়েয। কাজেই একবার তাঁহার সম্মুখে স্বীয় ভাল-মন্দ সব খুলিয়া ধর। তাঁহার দৃষ্টিতে তুমি ঘৃণিত হইয়া যাইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিও না। ওলীদের দৃষ্টিতে তাঁহাদের নিজেদের ন্যায় ঘৃণিত আর কেহ নহে। তাঁহারা নিজকে এত হেয় মনে করেন যে, ফাসেক ও পাপাচারী ব্যক্তিও নিজকে এত হেয় মনে করিতে পারে না। আপন অবস্থা বর্ণনা করার পর তিনি যাহা করিতে বলিবেন, তাহা করিবে। বাহ্যিক রোগের চিকিৎসার বেলায়ও তুমি এরূপ কর। প্রথমে ডাক্তারকে স্বীয় অবস্থা জানাও। এর পর ডাক্তার যে ব্যবস্থাপত্র দেয়, উহা ব্যবহার কর। যদি ডাক্তার কিছু সংযমও বলিয়া দেয়, তুমি তাহা পালন কর। বলাবাহুল্য, কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে পৌঁছিয়াও এই উপায় অবলম্বন করা উচিত।

যদি কেহ শুধু সাক্ষাতের নিয়তে প্রত্যহ ডাক্তারের নিকট গমন করে; স্বীয় অবস্থা তাহাকে না জানায় এবং ব্যবস্থাপত্রও না লয়, তবে এই রোগী রোগ হইতে মুক্তি পাইতে পারে কি? কখনই নহে। তদ্রূপ শুধু যিয়ারত ও মোলাকাতের নিয়তে কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে গমন করিলে আন্তরিক রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নহে। অবশ্য তাহাদের যিয়ারতেও ছওয়াব

পাওয়া যায় ইহা ভিন্ন কথা, কিন্তু এখানে ছওয়াব পাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে না। ছওয়াবের জন্য অন্যান্য আরও বহু কাজ রহিয়াছে। এখানে পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের কথা হইতেছে। সুতরাং আমার বর্ণিত উপায়েই একমাত্র কামেলদের নিকট হইতে পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন করা সম্ভব। এই উপায়টি সর্বদা মনে রাখিবে। যখনই কোন কামেল বুযুর্গের সংসর্গে যাও কিংবা পত্র লিখ, তখন এই সংকল্প কর যে, নফ্‌সের যাবতীয় রোগ তাঁহাকে জানাইয়া দিবে এবং তিনি যাহা করিতে বলেন, তাহা কার্যে পরিণত করিবে। সুতরাং কামেল আওলিয়াদের সংসর্গে থাকিলেও আমল তোমাকেই করিতে হইবে। আমল না করিয়া কামেল হইয়া যাইবে, ইহা হইতে পারে না।

**কামেলদের সংসর্গের প্রতিক্রিয়াঃ** তবে পার্থক্য এতটুকু যে, প্রথমে তুমি আমল করার ইচ্ছা করিলে নফ্‌স উহার বিরোধিতা করিত। কিন্তু কামেলদের সঙ্গে থাকিলে অধিকতর সৎকাজের আকাঙ্ক্ষা জাগিবে এবং বিরুদ্ধাচারী আকাঙ্ক্ষা দমিত হইয়া যাইবে। ফলে প্রথমে যে কাজ করা কঠিন ছিল, আজ তাহা শুধু সহজই হইবে না; বরং উহা না করিলে মনে শান্তি আসিবে না। ইহা কি কম উপকার?

বন্ধুগণ, নিঃসন্দেহে ইহা বড় উপকার। ইহাকে সামান্য মনে করিও না। কামেলদের সংসর্গে গেলেই ইহা লাভ হয়, দূরে থাকিলে লাভ হয় না। কামেলদের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াও মোত্তাকী হওয়া যায়; কিন্তু তাহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখে, তাহারা খুব সহজেই তাকওয়া লাভ করিতে পারে। আমল সহজ হওয়া কামেলদের সংসর্গের একটি ক্ষুদ্রতম প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইহার পর জ্ঞানের আলো, মা'রেফাত, হাল ইত্যাদির নিরাপত্তা, গুপ্ত বিষয়সমূহে উন্নতি ইত্যাদি আরও কত বিষয়ে যে লাভ হয়, তাহার তো কোন ইয়ত্তাই নাই।

উদ্ধৃত আয়াত হইতে এই বিষয়টি বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি ইহা বর্ণনা করিয়া দিয়াছি। আমি ইহা কোন নূতন বিষয় বর্ণনা করিতেছি না; বরং খোদার নেয়ামত প্রকাশার্থে বলিতেছি যে, আমি এখানে কোন নূতন বিষয় বর্ণনা না করিলেও ইহাতে খোদা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় বলিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে আমি সকলকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছি। কেননা, সহজ উপায় বলিয়া দেওয়া পৌঁছাইয়া দেওয়ারই নামান্তর। আমার বর্ণিত এই সহজ উপায়টি হয়তো ইতিপূর্বে আপনি শুনেন নাই। এখনও যদি অগ্রসর না হন এবং খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে চেষ্টা না করেন, তবে খোদার তরফ হইতে আপনাদিগকে জানাইবার দায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।

**'ছিদক'-এর অর্থ ও ব্যাখ্যাঃ** এখন এই আয়াত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া আমি বক্তব্য শেষ করিতে চাই। পূর্বেও সংক্ষেপে বলিয়াছি, 'ছিদ্‌ক' অর্থ শুধু মুখে সত্য কথা বলা নহে। যাহাতে কেহ ইহা না মনে করে যে, ছিদ্‌ককে পূর্ণ ধার্মিকতা বলা হইয়াছে, উহা তো আমরা লাভ করিয়াই আছি, কেননা, আমরা সত্য কথা বলি। আসলে ছিদ্‌ক অর্থ পূর্ণতা। এই কারণেই কামেল ওলীকে 'ছিদ্দীক' বলা হইয়া থাকে। কারণ, তিনি যাবতীয় অবস্থা, কথা ও কর্মে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। শরীঅতের পরিভাষায় ছিদ্‌ক—কথা, কর্ম, অবস্থা এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

কথার ছিদক মানে—কথা নিশ্চিত ও বাস্তব হওয়া এবং অনিশ্চিত ও বাস্তব বিরোধী না হওয়া। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'ছাদেকুল আক্‌ওয়াল' (সত্যভাষী) বলা হয়।

কাজের ছিদ্‌ক হইল—প্রত্যেক কাজ শরীঅতের নির্দেশ অনুযায়ী হওয়া এবং উহার বিপক্ষে না হওয়া। সুতরাং যাহার কাজ সর্বদা শরীঅতসম্মত হয়, তাহাকে 'ছাদেকুল আফআল' (সত্য কর্মী) বলা হয়।

হালের ছিদ্‌ক হইল—প্রত্যেক হাল সুন্নত অনুযায়ী হওয়া। সুতরাং যে সব হাল সুন্নতের বিরোধী, সেগুলি মিথ্যা হাল। যাহার হাল সর্বদা সুন্নত মোতাবেক হয়, তাহাকে 'ছাদেকুল আহওয়াল' (সত্য হালবিশিষ্ট) বলা হয়।

যে হালের প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হয় এবং আজ আছে, কাল নাই—এরূপ না হয়—উহাকেও সত্য হাল বলে। কোন কোন লোকের হাল বাকী থাকে না। মাঝে মাঝে সে নিজের মধ্যে ভয় অথবা তাওয়াক্কুলের প্রাধান্য অনুভব করে; কিন্তু পরক্ষণেই উহার কোন প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না। এরূপ ব্যক্তিকে সত্য হাল বিশিষ্ট বলা হইবে না। হাল স্থায়ী হওয়া উদ্দেশ্য নহে; বরং হালের প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হইতে হইবে। মোটকথা, শরীঅতের পরিভাষায় 'ছিদক' শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। অথচ সাধারণতঃ ইহাকে কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। ফলে মানুষ নানাবিধ ভ্রান্তিতে লিপ্ত হইয়া যায়।

**শরীঅতের পরিভাষাঃ** ইহাকে ইমাম গায্‌যালী (রঃ) এইরূপে লিখিয়াছেন, শরীঅতের পরিভাষায় পরিবর্তন সাধন করাও মানুষের মনগড়া কার্যাবলীর অন্যতম। সাধারণ লোকদের মতে—কান্‌য ও হেদায়া (দুইটি কিতাবের নাম) পড়িয়া লওয়াই ফেকাহ্‌। অথচ শরীঅতে কিতাব পড়িয়া লওয়াকে ফেকাহ্‌ বলে না। ফেকাহ্‌ একটি বিশেষ জ্ঞান—যাহাতে শরীঅতের আহ্‌কাম বুঝার বিশেষ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এইরূপ ব্যক্তিকে ফকীহ বলিতেন, যিনি আহকাম বুঝার সঙ্গে সঙ্গে আমলেও কামেল হইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল ফেকাহ্‌র জন্য আমলকে জরুরী মনে করা হয় না। এছাড়া শরীঅতের আরও বহু পারিভাষিক শব্দের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে।

উদাহরণতঃ, শরীঅতে এল্‌ম বলা হয় শুধু কোরআন ও হাদীস সম্বন্ধীয় বিদ্যাকে। কিন্তু আজকাল অনেকেই ইহাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে। নাস্তিকতাবাদীরা এই রোগে বেশী আক্রান্ত। তাহারা বিজ্ঞান ও ভূগোলকেও এল্‌মের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করাও তাহাদের মতে এল্‌ম। আমি কিছু সংখ্যক রচনা দেখিয়াছি—উহাতে হাদীস দ্বারা এল্‌মের ফযীলত বর্ণনা করত ইংরেজী শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা দলীলস্বরূপ أُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْكَانَ بِالصِّيْنِ হাদীসটিকেও উল্লেখ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হাদীসে যে এল্‌মের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে—ইংরেজী শিক্ষাও উহার অন্তর্ভুক্ত (নাঊযুবিল্লাহ্‌) অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শরীঅতে যে স্থানে এল্‌মের ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে কিংবা তৎপ্রতি উৎসাহ বা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তথায় শরীঅতে একমাত্র কোরআন হাদীস ইত্যাদিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কথা যে, এইগুলির শিক্ষা আরও কয়েকটি শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে ঐগুলিও ওয়াজিব হইবে। কিন্তু ভূগোল ও বিজ্ঞান কোন পর্যায়েই আসে না। কোন যুক্তি দ্বারাই এইগুলিকে শরীঅতের এল্‌ম বলা যায় না। সুতরাং হাদীসের সাহায্যে এইগুলি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দেওয়া বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নহে। খুব কম সংখ্যক লোকই এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করে। ছিদ্‌ক-এর পারিভাষিক অর্থেও এইভাবে পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ শরীঅতে ইহা কথা, কাজ ও হাল—এই সবগুলির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত।

www.almodina.com

**তাকওয়ার ফযীলতঃ** আরেকটি কথা রহিয়া গেল। তাহা এই যে, তাকওয়া ও ছিদ্‌ক উভয়টি যখন পূর্ণ ধার্মিকতা, তখন আয়াতে তাকওয়াকে পূর্বে ও ছিদ্‌ককে পরে উল্লেখ করা হইল কেন? আয়াতের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা এইভাবে বলিলেও হাছিল হইয়া যাইতঃ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْدُقُوْا وَكُوْنُوْا مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ইহার অর্থও পূর্বের অর্থের ন্যায় যে, হে মুসলমানগণ! পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জন কর এবং কামেল ব্যক্তিদের সঙ্গী হইয়া যাও। সুতরাং তাকওয়া পূর্বে উল্লিখিত হওয়ার অন্তর্নিহিত রহস্য কি?

এই প্রশ্নটি এই মুহূর্তে আমার মনে উদয় হইয়াছে, যাহা পূর্বে মনে ছিল না। খোদার ফযলে ইহার উত্তরও এখনই মনে জাগিয়াছে। এখানে তাহাই বর্ণনা করিতেছি। ইহা অপেক্ষা উত্তম জওয়াব কাহারও জানা থাকিলে তাহা বলিয়া দিবেন। আমার মতে এইরূপ পূর্বাপর উল্লেখ করার রহস্য এই যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে, কোরআনের আয়াত দৃষ্টেই তাহা জানা যায়। কিন্তু ছিদ্‌কের এরূপ বিভিন্ন স্তর নাই। উহার একটি মাত্র নির্দিষ্ট স্তর আছে। ইহার দলীল এই আয়াতঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْا وَعَمِلُوا الصّٰـلِحٰـتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

এই আয়াতের শানে-নুযূল এই যে, হক তা'আলা মুসলমানদের উপর শরাব পান হারাম করিলে পর কোন কোন ছাহাবীর মনে এই সন্দেহ জন্মে যে, আমাদের মধ্যে যাহারা শরাব হারাম হওয়ার পূর্বে উহা পান করিত এবং এখন দুনিয়াতে বাঁচিয়া নাই, তাহারা বোধ হয় গোনাহ্‌গার হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন তাহারা পান করিত, তখন শরাব হারাম ছিল না। কাজেই তাহারা হারাম কাজ করে নাই। এমতাবস্থায় ছাহাবীদের মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়ার তাৎপর্য কি? উত্তর এই যে, তাঁহারাও ইহা জানিতেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও সম্ভবতঃ তাঁহাদের মনে সন্দেহ ছিল যে, ঐ সময় শরাব হালাল ছিল বলিয়াই হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয় নাই; কিংবা তখনও শরাব হারাম ছিল, কিন্তু আমরা ইহাতে খুব বেশী অভ্যস্ত ছিলাম বলিয়া হঠাৎ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল করা হয় নাই। কারণ, তাহা হইলে আমরা তদনুযায়ী আমল করিতে পারিতাম না। পরে আমাদের মধ্যে আস্তে আস্তে আমল করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করা হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় যাহারা হারাম হওয়ার পূর্বে শরাব পান করিয়াছে, তাহারা হালাল বস্তুই পান করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় তাহারা হারাম পান করিয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে আয়াত নাযিল না হওয়ায় তাহারা গোনাহ্‌গার হয় নাই। তবুও বাস্তবক্ষেত্রে হারাম বস্তু পান করা অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগের কারণে তাহাদের মর্তবা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতে হক তা'আলা ছাহাবীদের এই সন্দেহ নিরসন কল্পে বলেনঃ মুসলমানগণ (এ যাবৎ) যাহা পান করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কোন গোনাহ্ নাই (অর্থাৎ, হারামের নির্দেশ আসার পূর্বে যাহারা শরাব পান করিয়াছে, তাহারা গোনাহ্‌গার হয় নাই।) যদি তাহারা অন্যান্য গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং ঈমানদার থাকে, নেক আমল করিয়া থাকে, অতঃপর তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া থাকে এবং ঈমানদার থাকে, আবার তাকওয়া অবলম্বন করিয়া থাকে এবং আন্তরিকতার সহিত কাজ করিয়া থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এখ্‌লাছ অবলম্বনকারী-দিগকে খুব ভালবাসেন।

এখানে আসল বক্তব্য এই যে, হারাম হওয়ার পূর্বে যাহারা শরাব পান করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ হয় নাই। কিন্তুঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا ※

আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তাহাদের কোন প্রকার গোনাহ্ নাই। এই জন্য পরে ব্যাপক নীতি হিসাবে কতকগুলি শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শর্তগুলি বিদ্যমান থাকিলে যে কোন প্রকার গোনাহ্ হয় নাই বলাতো শুদ্ধ হইতে পারে। কেননা, যদি কেহ হারাম হওয়ার পূর্বে শরাব পান করিয়া থাকে এবং যিনা ব্যভিচার করিয়া থাকে, তবে শরাবের কারণে গোনাহ্ হয় নাই বলা তো শুদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন প্রকার গোনাহ্ হয় নাই বলা শুদ্ধ নহে। অতএব, আয়াতের সারমর্ম হইল—তাহারা অন্যান্য গোনাহ্‌র কাজ যাহা তখন হারাম ছিল, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকিলে এবং নির্দেশিত সৎকার্য সম্পাদন করিয়া থাকিলে শুধু শরাব পানের কারণে তাহাদের কোন গোনাহ্ নাই।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এই আয়াতে তিনবার তাকওয়া ও ঈমানের উল্লেখ করা হইল কেন? একবার মু'মিন বলার পর যখন তাহাদিগকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত প্রকাশ করা হইল, এর পরও أمنوا واتقوا বলার তাৎপর্য কি? ঈমানের পরও ঈমান আনা এবং তাকওয়ার পরও তাকওয়া অবলম্বন করা কেমন? ঈমানকে বারবার উল্লেখ করার উত্তর এই যে, ঈমানের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক স্তর হইল কুফর ও শির্ক হইতে তওবা করা। ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য এই স্তরটি শর্ত। ইহা ছাড়া কোন নেক আমলই কবূল হয় না। ঈমানের আরেকটি স্তর যাহা নেক আমল হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া এবং ইহার উপর দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হওয়া। দ্বিতীয়বার أمنوا বলিয়া এই স্তরটির প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

সারকথা এই যে, একবার ঈমান আনিয়া তাহারা নেক আমল করিতে থাকে এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে থাকে, ফলে তাহাদের অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এর পর তাহারা যেরূপ আমল করে, ঈমানও তদ্রূপ উৎপন্ন হয়। সর্বদা নেক আমল করিতে থাকিলে প্রত্যেকের ঈমানেই স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা লাভ হয়। তবে যে ব্যক্তির আমল অসম্পূর্ণ তাহার ঈমানও অসম্পূর্ণ হয় এবং যাহার আমল কামেল তাহার ঈমানও কামেল হয়।

তৃতীয়বার ঈমানের উল্লেখ করিয়া এদিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ঈমানের উপর স্থায়ী হইয়া যাওয়ার পর আমল অনুযায়ী তাহাদের ঈমানের উন্নতি লাভ হইতে থাকে। এর পর ঈমানের উল্লেখ করে নাই; বরং এহ্‌সানের উল্লেখ করিয়াছেন। শরীঅতের পরিভাষায় ইহার অর্থ এখলাছ (খাঁটি করা)। ইহা ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। ইহাকে ছিদ্‌কও বলা হয়। এখলাছবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ছিদ্দীক বলা হয়। অর্থাৎ, ঈমানের পর আমলে উন্নতি হইলে এহ্‌সানের স্তরে উন্নীত করা হয়। ঈমানের মধ্যে এই স্তরটিই কাম্য। যে ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হইতে পারে, সে খোদার মাহ্‌বূব (প্রিয়পাত্র) হইয়া যায়। এর পর সে আযাব ও গোনাহ্‌র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। কেননা, প্রিয়জনকে কেহই শাস্তি দেয় না। ঈমানের বারবার উল্লেখ সম্বন্ধে এই জওয়াব বর্ণিত হইল।

**তাকওয়ার বিভিন্ন স্তরঃ** তাকওয়ার বারবার উল্লেখ করার জওয়াবও উপরোক্ত জওয়াবের অনুরূপ। তাকওয়ারও বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। কুফর ও শির্ক হইতে বাঁচিয়া থাকা এক প্রকার

তাকওয়া। নেক আমল ত্যাগ না করা, নিষিদ্ধ কার্যে লিপ্ত না হওয়া এক প্রকার তাকওয়া। এর পর আমল যত ভাল হইবে, তাকওয়াও তত ভাল হইতে থাকিবে। এইরূপে তাকওয়া কামেল হইয়া গেলে ঈমানও কামেল হইয়া যাইবে। এর পর এহ্সান তথা এখলাছের স্তর হাছিল হইবে। ইহা যেরূপ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর তদ্রূপ তাকওয়ারও সর্বোচ্চ স্তর, ইহাই আসল লক্ষ্য। সুতরাং আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। ছিদ্কেরও এরূপ বিভিন্ন স্তর আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ছিদকের একটি মাত্র স্তর আছে এবং তাহাই চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট স্তর। অর্থাৎ, এহ্সানকেই শরীঅতে ছিদ্ক ও এখলাছ বলা হয়।

এখন জানা দরকার যে, হক তা'আলা যদি আয়াতে প্রথমে ছিদ্ক ও পরে তাকওয়ার উল্লেখ করিতেন, তবে শ্রোতাদের মনে বিরাট বোঝার চাপ পড়িয়া যাইত। তাহারা বুঝিত যে, আমাদিগকে প্রথম দিনেই কামেল হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইহা খুবই কঠিন ব্যাপার। এই কারণে প্রথমে ছিদ্কের উল্লেখ না করিয়া তাকওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিভিন্ন স্তর থাকায় এইরূপ বুঝিবার অবকাশ নাই যে, প্রথম দিনেই কামেল হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; বরং শ্রোতাগণ বুঝিবে যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর থাকার কারণে ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্তর অর্জন করিয়া ছিদ্কের স্তরে পৌঁছিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। ছিদ্কের স্তরে পৌঁছিতে পারিলেই কামেল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ইহার উপায় হইল বাহ্যতঃ তাঁহাদের সঙ্গলাভ করা। ইহাতে অন্তরের দিক দিয়াও তাঁহাদের ন্যায় হইয়া যাইতে পারিবে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'সাধ্যানুযায়ী খোদাকে ভয় কর' এই আয়াতের শানে-নুযূল হইতেও বুঝা যায় যে, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ 'খোদাকে যেরূপ ভয় করা দরকার, তদ্রূপ ভয় কর' আয়াতখানি নাযিল হইয়াছিল। ইহাতে ছাহাবাগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, অদ্যই যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। অথচ প্রথম পর্যায়ে এইরূপ তাকওয়া হাছিল করা খুবই কঠিন।

حق تقوى (যথাযথ তাকওয়া) ইহার এক অর্থ এই যে, যে তাকওয়া খোদার শানের যোগ্য—সেইরূপ তাকওয়া অবলম্বন কর, আয়াতে এই অর্থ বুঝানো হয় নাই। কারণ, এইরূপ তাকওয়া অবলম্বন করা মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। ইহা تكليف مالايطاق 'সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেওয়া' ছাড়া কিছুই নহে।

ইহার অপর অর্থ এই যে, মানুষের সাধ্যানুযায়ী যে তাকওয়া খোদার শানের যোগ্য, উহা অবলম্বন কর। বলা বাহুল্য, আয়াতে এই অর্থই বুঝানো হইয়াছে। এই প্রকার তাকওয়া মানুষের সাধ্যাতীত নহে। তথাপি প্রথম পর্যায়েই এই স্তরে পৌঁছিয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে সুকঠিন।

ছাহাবাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ ইহাই ছিল। তাঁহারা দেখিলেন, এই স্তরটি যদিও সাধ্যাতীত নহে, তথাপি প্রথম দিনেই এই তাকওয়া অর্জন করা মুশকিল। তাঁহারা فَاتَّقُوا اللّٰهَ নির্দেশসূচক পদ হইতে ইহাও বুঝিলেন যে, বিষয়টি এক্ষণি অর্জন করিতে বলা হইয়াছে। এজন্য নহে যে, আদেশসূচক শব্দ দ্বারা অবিলম্বে কাজ সমাধান করা বুঝায়; বরং সাধারণ বাক-পদ্ধতিতে ইহা প্রায়ই এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আদেশ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে ছাহাবাদের দৃষ্টি সর্বদা নিঃসন্দেহ দিকের প্রতি থাকিত। এই কারণে তাঁহারা আদেশকে অবিলম্বে অর্থে বুঝিয়া লইলেন।

আয়াতের এই আদেশটি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া করা হইলে আমরা মোটেই শঙ্কিত হইতাম না। আমরা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইতাম—আদেশে দ্রুততা বুঝায় না। কাজেই যথাযথ তাকওয়ার নির্দেশ দানের অর্থ এই নয় যে, এক্ষণি এই তাকওয়া অর্জন করিতে হইবে ; বরং আস্তে আস্তে অর্জন করিলেও চলিবে। ছাহাবাদের মনেও এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত খোদাভীতি ও সাবধানতার কারণে তাঁহারা আদেশকে দ্রুততার অর্থেই বুঝিয়া লইয়াছেন। কেননা, বাক-পদ্ধতিতে অবিলম্বে পালন অর্থেই আদেশের ব্যবহার বেশী।

আপনি যদি চাকরকে পানি আনিতে আদেশ দেন, আর সে পরের দিন পানি আনিয়া দেয়, তবে আপনি রাগান্বিত হইবেন নাকি ? নিশ্চয়ই হইবেন। ইহার উত্তরে চাকর যদি বলে, হুযূর, শুধু 'পানি আন' বলিয়াছিলেন, এখনই আন বলেন নাই। তবে চাকরের এই ওযর গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, এই স্থানে ধরন পদ্ধতিতে বুঝা যায় যে, এখানে আদেশ ( امر ) দ্রুততা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদ্রূপ অধিকাংশ আদেশ ( امر ) পদের ব্যবহার দ্রুততা অর্থেই হইয়া থাকে।

**একটি রসাত্মক গল্পঃ** এক্ষেত্রে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল। আমাদের এলাকায় 'হাফেয জানাযা' পদবীধারী জনৈক হাফেয সাহেব ছিলেন। তিনি গ্রামের একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। একদিন গ্রামবাসীরা একটি জানাযা মসজিদে আনিয়া ইমাম সাহেবকে নামায পড়াইতে বলিলে তিনি এই বলিয়া অজুহাত পেশ করিলেন, এক্ষণে একটি দো'আয় সামান্য সন্দেহ আছে। উহা উত্তমরূপে মুখস্থ করিয়া নামায পড়াইয়া দিব। অগত্যা গ্রামবাসীরা জানাযা লইয়া চলিয়া গেল এবং অন্য ইমাম দ্বারা নামায পড়াইয়া মৃতকে দাফন করিয়া দিল। পরদিন হাফেয সাহেব গ্রামবাসী-দিগকে বলিলেন, ভাই এবার দো'আটি মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। জানাযা কোথায় ? আন দেখি নামায পড়াইয়া দেই। তাহারা হাস্য সহকারে উত্তর দিল, সোবহানাল্লাহ্, আপনি মনে করিতেছেন যে, আপনার দো'আর ভরসায় আমরা জানাযা আচার (চাটনী) বানাইয়া রাখিয়াছি। আমরা তো গতকল্যই তাহা কবরস্থ করিয়া ফেলিয়াছি।

দেখুন, দ্রুততা ও অদ্রুততা—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য না বুঝার ফলেই সকলে হাফেয সাহেবকে বোকা বানাইয়াছে। এর পর হইতেই তাহার সহিত 'হাফেয জানাযা' উপাধিটি যুক্ত হইয়া যায়। ছাহাবাগণ উপরোক্ত আয়াতখানি দ্রুততা অর্থে বুঝিয়া মনে করিলেন যে, অদ্যই 'যথাযোগ্য তাকওয়া' অবলম্বন করা খুবই কঠিন ব্যাপার। কাজেই খোদার এই নির্দেশটি কিরূপে পালিত হইবে ? ইহাতে অপর একখানি আয়াত নাযিল হয়ঃ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ, 'যথাযোগ্য তাকওয়া' অদ্যই হাছিল করা উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্য হইল—যতটুকু তাকওয়া অবলম্বন করা তোমাদের দ্বারা সম্ভব—এক্ষণে ততটুকুই অবলম্বন কর। এর পর উন্নতি করিতে থাক এবং 'যথাযোগ্য তাকওয়া' পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাও।

**নস্‌খ (শরীঅতের আদেশ নিষেধ রহিতকরণ)-এর অর্থঃ** এই আলোচনায় ছাত্রদের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে যে, ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমোক্ত আয়াতঃ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ এখনও কার্যকরী আছে এবং উহা পালন করার আদেশ বহাল রহিয়াছে। অথচ হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, পরবর্তী আয়াতঃ اتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অবতীর্ণ হওয়ায় ঐ আয়াত রহিত হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রদের জানা উচিত যে, পূর্ববর্তীদের পরিভাষা অনুযায়ী 'নস্‌খ'-এর অর্থ শুধু পরিবর্তন ও রহিতসাধনই নহে; বরং তাহারা ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় বর্ণনাকেও 'নস্‌খ' বলিতেন। কাযী ছানাউল্লাহ্ সাহেব তফসীরে মাযহারীতে এই তথ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তথ্য,

খোদা তাঁহাকে সমুচিত পুরস্কার দান করুন; সুতরাং আলোচ্য আয়াতসমূহে বলিতে হইবে যে, اِتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আয়াতখানি নাযিল হইয়া প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। হাদীসে এই ব্যাখ্যাকেই 'নস্‌খ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নতুবা আমি فاتقوا الله حق تقاته আয়াতের যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই রহিত হওয়ার যোগ্য নহে।

ছাত্রদের আরও একটি বিষয় জানা উচিত যেঃ اتقوا الله مااستطعتم আয়াতে যে সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহার অর্থ এই নয় যে, যে পরিমাণে আমল পালন করিতে পার, পালন কর এবং যে পরিমাণ হারাম কাজ হইতে বাঁচিতে পার বাঁচিয়া থাক। তোমরা এতটুকুরই আদিষ্ট। এই অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপ্রসূত। কেননা, শরীঅতের যাবতীয় ওয়াজিব ও ফরয কর্তব্য পালন করা এবং যাবতীয় হারাম কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রত্যেকের উপরই ফরয। এই মুহূর্তেই সকলে এই সব বিষয়ে আদিষ্ট। ইহাদের মধ্য হইতে কোনটিই সামর্থ্যের বাহিরে নয়। আয়াতে উল্লিখিত সামর্থ্যের অর্থ এই যে, শরীঅতের আমলসমূহে যে ধরনের তাকওয়া তোমরা এখন অর্জন করিতে পার—তাহা এখনই অর্জন কর এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরনের তাকওয়া অর্জন করার জন্য সচেষ্ট থাক। ইহাতে বুঝা যায় যে, ধরন হিসাবে তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে—পরিমাণ হিসাবে নয়।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতে ছিদ্‌ক পরে ও তাকওয়া আগে উল্লেখ করাই বেশী সঙ্গত। ইহাতে শ্রোতাদের মনের উপর বোঝা চাপিয়া বসে না; বরং অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা মনে করিতে পারে যে, আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে তাকওয়ার স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া পূর্ণ তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছিতে হইবে।

আমি এই পর্যায়ে আলোচনা শেষ করিতেছি। সারকথা এই যে, পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। উহার উপায় হইল আমলে পূর্ণতা অর্জন করা, ফরয ও ওয়াজিব পালনে ত্রুটি না করা, হারাম কার্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আমল কামেল করার সময় নফ্‌সে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, কামেল ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকিয়া উহার প্রতিকার করা। কামেল ব্যক্তিদের দরবারে উপস্থিত হওয়া উচিত। ইহা সম্ভব না হইলে তাঁহাদের সহিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান রাখা দরকার। চিঠিপত্রে অনর্থক গল্প-গুজব লেখা সমীচীন নহে; বরং নিজকে রোগী ও তাহাদিগকে চিকিৎসক মনে করিয়া নিজের যাবতীয় অবস্থা জানাইতে থাকা উচিত। এর পর তাঁহারা যে সব উপদেশ দেন, সযত্নে তাহা অনুসরণ করা প্রয়োজন। খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার ইহাই সহজ পথ। ইহা হইতে সহজ পথ আর কেহ বলিতে পারিবে না। ওযরের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন দো'আ করুন, যেন হক তা'আলা আমাদিগকে সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি ও সহজ আমলের তওফীক দান করেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

— ■ —

www.almodina.com

# ধর্মের প্রতি মনোযোগ দানের আবশ্যকতা

■

ধর্মের প্রতি মনোযোগ দানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ৩রা যিলকদ ১৩২৯ হিজরী তারিখে মাদ্রাসা 'এহ্ইয়াউল উলূম' এলাহাবাদে প্রায় এক হাজার শ্রোতার সম্মুখে উপবিষ্ট অবস্থায় হযরত থানভী (রঃ) এই ওয়ায বর্ণনা করেন। প্রায় আড়াই ঘন্টায় ইহা শেষ হয়। মাওলানা সাঈদ আহ্মদ থানভী ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে একটি মারাত্মক রোগ দেখা দিয়াছে। তাহা হইল ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতা। এই রোগের ফলস্বরূপ আজ আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচিত হওয়ার যোগ্য নহি এবং ধর্মের অধিকাংশ বিষয় আমাদের আমল হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমরা না তো আকায়েদের পরওয়া করি, না আমল ভাল করার চেষ্টা করি এবং না পরস্পরে উত্তম চালচলনের প্রতি লক্ষ্য করি, না দুশ্চরিত্রতার জন্য দুঃখ করি! এখন আপনি নিজেই ভাবিয়া দেখুন, আমাদের অবস্থা ইসলামের কতদূর নিকটবর্তী এবং উহার সহিত কতখানি সামঞ্জস্যশীল।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَمَّابَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ — سورة بقره ايت ١٢٩

"হে পরওয়ারদেগার! এই দলের মধ্যে তাহাদেরই একজনকে এমন রাসূল নির্দিষ্ট করুন—যিনি তাহাদিগকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। নিশ্চয়, আপনিই মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।"

## ধর্মীয় লাভই প্রকৃত লাভ

ইহা একখানি আয়াত। কোরআন শরীফে ইহার সমার্থবোধক আরও আয়াত রহিয়াছে। সেগুলিতেও এই আলোচ্য বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত

www.almodina.com

ইসমাঈল (আঃ)-এর বাচনিক এই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে। কা'বা নির্মাণের সময় তাঁহারা যে সব দো'আ করিয়াছিলেন, এই দো'আটি উহাদের অন্যতম। তাঁহাদের পরবর্তী বংশধরগণ এই দো'আর ফল লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ নিজের জন্য ও পরে সন্তান-সন্ততিদের জন্য দো'আ করেন। সন্তানদের জন্য যে সব দো'আ করেন, উদ্ধৃত আয়াতের দো'আটি উহাদের পর্যায়ভুক্ত।

এই দো'আর সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আপন সন্তানদিগকে একটি ধর্মীয় উপকার পৌঁছাইয়াছেন। এই দো'আর ধারাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, ধর্মীয় উপকারই প্রকৃত ও প্রণিধানযোগ্য উপকার এবং সাংসারিক উপকার উহার অধীন ও উহার সহিত যুক্ত। হযরত ইবরাহীমের এই কার্যক্রম হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তিনি যেমন আপন বংশধরদের সাংসারিক মঙ্গলের জন্য দো'আ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ

وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ *

"এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা খোদার উপর ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনে, তাহাদিগকে বিভিন্ন ফলমূল দান কর।" তদ্রূপ তাহাদের ধর্মীয় মঙ্গলের জন্যও দো'আ করিয়াছেন। সাংসারিক মঙ্গলের জন্য দো'আ করায় বুঝা যায় যে, ইহাও কম জরুরী নহে। তাছাড়া ইহা জানা কথা যে, দুনিয়ার মঙ্গল সাধিত না হইলে খুব কম সংখ্যক লোকই খোদার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। অতএব, রুযি-রোযগার বৃদ্ধির সহিত স্বাস্থ্যের জন্যও খোদার নিকট দো'আ করা উচিত।

এই কারণেই হুযূর (দঃ) একদা জনৈক ছাহাবীকে খুব দুর্বল হইয়া পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ 'তুমি দো'আ করিয়াছ কি?' ছাহাবী উত্তর দিলেন, 'হাঁ, করিয়াছিলাম।' হুযূর (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "কি দো'আ করিয়াছিলে?" উত্তর হইল, আমি দো'আয় বলিয়াছিলাম, হে খোদা! আমাকে শাস্তি যাহা দিবার হয়, দুনিয়াতেই দিয়া দাও। ইহাতে হুযূর (দঃ) ছাহাবীকে সতর্ক করিয়া দেন। নিঃসন্দেহে ইহা মারাত্মক ভুল। কেননা, মানুষ দুর্বল এবং জন্মগতভাবে সে অপরের প্রতি নির্ভরশীল।

জনৈক ব্যক্তি একদা আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমার খুব বেশী দরকার, দশটি টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিন। সে এদিক ওদিকের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল এবং নিজেকে দুনিয়াত্যাগী সাধু যাহির করিয়া বলিতে লাগিল; জান্নাতের কি পরওয়া, দোযখেরই বা কি ভয়? আমি বলিলাম, মিয়া থাম, তুমি দশ টাকার ব্যাপারেই যখন ধৈর্য ধরিতে পারিলে না, তখন জান্নাতের ব্যাপারে কি ধৈর্য ধরিবে? এতই অমুখাপেক্ষী হইলে দশ টাকার ব্যাপারেই ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে।

বাস্তবিক, মানুষ এতই মুখাপেক্ষী যে, তাহার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই প্রয়োজন; বরং দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাতের বেশী মুখাপেক্ষী। এই কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়ার জন্য দো'আ করার সাথে সাথে আখেরাতের জন্যও দো'আ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, আমাদিগকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই তিনি এইরূপ করিয়াছেন।

এখানে 'আওলাদ' (সন্তান) ব্যাপক অর্থে মনে করিতে হইবে। প্রকৃত সন্তান হউক কিংবা ধর্মীয় সন্তান হউক। অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত সন্তানও সন্তান হইতে পারে না। তাই হাদীসে বলা হইয়াছে, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقِىْ فَهُوَ اٰلِىْ 'আমার পরিবারবর্গের মধ্যে যে আমার মনোনীত পথে চলে, সেই

www.almodina.com

আমার পরিবারবর্গের মধ্যে গণ্য।' কেহ কেহ এই হাদীসটিকে ব্যাপক অর্থে ধরিয়া লইয়া মনে করে যে, যে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিবে, সেই হযরতের পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। প্রকৃত বংশগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক। আমার মতে ইহার অর্থ এত ব্যাপক নহে; বরং ইহা শুধু পরিবারের লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উদ্দেশ্য এই যে, পরিবারের লোকজনের মধ্যেও যাহারা হযরতের অনুসরণ করিবে, শুধু তাহারাই প্রকৃত পরিবারভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ, শুধু সন্তান হওয়ার কারণেও তাঁহারা মর্যাদাসম্পন্ন হইবেন; কিন্তু পূর্ণ মর্যাদা শুধু অনুসরণ দ্বারাই লাভ হইবে। অতএব, হাদীসে من سلك শুধু পরিবারের লোকদের জন্যই বলা হইয়াছে। মোটকথা, নবীদের যে সব সন্তান অনুসরণ করে, তাহারাই মকবূল ও নবীর প্রকৃত সন্তান বলিয়া বিবেচিত হয়। নতুবা তাহারা ভুল ছাপা কোরআনের ন্যায়। উহার আদব করাও জরুরী নহে; আবার উহার সহিত বে-আদবীও করা যায় না। আদব জরুরী না হওয়ার কারণ এই যে, উহা শুদ্ধ কোরআন নহে। আর বে-আদবী এই জন্য করা যায় না যে, উহাতে কোরআনের কিছু কিছু অংশ আছে। মোটকথা, ধর্মীয় উপকারের দিকেই নবীদের লক্ষ্য বেশী থাকে। তাঁহাদের সন্তানদের উচিত পূর্ণরূপে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আপন সন্তানদের জন্য উপরোক্ত দো'আ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, নিজ সন্তানদের দুনিয়া অপেক্ষা ধর্মীয় মঙ্গলের প্রতি বেশী যত্নবান হইবে।

**সন্তানসন্ততির ধর্মীয় প্রতিপালনঃ** সন্তানসন্ততির বেলায় আমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই শিক্ষার কতটুকু অনুসরণ করি, এক্ষণে তাহাই দেখা উচিত। আমি একথা বলি না যে, মানুষ আপন সন্তানদের হক আদায় করে না। তবে তাহাদের অধিকতর যত্ন যে কেবল দুনিয়ার উন্নতির জন্যই, তাহা না বলিয়া পারা যায় না। ছেলে কিরূপে চারি পয়সা রোজগার করার যোগ্য হইবে—শুধু এই ক্ষেত্রেই অধিক চেষ্টা করা হয়। এইরূপ যোগ্য বানাইয়া দেওয়ার পর তাহারা মনে করে যে, ছেলের যাবতীয় ওয়াজিব হক আদায় হইয়া গিয়াছে। বাকী অন্যান্য চারিত্রিক সংশোধন সে নিজে নিজেই করিতে পারিবে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ধর্মের গুরুত্ব মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। ফলে তাহারা আপাদমস্তক দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কেহ মনে করিতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়ার প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য তিনি দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ দেন নাই। কোরআন ও যুক্তি এই ধারণাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি وارزق اهله من الثمرات বলিয়া সন্তানদের সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য দো'আ করিয়াছিলেন। যুক্তি এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) হক তা'আলার প্রতিনিধি ছিলেন। হক তা'আলা যেমন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে মানুষের লালন-পালন করেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রতিনিধিও উভয়ক্ষেত্রে লালন-পালন করেন। কেননা, প্রতিনিধিগণ মানব-চরিত্রের সংশোধনের নিমিত্তই প্রেরিত হন।

**দুনিয়া ও আখেরাতের সংশোধনঃ** যে পর্যন্ত দুনিয়া ও আখেরাত উভয় বিষয়ের সংশোধন না হয়, সেই পর্যন্ত পূর্ণ সংশোধন সম্ভবপর নহে। ইতিহাস ও নবীদের শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নবীগণ দুনিয়া সম্বন্ধেও পুরাপুরি জ্ঞান রাখিতেন। কিন্তু দুনিয়ার জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়—অনেকেই এ বিষয়ে ভ্রমে পতিত আছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, নবীগণ চাকুরী ও শিল্পকলার কৌশল শিক্ষা দিবেন। অনেকেই এই অর্থ বুঝিয়া বুযুর্গদের সমালোচনা করিয়া বলে যে, তাঁহারা দুনিয়া সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। দুনিয়ার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য হওয়া

সত্ত্বেও তাঁহারা এদিকে ভ্রুক্ষেপও করেন না। বন্ধুগণ, দুনিয়ার আবশ্যকতা অস্বীকার করি না, কিন্তু দেখিতে হইবে যে, আবশ্যকতা কাহাকে বলে? জীবিকা উপার্জনের কলা-কৌশল বর্ণনা করা ও উহার প্রতি উৎসাহ দান করা আলেমদের দায়িত্ব নহে।

উদাহরণতঃ, হাকীম আবদুল আজীজ ও হাকীম আবদুল মজীদ চিকিৎসা শাস্ত্রে খুবই পারদর্শী। রোগব্যাধি নিরূপণ করাই তাঁহাদের কাজ। মনে করুন, জনৈক রোগী তাঁহাদের নিকট আসিল। হাকীম সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পুরাতন জ্বর নির্ণয় করিলেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। রোগী চলিতে চলিতে পথে জনৈক মুচির সাক্ষাৎ পাইল। মুচি তাহাকে রোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তরে বলিল, হাকীম সাহেব পুরাতন জ্বর নির্ণয় করিয়াছেন। মুচি বলিল, হাকীম সাহেব জুতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি? উত্তর হইল, না, জুতা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ইহা শুনিয়া মুচি বলিতে লাগিল, যিনি এতটুকু প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তিনি হাকীম হইতে পারেন না। লোকের পায়ে জুতা আছে আর এই ব্যক্তির পায়ে জুতা নাই। তাহার জুতা পরিধান করা উচিত কিনা—হাকীম সাহেব এ বিষয়ে তো কোন চিন্তা করেন নাই।

জিজ্ঞাসা করি, এই মুচি সম্বন্ধে আপনি কি ফতওয়া দিবেন? তাহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া স্বীকার করিবেন কি? কখনও নহে। সকলেই তাহাকে পাগল আখ্যা দিয়া বলিবে যে, চিকিৎসা শাস্ত্র ও উহার কার্যক্রম সম্বন্ধে সে বিন্দু-বিসর্গও খবর রাখে না। হাঁ, হাকীম সাহেব যদি ব্যবস্থাপত্রে এই যুক্তিহীন কথা লিখিয়া দিতেন যে, সাবধান, জুতা পরিধান করিবে না—তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত। নতুবা তাহাকে দোষী বলা যায় না। তিনি আপন কর্তব্য যথাযথ সমাধা করিয়াছেন।

তদ্রূপ দুনিয়ার প্রতি উৎসাহ দান করা আলেমদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহা পালন না করার জন্য তাহাদিগকে দোষী বলা যাইত কিংবা দুনিয়া উপার্জনে বাধা দান করিলেও তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যাইত। যদি বলেন যে, আলেমগণ তো বাধা দিয়া থাকেন, তবে আমি বলিব যে, তাঁহারা অকারণে এরূপ করেন না। উদাহরণতঃ যদি কেহ এইভাবে জুতা সেলাই করায় যে, লোহা চামড়া ছেদ করিয়া উপরে উঠিয়া আসে, তবে হাকীম আবদুল মজীদও এইভাবে জুতা সেলাই করাইতে বাধা দিবে। কারণ, ইহাতে পায়ে যে জখম হইবে, উহার বিষ সারা শরীরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। আপনারাও দুনিয়ারূপ জুতা এইভাবে সেলাই করাইতেছেন যে, উহাতে দ্বীন বরবাদ হইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় আপনাদিগকে বাধা দান করা আলেমদের কর্তব্য। সুতরাং এই বাধা দান বিনা কারণে নহে।

اگر بینم که نابینا و چاهست ـ اگر خاموش بنشینم گناهست

'অন্ধকে কূপের দিকে যাইতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা ভীষণ অন্যায়।'

মোটকথা, আলেমদিগকে দুনিয়ার প্রতি উৎসাহ দান করিতে বলা নিতান্তই ভুল। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণও দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি আমাদের মত যত্নবান ছিলেন—এই ধারণাই এহেন ভ্রমের উৎস। অথচ ইহা ঠিক নহে। কোন নবী অথবা কোন সংস্কারক কোন দিন জীবিকা উপার্জনের পন্থা লিখিয়াছেন কি? কোথাও এরূপ পাওয়া যাইবে না। হাঁ, তাঁহারা চরিত্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে করণীয় আমল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লাঙ্গল চালানো ও বীজ বপনের নিয়ম-কানূন কেহই বিবৃত করেন নাই, ইহা নবী বুযুর্গদের কাজ নহে। তবে দুনিয়ার উপার্জনের যে সব অংশ আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর, তাহা ব্যক্ত করত উহা আমলে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই আলোচনা চিকিৎসক কর্তৃক রোগীকে মাংস খাইতে নিষেধ করার ন্যায়। ক্ষতিকর হইলে রোগীকে

নিষেধ করা চিকিৎসকের দায়িত্ব, কিন্তু মাংস রন্ধন করার কলা-কৌশল শিক্ষা দেওয়া কিছুতেই তাহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং দুনিয়া উপার্জন সম্বন্ধে নবীগণ শুধু উপকারী দিকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন এবং ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। মোটকথা, নবীগণ স্বীয় সন্তানদের বেলায় ধর্মীয় উপকার লাভের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। দুনিয়া লাভের প্রতিও যে তাঁহারা কিঞ্চিৎ লক্ষ্য দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

**ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতাঃ** ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ, 'হে খোদা! এই শহরবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনিবে, শুধু তাহাদিগকেই খাদ্য-শস্য দান কর।' এখানে তিনি অনুগত সন্তানদের জন্য দো'আ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার নিকট ধর্ম কত প্রিয় ছিল। তিনি নাফরমানের জন্য দো'আ করাও পছন্দ করিলেন না। যদিও খোদা তা'আলা মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে তারতম্য করেন নাই; খোদা বলেনঃ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا "যাহারা কাফের, আমি তাহাদিগকেও দুনিয়াতে কিছুদিনের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিব।" এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আপন রহমতকে ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাফেরেরা খোদাদ্রোহী হওয়ার কারণে ইবরাহীম (আঃ) তাহাদের জন্য দো'আ করেন নাই। ইহা হইতে নবীদের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বুযুর্গদের রুচিও এইরূপ এবং এইরূপ হওয়াও উচিত। খোদাদ্রোহীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা চাই না এবং তাহাদের জন্য দো'আও করা উচিত নহে। ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে খোদা তা'আলা কাফেরদের জন্য দো'আ করার আদেশ দেন নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, উপরোক্ত রুচি খোদার নিকট গ্রহণীয়। অতএব, অনুগতদের জন্য দো'আ করা ও বিদ্রোহীদিগকে খোদার হাওয়ালা করিয়া দেওয়াই উচিত। যাহা হউক, এই বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইল।

উদ্দেশ্য হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর বিষয়বস্তু খুবই প্রণিধানযোগ্য, এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করা সমীচীন মনে করি। বর্তমানে আমরা একটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহা হইল ধর্মের প্রতি অমনোযোগিতা। ইহার ফলস্বরূপ আজ আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচিত হওয়ার যোগ্য নহি এবং ধর্মের অধিকাংশ বিষয় আমাদের আমল হইতে বাদ পড়িয়াছে। দেখুন যাহার কাছে প্রয়োজন হইতেও বেশী ধনদৌলত থাকে, তাহাকেই ধনী বলা হয়। দুই-চারি পয়সা লইয়া কেহ ধনী হইতে পারে না। নতুবা জগতের সকলকেই ধনী বলিতে হইবে, অথচ তাহা বলা হয় না; বরং মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—ধনী ও দরিদ্র। অতএব, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মাল থাকিলেই যেমন মালদার হওয়া যায়, তদ্রূপ ঈমানদারও শুধু ঐ ব্যক্তিই, যে আকায়েদ, আমল ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে পুরাপুরি শরীঅতের অনুসারী। مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "যে-ই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিবে, সে-ই জান্নাতে যাইবে।" অনেকেই এই হাদীস দৃষ্টে শুধু কলেমা পড়াকেই ঈমান নাম দিয়াছে। কিন্তু আসলে ইহা ঈমান নহে। যদিও হাদীসের এই উক্তি প্রকৃত সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা দ্বারা যে উদ্দেশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ "সত্য উক্তি দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্য সম্পাদন করাও বলা যায়।" এই উক্তি দ্বারা কয়েকটি ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রমাণ করা হয়। প্রথমতঃ, এই হাদীস দৃষ্টে আমলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা স্বয়ং ঈমানের আসল কলেমাও সংক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ, অনেকের মতে ঈমানের কলেমার মধ্যে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ 'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র

রাসূল' বলার প্রয়োজন নাই। (নাঊযুবিল্লাহ্)। আমি এই ধরনের বক্তৃতা মুদ্রিত আকারে দেখিয়াছি। বক্তৃতায় এই হাদীসকে দলীলরূপে পেশ করিয়া রাসূলের উপর ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হইয়াছে।

এক সফরে জনৈক ব্যক্তি আমাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। প্রশ্নকারী এই রোগে আক্রান্ত ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি কেহ বলে, আমি 'ইয়া-সীন' পড়ি, তবে ইহার অর্থ কি ইহাই হয় যে, সে কেবল 'ইয়া-সীন' 'ইয়া-সীন' উচ্চারণ করিতে থাকে? ইহার অর্থ কি পূর্ণ ইয়া-সীন সূরা পাঠ করা হয় না? লোকটি উত্তরে বলিল, 'ইয়া-সীন' পড়ার অর্থ তো পূর্ণ সূরা পাঠ করাই হয়। আমি বলিলাম, ঠিক তেমনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়ার অর্থ হইল পূর্ণ কলেমা পাঠ করা, তবে পরিচয়ের জন্য শুধু একটি অংশ বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট হয়। অন্য অংশ আপনাআপনি বুঝে আসিয়া যায়।

এ সমস্ত লোকের لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পড়ার অর্থ বুঝিতে যাইয়া আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একদা রামপুর হইতে জনৈক ছাত্র আমার নিকট চিঠি লিখিল যে, আমি অমুক বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন আছি, তজ্জন্য কোন একটি দো'আ বলিয়া দিন। আমি লিখিলাম যে, নিয়মিত 'লা-হাওলা' পড়। কিছুদিন পর সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবার উদ্বেগের কথা জানাইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইতিপূর্বে আমি তোমাকে কি করিতে বলিয়াছিলাম? উত্তরে সে বলিল, 'লা হাওলা' পড়িতে বলিয়াছিলেন। আমি উহা রীতিমতই পড়িতেছি। কথা প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপে পড়? সে জওয়াবে বলিল, 'লা-হাওলা' 'লা-হাওলা'—এইরূপে পড়ি।

এই ক্ষুদে বুযুর্গ 'লা-হাওলা' পড়ার যেরূপ অর্থ বুঝিয়াছিল, উপরোক্ত ব্যক্তিগণ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়ার অর্থও ঠিক তেমনি বুঝিয়াছে। অথচ 'লা-হাওলা' একটি পূর্ণ দো'আর নাম মাত্র। এমনিভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিয়াও ঐ পূর্ণ কলেমা বুঝানো হইয়াছে, যাহাতে 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অতএব, উক্ত হাদীসকে দলীল হিসাবে খাড়া করা ঠিক নহে। তাছাড়া এ ব্যাপারে অন্যান্য দলীলও দেখা উচিত। মেশকাত শরীফের ঈমান অধ্যায়ের প্রথম হাদীসে রহিয়াছেঃ

شَهَادَةُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

মোটকথা, দুনিয়ার বিষয়াদিতে মগ্ন হইয়া থাকার কারণেই এহেন মারাত্মক ভ্রান্তি জন্ম লাভ করিতেছে। ইহার প্রতিকার হইল ধর্মের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করা এবং ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা।

**রাসূলকে অস্বীকার করার পরিণামঃ** এহেন মনোভাবসম্পন্ন এক ব্যক্তির সহিত একদা আমার সাক্ষাৎ ঘটে। সে বলিল, রাসূলকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই। মুক্তির জন্য তওহীদে বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট। আমি বলিলাম, প্রথমতঃ, কোরআন, হাদীস ও যুক্তি তোমার এই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। দ্বিতীয়তঃ, রাসূলকে অস্বীকার করিলে খোদার খোদায়ীত্বকে অস্বীকার করা হয়। কেননা, খোদাকে স্বীকার করার অর্থ শুধু খোদার অস্তিত্বকে স্বীকার করাই বুঝায় না; বরং পূর্ণ সত্তা ও যাবতীয় গুণাবলীতেও তাঁহাকে একক মানিতে হইবে। কেহ তাঁহার সত্তাকে স্বীকার করিয়া গুণাবলী অস্বীকার করিলে সে যে কাফের, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। উদাহরণতঃ, কেহ বাদশাহ্কে বাদশাহ্ মানিয়া তাহার শাহী ক্ষমতাবলী অস্বীকার করিলে বলা হইবে যে,

সে বাদশাহ্‌কেই মানে নাই। সুতরাং হক তা'আলাকে স্বীকার করা ও তওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ এই যে, পূর্ণত্বের প্রত্যেকটি গুণেও তাঁহাকে গুণান্বিত বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা শুনিয়া লোকটি বলিল, নিশ্চয়ই এরূপ স্বীকার করা জরুরী। অতঃপর আমি বলিলাম, সত্যবাদিতাও একটি পূর্ণত্বের গুণ। হক তা'আলাকে এই গুণেও গুণান্বিত মানিতে হইবে। সে বলিল, হাঁ, মানিতে হইবে বৈ কি। আমি বলিলাম, কোরআন শরীফে বলা হইয়াছেঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ 'মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল'। কোরআনের এই উক্তিও মানিতে হইবে। ইহা অস্বীকার করিলে তওহীদে বিশ্বাসী হইতে পারিবে না। কেননা, এইভাবে খোদার সত্যবাদিতা গুণকে অস্বীকার করা হইবে। অথচ ইহা স্বীকার করা জরুরী। এর পর আমি তাহাকে বলিলাম, ইহার উত্তরের জন্য আমি তোমাকে দশ বৎসর সময় দিতেছি। আকায়েদ সংক্ষেপ করা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বর্ণিত হইল। যাহার দৃষ্টান্তসমূহ আপনারা শুনিলেন।

**আমল সংক্ষেপ করার প্রতিক্রিয়াঃ** আমলও সংক্ষেপ করা হইয়াছে। কেহ আমল ফরয বলিয়াই স্বীকার করে না। আবার কেহ কেহ স্বীকার করিলেও কার্যক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থা অস্বীকারকারীদের ন্যায়। কোরআনের আয়াত দ্বারা এই উভয় প্রকার লোকদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

এক্ষণে من قال لااله الا الله دخل الجنة "যে কেহ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিবে, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"—এই হাদীসের অর্থ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। কেহ বিবাহ করিলে বিবাহে ঈজাব ও কবূলের জন্য মাত্র দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। ঈজাব-কবূলের পর স্ত্রী স্বামীর নিকট খোরপোষ দাবী করিলে যদি স্বামী বলে, আমি খোরপোষ দেওয়া কবূল করি নাই, তবে ইহার উত্তরে স্ত্রী কি বলিবে ? সে ইহাই বলিবে যে, যদিও তুমি পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি বিষয় কবূল কর নাই, তথাপি আমাকে কবূল করার ফলে সবগুলিই কবূল করা হইয়াছে।

আমি সংক্ষেপকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করি—আপনারাও সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিলে কি বলিবেন ? ইহাই বলিবেন যে, এক কবূলই সবগুলিকে কবূল করার শামিল। ঠিক তেমনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার ফলেই সমস্ত আকায়েদ ও আমলের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। হাদীসে এই বিষয়টিই বুঝানো হইয়াছে। এর পর আমলকে ঈমানের অংশ বলা হউক, কিংবা জরুরী শর্ত বলা হউক, সর্বাবস্থায় ঈমানে সংক্ষেপ করা মারাত্মক ভ্রান্তি। ঈমানের যথার্থ শান বর্তমান থাকিলেই উহাকে ঈমান বলা হইবে।

আমরা মুসলমান বলিয়া দাবী করি ; কিন্তু লক্ষ্য করা দরকার যে, আমাদের অবস্থা ইসলামের কতটুকু নিকটবর্তী এবং উহার সহিত কি পরিমাণ খাপ খায়। আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের বেশী মালের মালিক, তাহাকেই মালদার বলা হয়। ইসলামের বেলায়ও এরূপ বুঝিতে হইবে। আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা। আমরা ধর্মের প্রতি যারপরনাই অমনোযোগী। আমরা না আকায়েদের পরওয়া করি, না আমলের চিন্তা করি, না উত্তম চালচলনের জন্য চেষ্টা করি, না অসচ্চরিত্রের জন্য দুঃখ করি।

এই অবস্থা দৃষ্টেই এখন উপরোক্ত আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছি। আয়াতখানি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বাচনিক উদ্ধৃত করিয়াছি—যাহাতে বুঝা যায় যে, আয়াতখানি প্রাচীন কাল হইতেই স্থিরীকৃত। এরূপ করার যদিও প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু আজকাল রুচি এতই বদলাইয়া গিয়াছে যে, নিজ শরীঅতের কোন উত্তম বিষয়কেও ঐতিহাসিক নযীর ব্যতীত স্বীকৃতি দেওয়া

হয় না। এই কারণেই হযরত ইবরাহীমের উল্লেখ করিয়াছি। এখন লক্ষ্য করুন—এই দো'আয় ঈমানের কোন কোন অঙ্গকে জরুরী বলা হইয়াছে।

**হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আর ব্যাখ্যাঃ** হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে তাহাদেরই একজনকে রাসূলরূপে প্রেরণ করুন। তিনি সকলকে আপনার আহ্কাম শুনাইবেন, কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে কুকার্য হইতে পবিত্র করিবেন। নিঃসন্দেহে আপনি পরম ক্ষমতাবান ও প্রজ্ঞাময়। আপনি হেকমত অনুযায়ী কাজ করেন এবং এইরূপ করাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং (আশা করা যায়) এই দো'আ নিশ্চয়ই আপনি কবূল করিবেন। অনুবাদ হইতে জানা যায় যে, আয়াতে রাসূলের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে রাসূল বলিয়া আমাদের হুযূর (দঃ)-কে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, দো'আ করিয়াছেন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)। কাজেই রাসূল তাঁহাদেরই বংশোদ্ভূত হইতে হইবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে যদিও অন্যান্য আরও কয়েকজন নবী আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই হযরত ইসহাকের বংশধর ছিলেন। হযরত ইসমাঈলের বংশধরের মধ্যে শুধু আমাদের হুযূর (দঃ)-ই নবীরূপে আবির্ভূত হন। সুতরাং দো'আয় তাঁহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

নিঃসন্দেহে একজন রাসূল পাঠাইতে দো'আ করা বিরাট অনুগ্রহ প্রার্থনা করার শামিল। নতুবা এইরূপও বলিতে পারিতেন—সকলকে পবিত্র করুন, তাহাদিগকে কিতাব দান করুন এবং কবূল করুন। তবে ওহীর মধ্যস্থতায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা 'এলহাম' (আন্তরিক প্রেরণা হইতে উদ্ভূত শিক্ষা) হইতে উত্তম। বাহ্যতঃ যদিও মনে হয় যে, মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা দ্বারা অধিকতর নৈকট্য অর্জন করা যায়। এই কারণেই অধিকাংশ সাধারণ ও কতক বিশেষ ব্যক্তিরা এই অভিমতই পোষণ করেন। তাহাদের এই অভিমতের ফলে এখন নবীদের শিক্ষার তুলনায় বুযুর্গদের শিক্ষাকেই বেশী মূল্য দেওয়া হয়।

আমার উস্তাদ মাওলানা ফাতহে মোহাম্মদ সাহেবের নিকট জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি দারিদ্র্য ও ঋণভারে জর্জরিত। আমাকে একটি দো'আ বলিয়া দিন—যাহার বরকতে ঋণ আদায় হইয়া যায়। উস্তাদ বলিলেন, এই দো'আটি নিয়মিত পাঠ করঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

তিনি আরও বলিলেন যে, দো'আটি হাদীসে বর্ণিত আছে। হাদীসের নাম শুনা মাত্রই লোকটির চেহারা বদলাইয়া গেল। মনে হইল যেন তাহার উৎসাহ দমিয়া গিয়াছে। সে বলিল, হাদীসে অনেক দো'আই তো আছে। আপনি নিজের তরফ হইতে এমন একটি দো'আ বলুন—যাহা আপনি বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ফাসেকসুলভ উক্তি শুনিয়া মাওলানা রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, ছিঃ হুযূর (দঃ)-এর শিক্ষার উপর অন্যের শিক্ষাকে প্রাধান্য দাও!

হুযূর (দঃ)-এর শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে না করা উপরোক্ত অভিমতেরই প্রতিক্রিয়া। লক্ষ্য করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন, মূর্খ এবাদতকারীরা কোরআন ও নামাযের তুলনায় পীরের দেওয়া ওযীফা এবং নফল এবাদত অনেক বেশী আগ্রহ সহকারে পালন করে। একদা জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত গর্বের সহিত আমাকে বলিয়াছিল, কোন ওয়াক্তের নামায কাযা হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু পীরের দেওয়া ওযীফা কখনও কাযা হইতে দেই না। ইহার পরিষ্কার অর্থ এই যে, হুযূর (দঃ)-এর

চেয়ে পীরের সহিত সম্পর্ক বেশী। অবশ্য ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, পীরের সহিত সম্পর্ক না হইলে হুযূর (দঃ)-এর সহিতও সম্পর্ক কম হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, পীরের সম্পর্ক হুযূরের সম্পর্ককেও ছাড়াইয়া যাইবে। گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی "পদ মর্যাদার পার্থক্য না করা ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর।"

**উত্তম শিক্ষা ঃ** মোটকথা, মানুষ ধারণা করে—এলহামে মধ্যস্থতা নাই এবং ওহীতে মধ্যস্থতা আছে। সুতরাং যাহাতে মধ্যস্থতা কম, উহাতে নৈকট্য বেশী। কিন্তু শায়খ আকবর লিখিয়াছেন যে, যে শিক্ষার মধ্যস্থতা আছে, উহা মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা হইতে উত্তম। তবে দেখিতে হইবে যে, মধ্যস্থতা কাহার। মামূলী ব্যক্তির মধ্যস্থতা হইলে মধ্যস্থতাহীন শিক্ষাই উত্তম। যে শিক্ষায় হুযূর (দঃ)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তি মধ্যস্থতা করেন, উহা মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা হইতে উত্তম না হইয়া পারে না।

ইহার কারণ এই যে, ওহীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, উহাতে অসম্পূর্ণ যোগ্যতার কারণে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে ওহীর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত শিক্ষায় ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। এর পর হুযূর (দঃ)-এর নিকট হইতে আমাদের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত যে সব মধ্যস্থতা আছে, উহাতেও ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

এতদুভয়ের মধ্যে আরও একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। তাহা এই যে, খোদা তা'আলা হুযূর (দঃ)-কে সাক্ষাৎ রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মধ্যস্থতায় যে সব শিক্ষা পাওয়া যাইবে, উহাতে 'এবতেলা' তথা বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলার উদ্দেশ্য থাকে না। পক্ষান্তরে মধ্যস্থতাহীন শিক্ষা পরীক্ষামূলক হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল—হুযূর (দঃ) তাহাকে বলিতেছেন, শরাব পান কর। আলেমদের নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করিলে সকলেই বলিল, শরাব হারাম। কাজেই হুযূর (দঃ) এরূপ বলিতে পারেন না। স্বপ্ন তোমার পুরাপুরি স্মরণ নাই। আমি বলি যে, এখানে শরাব দ্বারা সম্ভবতঃ খোদার এশ্‌ক বুঝানো হইয়াছে। দেখুন, এই মধ্যস্থতাহীন শিক্ষার মধ্যে বুঝে কিনা তাহা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য রহিয়াছে। অথচ হুযূর (দঃ)-এর মধ্যস্থতাসম্পন্ন শিক্ষার মধ্যে এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় না।

এই কারণেই স্বপ্নে হুযূর (দঃ)-কে দেখিলে তাহা শয়তান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ, শুধু হেদায়ত করাই তাঁহার শান। ইহাতে শয়তানী-মিশ্রণ থাকিতে পারে না। বুযুর্গগণ লিখিয়াছেন, শয়তান স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া 'আমি খোদা' বলিতে পারে, কিন্তু 'আমি নবী' বলিতে পারে না। কারণ, হক তা'আলা পরীক্ষার খাতিরে গোমরাহ্‌কারী গুণেও গুণান্বিত। তাছাড়া ইহাতে স্বপ্নে দর্শনকারীর নিকট শয়তানের চালাকী ধরা পড়িয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। কেননা, খোদা তা'আলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র। অথচ স্বপ্নে যাহাকে দেখিবে, সে ত্রুটিমুক্ত নহে। পক্ষান্তরে শয়তান 'আমি নবী' বলিলে তাহার চালাকী ধরা পড়ার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে হুযূর (দঃ)-এর মধ্যস্থতাকে যাবতীয় কুচক্র হইতে নিরাপদে রাখা হইয়াছে। অতএব, বুঝা গেল যে, আঁ-হযরতের মধ্যস্থতা একটি বিরাট নেয়ামত।

এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই ইবরাহীম (আঃ) খোদার নিকট সরাসরি কিতাব না চাহিয়া হুযূর (দঃ)-এর মধ্যস্থতায় চাহিয়াছেন। তাছাড়া মানুষ স্বভাবতঃই স্বজাতির অনুসরণ করে। অর্থাৎ,

অনুসরণের জন্য তাহাদের সম্মুখে নমুনা থাকা প্রয়োজন। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা করার দরকার নাই। মানুষ ও অন্যান্য জানোয়ারদের মধ্যে এইখানেই তফাৎ। জানোয়ারদের মধ্যে যে সব কলা-কৌশল দেখা যায়, সমস্তই সহজাত গুণ—উপার্জিত নহে। এই কারণেই জন্মলাভের পরই হাঁসের বাচ্চা পানিতে সাঁতার দিতে পারে। অথচ মানুষ যত নামকরা সাঁতারুই হউক না কেন, তাহার ছেলে জন্মগতভাবেই সাঁতারু হয় না। কেননা, মানুষের কলা-কৌশল সহজাত নহে; বরং কোন না কোন নমুনা দেখিয়া তাহা শিক্ষা করিতে হয়। এই নমুনার প্রয়োজন হেতুই মানুষ কিতাবাদি পাঠ করিয়া ততটুকু উপকৃত হইতে পারে না, যতটুকু কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে থাকিয়া হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকের পক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।

**শিক্ষা দীক্ষার আদব ঃ** অধিকাংশ লোক সন্তানসন্ততির আরাম আয়েশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগকে সৎ-সংসর্গে রাখার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় না। অধিকন্তু অনেকেই ছেলেদিগকে চরিত্রভ্রষ্ট শিক্ষকদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। তাহাদের ধারণা—ছেলে এখন কচি। কাজেই ক্ষতি কি? অথচ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রারম্ভ খারাপ হইলে আসল লক্ষ্যও খারাপ হইতে বাধ্য। স্মরণ রাখ, خاك از تودهٔ كلاں بردار —"বড় স্তূপ হইতেই মাটি গ্রহণ করা উচিত।" কামেলের সংসর্গে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিলে ছেলে কামেল না হইলেও অন্ততঃ যোগ্যতাসম্পন্ন হইবে। কেননা, কামেল ব্যক্তিরা স্বীয় বিদ্যার স্বরূপ খুলিয়া ধরেন। কামেল না হইলে তাহা হয় না। তবুও ইহার প্রতি লোকের কিছু কিছু দৃষ্টি আছে। কিন্তু চরিত্রহীন লোকদের সংসর্গে থাকিলে চরিত্রের যে ভয়ানক ক্ষতি সাধিত হয়, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

আমাদের এখানে একজন শিক্ষক আছেন। শুনা যায় যে, তিনি অন্য একটি মক্তবের বিছানা, চাটাই ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য ছাত্রদিগকে পাঠাইয়া দেন। বলুন, শৈশবেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে বড় হইয়া কি আত্ম-সংশোধন হইবে? দুঃখের বিষয়, এদিকে মোটেই লক্ষ্য করা হয় না। অনেকে বলে—চঞ্চল হওয়াই বালকদের স্বভাবধর্ম। অথচ চঞ্চলতা ও দুষ্টামি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক জিনিস।

মোটকথা, মানুষ স্বজাতির নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অন্যকে যাহা করিতে দেখে, নিজেও তাহাই করে। আমার মনে পড়ে—একবার পরিবারের কয়েকজন লোককে চিকিৎসার জন্য জনৈক চিকিৎসকের কাছে লইয়া যাই। মেযাজ নাজুক হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসক যারপর নাই সহনশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কাছে যাতায়াতের ফলে আমার স্বভাবগত রাগও বহুলাংশে হ্রাস পায়। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ইহা তাঁহার কাছে বসারই ফল। কাজেই শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম পন্থা হইল সৎ-সংসর্গ।

অনেকের ধারণা—বয়স হইলে ছেলে আপনাআপনি সংশোধিত হইয়া যাইবে। ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। ছেলে যখন কথাও বলিতে পারে না, তখন হইতেই তাহার মস্তিষ্কে অন্যের চালচলন চিত্রিত হইতে থাকে এবং উহা দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। তাই জ্ঞানিগণ লিখিয়াছেন—শিশুর সম্মুখে সাধারণ ভদ্রতার খেলাফ কোন কাজ করা উচিত নহে। কারণ, মানুষের মস্তিষ্ক একটি মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায়। মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর বসাইয়া দিলে যেরূপ ছাপা হইয়া যায়, তদ্রূপ মানুষের মস্তিষ্কের সামনে যে জিনিস থাকে, তাহা মস্তিষ্কে চিত্রিত হইয়া যায়। তখন বোধশক্তি না থাকিলেও এই চিত্রায়নের জন্য বোধশক্তির প্রয়োজন নাই। মনে করুন, যদি আপনি প্রেসে ইংরেজী ছাপাইয়া

লন এবং পরে তাহা শিক্ষা করেন, তবে কিছুদিন পরেই তাহা পড়িতে সক্ষম হইবেন। তদ্রূপ শিশু যদিও এখন বুঝিতে পারে না; কিন্তু বড় হইয়া উহা বুঝিতে পারিবে।

জনৈকা বুদ্ধিমতী মহিলা বলেনঃ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের পর বালক সংশোধনের যোগ্য থাকে না। তখন সে পরিপক্ক হইয়া যায়। তিনি আরও বলিতেন, প্রথম সন্তানটিকে ঠিক করিয়া দিতে পারিলে অন্যান্য ছেলেরাও তাহার ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে।

খোদার অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি ইবরাহীম (আঃ) দ্বারা পয়গম্বর পাঠাইবার দো'আ করাইয়া হযরত (দঃ)-কে আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কোন কোন মুসলমান তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং অন্যান্যরা জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন। আমাদের দৃষ্টিতেও তিনি এইভাবে উপস্থিত আছেন। এই দিক দিয়া فيكم رسوله "তোমাদের মধ্যেই আল্লাহ্‌র রাসূল আছেন" কোরআনের এই বাক্যাংশের ব্যাপক অর্থ লইলে অশুদ্ধ হইবে না।

**উত্তম আদর্শের অনুসরণঃ** বাস্তবিকই হযরত (দঃ)-এর জীবনচরিত দেখিয়া আমরা যত সহজে ধর্মীয় বিধানাবলীর অনুসরণ করিতে পারি, সাধারণ আইন-কানূন দেখিয়া তত সহজে পারি না। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, হযরত (দঃ)-এর নমুনা অনুযায়ী দুনিয়াতে জীবনযাপন করা উচিত। নতুবা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা ঐ আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করিয়া আস নাই কেন?

উদাহরণতঃ, আপনি কোন দর্জিকে আচকান সেলাই করিতে দিয়া যদি নমুনাস্বরূপ নিজের পুরাতন আচকানটিও দিয়া দেন, তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, নূতন আচকানটির আকার-আকৃতি, সেলাই ইত্যাদি হুবহু পুরাতনটির ন্যায় হইতে হইবে। ঘটনাক্রমে আচকানের আকার-আকৃতি অন্যরূপ হইয়া গেলে দর্জিকে নিন্দার যোগ্য মনে করা হয়। এই নিন্দার উত্তরে যদি দর্জি যুক্তি পেশ করে যে, আকার-আকৃতি বেশীর ভাগই পুরাতনটির ন্যায় হইয়াছে। আর বেশীর ভাগ মিল হওয়াকে পুরাপুরি মিল হওয়া বলা যায়। জিজ্ঞাসা করি, দর্জির এই দলীল গ্রহণযোগ্য হইবে কি?

এই দর্জির সহিত আপনি যে ব্যবহার করিবেন, খোদার নিকট হইতেও তাহা পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। খোদার সম্মুখে দাঁড়াইবার পর যদি আপনি হযরত (দঃ)-এর আদর্শের নমুনার মাপকাঠিতে না টিকেন, তখন কি যে ভীষণ নিন্দাবাদের পাত্র হইবেন, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। তাই খোদা তা'আলা বলেনঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ নিহিত আছে।' অর্থাৎ, তোমরা হুবহু তাঁহার ন্যায় হইয়া যাও। নামায, রোযা ইত্যাদি হুবহু তাঁহার নামায, রোযার ন্যায় হওয়া চাই। বিবাহ শাদীর রীতিনীতি, চালচলন এবং প্রত্যেক কাজে হযরত (দঃ)-এর আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া চাই। নমুনা হওয়ার অর্থ ইহাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহবশতঃ ইহাতে আরও ব্যাপকতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই কথা দ্বারা আমি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহিয়াছি। আজকাল অনেকেই বলেঃ মৌলবী সাহেবরা من تشبه بقوم فهو منهم 'যে বিজাতির সহিত সাদৃশ্য রাখে, সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত' বলিয়া সহজেই ফতওয়া জারী করিয়া দিলেন, কিন্তু হযরত (দঃ)-এর টুপী, জামা ইত্যাদি কেমন ছিল, তাহা বলিতে পারেন না। আলেমদিগকে জব্দ করাই তাহাদের এই উক্তির লক্ষ্য; ইহা দ্বারা তাহারা প্রমাণ করিতে চায় যে, যাহা চাও পরিধান কর কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ইহার স্বপক্ষে তাহারা কবির در عمل كوش و هرچه خواهی پوش "আমলে চেষ্টা কর এবং যাহা ইচ্ছা পরিধান কর" কবিতার চরণটিও পেশ করিয়া থাকে।

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, চালচলন যদিও হযরতের চালচলনের ন্যায় হওয়া জরুরী, তথাপি ইহাতে একটু ব্যাপকতা আছে। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে রাজা বাদশাহ্দেরও বিশেষ আইন-কানূন আছে। উহাতে পরিধেয় পোশাকের প্রকার অপরিধেয় পোশাকের প্রকার হইতে অনেক কম। উদাহরণতঃ বিভিন্ন প্রকারের পোশাক থাকা সত্ত্বেও পুলিশের জন্য শুধু বিশেষ এক প্রকার পোশাক পরার আইন প্রচলিত আছে। যে সব পোশাক পুলিশের জন্য নিষিদ্ধ উহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। কেননা, বিশেষ প্রকার পোশাক ছাড়া সব পোশাকই পুলিশের জন্য নিষিদ্ধ। সে মতে কোন পুলিশের পোশাকে পাগড়ী না থাকিলে সে দণ্ডিত হয়। কারণ, পাগড়ীও তাহার পোশাকসমূহের অন্যতম। প্রশ্নকারী ভাইগণ মনে করেন যে, খোদার আইনও এইরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে—যাহাতে শুধু বিশেষ ধরনের টুপী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি থাকিবে। সঙ্কীর্ণ না হইলে তাহাদের মতে সকল প্রকার পোশাকই জায়েয।

বন্ধুগণ, নিঃসন্দেহে শরীঅতের দৃষ্টিতে পোশাক নির্দিষ্ট। কিন্তু তাহা এইভাবে যে, নিষিদ্ধ পোশাক কম এবং জায়েয পোশাক বেশী; অর্থাৎ, যে সব পোশাক না-জায়েয তাহা গণনা করত অবশিষ্ট সকল পোশাককেই জায়েয রাখা হইয়াছে। ইহা খোদা তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ বৈ কিছুই নহে। কেননা, যদি নির্দেশ হইত যে, প্রত্যেককেই একটি কাবা, একটি জামা ও একটি পাগড়ী পরিতে হইবে, তবে দরিদ্র লোকগণ মহা বিপদে পড়িত।

আজকাল কোন কোন স্কুলে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করার নিয়ম চালু হইয়াছে। ইহা বিপদ বৈ কিছুই নহে। যদি কেহ বলে যে, আমরা বড় লোক কাজেই ইহাতে অসুবিধা নাই, তবে আমি বলিব যে, জাতি বলিতে কি শুধু বড়দেরেই বুঝায়? গরীবদের জন্য অসুবিধা না হইয়া পারে না। আজকাল জাতির অর্থেও বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু ধনীদিগকে জাতি মনে করা হয়, অথচ গরীবদের সংখ্যা অনেক বেশী। সেমতে জাতি বলিতে গরীবদিগকেই বুঝানো উচিত।

মনে করুন, গমের স্তূপে কিছু কিছু যব এবং ছোলাও থাকে। তাসত্ত্বেও আধিক্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া উহাকে গমের স্তূপই বলা হয়।

ইহাতে বুঝা যায় যে, গরীবদের প্রতি যাহারা সহানুভূতিশীল, তাহাদিগকেই জাতির দরদী বলিতে হইবে। আজকাল যাহারা বড় গলায় জাতির দরদী বলিয়া দাবী করে, তাহারা শুধু বড়লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল—গরীবদের প্রতি নহে। অথচ গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করা পর্যন্ত জাতির দরদী বলিয়া দাবী করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। জাতির সঠিক অর্থ না বুঝার ফলেই তাহারা উপরোক্ত মতের সঙ্কীর্ণতা অনুভব করে নাই। খোদা তা'আলা জাতির প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জায়েয পোশাকের সংখ্যা বেশী এবং না-জায়েযের সংখ্যা কম করিয়া দিয়াছেন। তিনি রেশমী ও সোনালী বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তদ্রূপ গোড়ালির নীচ পর্যন্ত ও বিজাতির পোশাক পরিতে অনুমতি দেন নাই। এইগুলি ছাড়া সব রকম পোশাক পরার ব্যাপক অনুমতি আছে; কাজেই বলিতে হইবে যে, পোশাক নির্দিষ্ট তবে অনুগ্রহ ও ব্যাপকতার সহিত। অতএব, পূর্বে যে প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিজাতির সহিত সাদৃশ্য রাখা না-জায়েয হইলে হুযূর (দঃ)-এর বিশেষ পোশাক কি ছিল, তাহা বর্ণনা করা উচিত, তাহা দূরীভূত হইয়া গেল। অতএব, পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও হযরতের ন্যায় হওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত জরুরী। তাহা এইভাবে সম্ভব যে, আমাদের গায়ে যেন কোন না-জায়েয পোশাক না থাকে। হুযূর (দঃ) যেহেতু আমাদের মধ্যে নমুনা হিসাবে আছেন, এই কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন।

www.almodina.com

**বিবাহের দৃষ্টান্তঃ** খোদা তা'আলা বিবাহেও একটি দৃষ্টান্ত (অর্থাৎ, হযরত ফাতেমা যাহ্রার বিবাহ) আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। উহাতে না বরযাত্রী আসিয়াছিল, না লাল চিঠি পাঠানো হইয়াছিল এবং না ডোম ও নাপিত গিয়াছিল। উহাতে ঘটকের সাহায্যেও বিবাহের পয়গাম দেওয়া হয় নাই; বরং বর নিজে তাহা লইয়া গিয়াছিল। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। প্রথমতঃ, হযরত ফাতেমার জন্য হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব করেন। তাঁহাদের বয়সের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হুযূর (দঃ) ওযর করেন। আল্লাহু আকবার! চিন্তা করার বিষয় বটে। এইভাবে হুযূর (দঃ) আমাদিগকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের শিক্ষাদান করিয়াছেন। এই বুযুর্গদ্বয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহের সময় পাত্রের বয়সের সমতার প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে।

জনৈকা নবযুবতীর বিবাহ জনৈক বৃদ্ধের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। যুবতী বলিত, তিনি সম্মুখে আসিলে আমি খুবই লজ্জা অনুভব করি। মনে হয়, যেন দাদা আসিলেন। অধিকাংশ মেয়ে স্বামীর বয়সের পার্থক্যের দরুন বদস্বভাবে লিপ্ত হইয়া যায়। কারণ, স্বামীর সহিত তাহাদের আন্তরিক সম্পর্ক থাকে না। বলুন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ কে? কিন্তু শুধু বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হুযূর (দঃ) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

তাঁহারা উভয়ের এই মর্যাদা লাভ হইতে নিরাশ হইয়া আলী (রাঃ)-কে যাইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, হুযূর (দঃ) এই বিশেষ কারণে আমাদের ব্যাপারে সম্মত হন নাই। তুমি অল্প বয়স্ক, কাজেই তুমি পয়গাম দিলেই ভাল হইবে।

শায়খাইন [হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)] হযরত আলীর শত্রু ছিলেন বলিয়া যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস রহিয়াছে—এই ঘটনা পাঠ করিয়া তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যাওয়া উচিত। মোটকথা, হযরত আলী (রাঃ) দরবারে পৌঁছিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হুযূর (দঃ) বলিলেন, আলী! আমি জানি তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ। ফাতেমার বিবাহ তোমার সহিত করিয়া দেওয়ার জন্য খোদা তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর হযরত আলী চলিয়া আসিলেন। একদিন হযরত (দঃ) দুই চারি জন ছাহাবীকে একত্রিত করিয়া খোতবা পাঠ করতঃ বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। হযরত আলী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। এই কারণে বলিলেন, আলী মঞ্জুর করিলেই বিবাহ হইবে। হযরত আলী ইহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মঞ্জুরী প্রদান করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উম্মে আয়মন বাঁদীর সহিত নববধুকে হযরত আলীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে না পাল্কী ছিল না বরযাত্রী।

পরদিন হযরত (দঃ) স্বয়ং হযরত আলীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কন্যা ফাতেমার নিকট পানি চাহিলেন। তিনি উঠিয়া পিতাকে পানি দিলেন। আজকাল আমরা এই আড়ম্বরহীনতাকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছি। বিবাহের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত কনে মুখের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া থাকে। আমি বলি, মুখের উপর হাত রাখার পরিবর্তে হাতের উপর মুখ রাখা উচিত। যাহাই বলা হউক, কনের মুখ ঢাকিয়া রাখা হয়। তাহাকে এত বেশী কোণঠাসা করিয়া রাখা হয় যে, সে নামাযও পড়িতে পারে না। খোদার হাতে বন্দার যেভাবে থাকা উচিত নাপিতানীর হাতে ঠিক সেইভাবে রাখা হয়। মহিলারা আসিয়া তাহার মুখ দর্শন করিয়া ফিস দেয়। ছিঃ! কি নির্লজ্জ ব্যাপার! আজকাল নিয়মানুবর্তিতার এই হইল অবস্থা। অথচ হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিবাহের পরদিনই স্বামীর বাড়ীতে কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। এর পর হুযূর (দঃ) হযরত আলীকেও পানি আনিতে বলিলে তিনি

পানি আনিয়া দেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ মজলিসে হযরত আলীও উপস্থিত ছিলেন। আজকালকার মহিলারা ইহাকে একেবারেই না-জায়েয মনে করে। এই ধরনের আরও বহু মূর্খতা প্রচলিত আছে।

মহিলাদের ধারণা যে, স্বামীর নাম উচ্চারণ করিলে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাদের মতে ইহা একেবারেই না-জায়েয। আশ্চর্যের বিষয়—নাম লওয়া বেআদবী; কিন্তু স্বামীর সহিত ফরফর করিয়া কথা বলা ও ধৃষ্টতা করা মোটেই বেআদবী নহে। তদ্রূপ স্বামীর সহিত ঝগড়া করা, অন্যান্য মহিলাদিগকে গালিগালাজ করা ইত্যাদি না-জায়েয নহে। কোন কোন মহিলা ইহার এত বেশী পাবন্দী করে যে, কোরআন তেলাওয়াত কালে ঐ শব্দ আসিয়া পড়িলে উহা পড়ে না। তাহাদের ধারণা—কোরআনে তাহাদের স্বামীর নামই লিখিত আছে। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া কোন কোন মহিলা স্বামীর শহরের নামও উচ্চারণ করে না এবং স্বামীর নামের মত যে সব শব্দ আছে, তাহাও বলে না। জানি না, এগুলি না-জায়েয হইয়া ধৃষ্টতা করা কিরূপে জায়েয হইয়া গেল? মোটকথা, হুযূর (দঃ) আপন কন্যার বিবাহ দ্বারা আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

**শোক প্রকাশে হযরত (দঃ)-এর দৃষ্টান্তঃ** হুযূর (দঃ) শোক প্রকাশ করিয়াও দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তাঁহার ছাহেবজাদা ইবরাহীম (রাঃ)-এর এন্তেকাল হইলে তিনি নিজেও আহাজারী করেন নাই এবং অন্যকে এরূপ করিতে অনুমতি দেন নাই। তিনি শুধু কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলেনঃ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَاابْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ 'হে ইবরাহীম! তোমার বিয়োগ-ব্যথায় আমরা সত্যিই মর্মাহত।' এই বলিয়া তিনি এক স্থানে উপবিষ্ট থাকেন এবং আগন্তুকরা আসিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতে থাকে। মৃত্যুজনিত ব্যাপারে আমাদেরও সান্ত্বনা দেওয়া ও ছওয়াবরেসানী করা উচিত। এই দুইটি কাজ সুন্নত। এ ছাড়া যতকিছু করা হয়, সমস্তই অনর্থক বৈ কিছুই নহে। উদাহরণতঃ, দূরদেশ হইতে মেহমান আসা, দশম দিন ও চল্লিশতম দিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করা, নারীর ইদ্দত শেষ হইলে তাহাকে ইদ্দত হইতে বাহির করার জন্য লোকজনের একত্রিত হওয়া। নারী যেন ইদ্দতের যমানায় কোন নির্জন কক্ষে আবদ্ধা ছিল। এখন সকলে মিলিয়া উহার তালা ভাঙ্গিতে হইবে।

বুলন্দশহর জিলার জনৈক ধনী ব্যক্তির এন্তেকাল হইলে তাহার পুত্র এই সব কুপ্রথা উচ্ছেদ করিতে মনস্থ করিল। এই উদ্দেশ্যে সে পিতার মৃত্যুতে কিছুই না করার পথ ধরিল না; বরং একটি অভিনব কর্মপন্থা গ্রহণ করিল। সে দেশপ্রথা অনুযায়ী সমাজের সকলকেই ভোজের নিমন্ত্রণ করিল এবং উৎকৃষ্ট ধরনের ঘৃতপক্ক খাদ্য প্রস্তুত করাইল। বড়লোকদের জন্য ইহাও একটি বিপদ বটে। 'ঘি'-এর নদী বহাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের আয়োজনকে আয়োজনই মনে করা হয় না। গরীবরা খোদার ফযলে এই বিপদ হইতে মুক্ত। আমি একবার ঢাকা পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম, তথায় এক সের গোশ্‌তের মধ্যে এক সের ঘি খাওয়া হয়। আমি তাহা-দিগকে বলিলাম, জনাব, ঘি বেশী খাওয়ার জিনিস নহে। নতুবা জান্নাতে দুধ ও মধুর ন্যায় ঘি-এরও একটি নহর থাকিত।

মোটকথা, সমস্ত নিমন্ত্রিত মেহমান উপস্থিত হইলে হাত ধুয়াইয়া সকলের সম্মুখে খাদ্য সাজানো হইল। খাওয়া আরম্ভের অনুমতি দানের পূর্বে মৃতব্যক্তির পুত্র বলিতে লাগিল, আপনারা অবগত আছেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতার এন্তেকাল হইয়াছে। আমি আজ পিতৃছায়া হইতে বঞ্চিত। ইহা যে নিদারুন মনঃকষ্টের কারণ, তাহা বর্ণনা সাপেক্ষ নহে। বন্ধুগণ, আজ যখন

আমি পিতৃশোকে শোকাকুল, তখন আপনারা লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে আমার বাড়ীতে একত্রিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি ইনছাফ? আপনাদের লজ্জা-শরম বলিতে কিছুই নাই? অতঃপর সে বলিল, এখন খাওয়া আরম্ভ করুন—আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এই কথা শুনার পর সকলে উঠিয়া গেল এবং পৃথক জায়গায় বসিয়া প্রচলিত কুপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনার সিদ্ধান্ত হইল। সে মতে বহুলোক একত্রিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই সকল কুপ্রথা চিরদিনের জন্য রহিত করিয়া দিল। আর ঐ তৈয়ারী খাদ্য দরিদ্রদিগকে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল।'

কেরানা আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি ছোট শহর। সেখানকার জনৈক হাকীম সাহেব বলেন, একদা আমার কাছে জনৈক গোয়ালা উপস্থিত হয়। তাহার পিতা রুগ্ন ছিল। সে বলিতে লাগিল, হাকীম সাহেব, যে ভাবেই হউক এবারকার মত তাহাকে ভাল করিয়া দিন। দেশে বড় দুর্ভিক্ষ। বুড়া মারা গেলে সে জন্য দুঃখ নাই, কিন্তু চাউলের যে চড়া দাম! সমাজ খাওয়াইব কিরূপে—সেটি হইল বড় সমস্যা।

তবুও সুখের কথা, এইসব কুপ্রথা যে বাস্তবিকই নিন্দনীয়, তাহা আজকালকার অনেক যুবকই বুঝিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা অন্যান্যকে এ ব্যাপারে বিরত রাখিতেও চেষ্টা করে। অবশ্য তাহারা যে সদুদ্দেশ্যে এরূপ করে, তাহা বলা যায় না। মৃতদের অপেক্ষা জীবিতদের প্রতিই তাহাদের দরদ বেশী। মৃত স্ত্রীর জন্য খরচ না হইলে সেই টাকা হারমোনিয়ম, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বাবদ খরচ করা যাইবে—এই হইল তাহাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বাধা দান করা কিছুতেই প্রশংসনীয় হইতে পারে না, তবুও তাহাদিগকে অন্যদের তুলনায় ভাল বলিতে হইবে। আজকাল বাস্তবিক পক্ষেই মানুষের বুদ্ধিজ্ঞান কিছুটা আলো পাইয়াছে। এই আলো যথেষ্ট নহে। ইহার সহিত পরিশিষ্ট যোগ হইলেই ইহা যথেষ্ট হইবে। অর্থাৎ, প্রকৃত বুদ্ধিমানের বুদ্ধিও এই প্রেরণায় পথপ্রদর্শক হইতে হইবে। প্রকৃত বুদ্ধিমান তিনিই, যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ

خلق اطفال اند جز مست خدا — نیست بالغ جز رهیده از هوٰے

(খল্‌ক আতফালআন্দ জুয মস্তে খোদা + নীস্ত বালেগ জুয রাহীদা আয হাওয়া)

'খোদার আশেক ব্যতীত সকলেই শিশু। কুপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেহই বালেগ নহে।' অতএব, কুপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। কত ব্যাখ্যা করা যায়? মোটকথা এই যে, হুযূর (দঃ) আমাদের জন্য নমুনা হিসাবে প্রেরিত হইয়াছেন। আমরা এই নমুনার মত হইয়াছি কিনা—সর্বাবস্থায় তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

**হুযূর (দঃ)-এর দারিদ্র্যঃ** জনৈক দর্জির বাড়িতে হুযূর (দঃ)-এর দাওয়াত ছিল। আজকাল আমাদের শান-শওকত যারপরনাই বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা গরীবের বাড়ীতে যাইতে কিংবা গরীবকে নিজ বাড়ীতে দাওয়াত করিতে ভীষণ লজ্জাবোধ করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাহারা একটু উচ্চপদে সমাসীন, তাহারা নিজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর গরীবদিগকে কাছে ডাকিতে কিংবা তাহাদের কাছে বসিতে অপমান বোধ করে। অথচ হুযূর (দঃ)-কে দেখুন, তিনি একজন দর্জির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। হুযূর (দঃ) গরীব ছিলেন বলিয়া কাহারও ধারণা থাকিলে (নাঊযুবিল্লাহ্) তাহার জানা উচিত যে, তাঁহার দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত নহে। অনিচ্ছাকৃত দারিদ্র্যই আসল দারিদ্র্য।

www.almodina.com

شریف گر متـواضـع شود خیال مبند ـ که پائگـاه رفیعش ضعیف خواهد شد

(শরীফ গর মুতাওয়ায়ে' শাওয়াদ খিয়াল মবন্দ + কেহ্ পায়েগাহে রফীয়াশ যয়ীফ খাহাদ শুদ)

"সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করিলে তাহার উচ্চমর্যাদা হ্রাস পাইবে—এরূপ ধারণা করিও না।"

হযরত ইবরাহীম আদহাম বিশাল সাম্রাজ্যের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাকে কেহ দারিদ্র্য বলিতে পারিবে কি? হুযূর (দঃ)-ও তদ্রূপ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াছিলেন। হযরত জিবরায়ীল (আঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি চাহিলে খোদা তা'আলা ওহুদ পাহাড়কে আপনার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিবেন এবং উহা আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

আপনি বলিতে পারেন, ওহুদ পাহাড় কিরূপে সঙ্গেসঙ্গে চলিত? শুনুন, আপনার মতে পৃথিবী যদি ঘুরিতে পারে, তবে ওহুদ পাহাড় সঙ্গেসঙ্গে চলিবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? যদি বলেন, পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণে ঘুরে, তবে হুযূর (দঃ)-এর দেহেরও এরূপ কোন আকর্ষণ থাকিলে ক্ষতি কি? বিজ্ঞানের গবেষণা এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে নাই। আকর্ষণের জন্য দেহ বিশাল হওয়ারও প্রয়োজন নাই। বিষয়টি আপনাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আকর্ষণের কথা বলিয়াছি। নতুবা যে ব্যক্তি খোদার প্রতি বিশ্বাসী, তাহার পক্ষে কোন আকর্ষণে বিশ্বাস স্থাপন করার প্রয়োজন নাই।

জিবরায়ীলের প্রস্তাবের উত্তরে হুযূর (দঃ) বলিলেনঃ আমার একান্ত মনোবাঞ্ছা এই যে, একদিন পেট ভরিয়া আহার করি ও একদিন অনাহারে থাকি। হুযূর (দঃ)-এর এই মনোবাঞ্ছার মধ্যে যে কি গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, চিন্তা করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার উম্মত তাঁহাকে মনে-প্রাণে ভালবাসিবে। কাজেই তিনি দুনিয়াদারী পছন্দ করিলে তাঁহার উম্মতও দুনিয়া উপার্জনকে সুন্নত মনে করিয়া লইত। ফলে দুনিয়ার অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার শক্তি হারাইয়া গোটা উম্মত ধ্বংস হইয়া যাইত।

উদাহরণতঃ, জনৈক কামেল ব্যক্তি সর্প ধরিবার মন্ত্র জানেন। সর্প তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না—সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। তা সত্ত্বেও তিনি সর্প ধরেন না। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার ছেলেও দেখাদেখি সর্পের মুখে অঙ্গুলি ঢুকাইয়া দিবে। অতএব, হুযূর (দঃ) আমাদের খাতিরে দারিদ্র্য ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। ইহাকে অনিচ্ছাকৃত দারিদ্র্য বলা যায় না; বরং ইহা নিরেট ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্য।

**একটি কাহিনীঃ** এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ)-এর একটি কাহিনী মনে পড়িল। তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই উপবাস থাকিত। একদা তাঁহার পীর সাহেব বাড়ীতে মেহ্মান হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনও উপবাস ছিল। তদুপরি শাহ্ আবুল মা'আলী বাড়ীতে ছিলেন না। বাড়ীর লোকজন প্রতিবেশীদের নিকট কর্জ চাহিয়াও কিছু পাইল না। আরও কয়েক জায়গায় লোক পাঠানো হইল; কিন্তু কোথাও ধার পাওয়া গেল না। পীর সাহেব কয়েকবার লোক আসা যাওয়া করিতে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। উত্তরে জানা গেল যে, অদ্য বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার কিছু নাই। তিনি নিজের কাছ হইতে কয়েকটি টাকা দিয়া লোকটিকে বলিলেন, বাজার হইতে খাদ্য-দ্রব্য কিনিয়া আন। হাঁ, আনার পর আমাকে দেখাইও। সেমতে খাদ্য-দ্রব্য কিনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি একটি নক্সাযুক্ত তাবীয লিখিয়া উহাতে রাখিয়া দিলেন। আসলে তিনি সরাসরি 'তাছাররুফ' (ক্ষমতা প্রয়োগ) করিয়াছিলেন। তবে উহাকে লোক চক্ষুর

www.almodina.com

অন্তরালে রাখার উদ্দেশ্যে পর্দা হিসাবে তাবীয ব্যবহার করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিয়মও তাহাই। তিনি যখন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিতে চান, তখন উহাকে জড়ত্বের পর্দায় ঢাকিয়া প্রকাশ করেন। যেমন, বৃষ্টির জন্য মেঘের সৃষ্টি করেন ইত্যাদি। এই নিয়ম অনুযায়ী পীর সাহেবও তাবীয লিখিয়া খাদ্য-দ্রব্যের উপর রাখিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, ইহা হইতে লইয়া রান্না করিবে। সেমতে বহু দিন পর্যন্ত পাকানোর পরও ঐ খাদ্য-দ্রব্য শেষ হইল না।

হযরত শাহ্ আবুল মা'আলী (রঃ) সফর শেষে বাড়ীতে আসিলেন। একদিন বলিতে লাগিলেন, বহুদিন যাবৎ বাড়ীতে উপবাস হয় না। ব্যাপার কি? তাঁহার কন্যা আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত পিতাকে জানাইয়া দিলেন। ঘটনা শুনিয়া শাহ্ সাহেব মহা ফাঁপরে পড়িলেন। কি করা যায়—তাবীয ব্যবহার করা রুচিবিরুদ্ধ, আবার ব্যবহার না করা পীরের তাবীযের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন! এই পরস্পর বিরোধী অবস্থায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। সত্যিই বুযুর্গদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অবস্থার সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল।

একদা আমাদের হযরত কেব্‌লা হাজী এমদাদুল্লাহ্ সাহেব (রঃ) বলিতেছিলেন যে, আরাম-আয়েশ যেরূপ নেয়ামত, তদ্রূপ বিপদাপদও খোদার নেয়ামত। ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। তাহার হাতে যখম ছিল এবং সে খুব যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। সে আসিয়াই বলিল, আমার জন্য দো'আ করুন। তখন আমার মনে এই খটকা হইল যে, হযরত এই ব্যক্তির জন্য কি দো'আ করিবেন? আরোগ্য লাভের দো'আ করিলে তাহা এই মাত্র বলা উক্তির বিরুদ্ধে যাইবে। দো'আ না করিলে আবেদনকারী ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন হইবে। বুযুর্গদের কাহারও প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। হযরত বলিয়া উঠিলেন, সকলেই দো'আ করুন—হে খোদা! কষ্টও এক প্রকার নেয়ামত, আমরা তাহা জানি; কিন্তু দুর্বলতাবশতঃ এই নেয়ামত ভোগ করার মত ধৈর্য আমাদের নাই। কাজেই এই নেয়ামতকে সুস্থতায় পরিবর্তিত করিয়া দাও।

তদ্রূপ শায়খ আবুল মা'আলীও বলিলেন, তাবীয হযরতের 'তাবার্‌রুক' (প্রসাদ), আমার মাথা উহার উপযুক্ত স্থান। এই বলিয়া তিনি তাবীয মাথায় বাঁধিয়া লইলেন এবং খাদ্য-দ্রব্য গরীবদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে আদেশ দিলেন।

হুযূর (দঃ)-এর সামান্য খাদেমেরই যখন এই অবস্থা, তখন হুযূরকে কে গরীব বলিতে পারে? দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি একবার নিজের তরফ হইতে এক শত উট যবেহ করিয়াছিলেন। অতএব, নিজে গরীব ছিলেন বলিয়া গরীবের বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে গিয়াছেন—এই বলিয়া কেহ যুক্তি পেশ করিতে পারিবে না। হুযূর (দঃ) বিশ্বাস ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রে 'সুলতান' ছিলেন। সন্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি তাঁহারই নির্দেশে সম্পাদিত হইত। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার চিত্তে দর্জির বাড়ীতে চলিয়া যান। আজকাল আমরা দরিদ্রদের বাড়ীতে যাইতে এমন কি তাহাদিগকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলার অনুমতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি।

কোন এক ছোট শহরে জনৈক নাপিত একজন ধনী ব্যক্তিকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলায় ধনী ব্যক্তি তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, হতভাগা, তুই এতই যোগ্য হইয়া গিয়াছিস যে, আমাকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলার সাহস হইয়া গেল? "হযরত সালামত" বলিবে। নামাযের সময় হইলে নাপিত নামায শেষে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলার পরিবর্তে সজোরে 'হযরত সালামত ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলিয়া সালাম ফিরাইল। ইহাতে অন্যান্যরা বিস্মিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি কাণ্ড। সে উত্তরে বলিল, অদ্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিয়া একটি চপেটাঘাত খাইয়াছি, কাজেই আমার ভয় হইল যে, নামাযে ফেরেশতাদিগকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলিলে রক্ষা নাই। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে একজন আযরায়ীল ফেরেশতাও রহিয়াছেন। তিনি রাগান্বিত হইলে আমার প্রাণ বাহির না করিয়া ছাড়িবেন না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যখন গরীবের সালাম লইতেই কুণ্ঠাবোধ করেন, তখন গরীবের বাড়ীতে যাইয়া পানাহার করার প্রশ্নই উঠে না।

**গরীবের আন্তরিকতাঃ** লক্ষ্ণৌ শহরের ঘটনা। সেখানকার একজন আলেম জনৈক ভিস্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে রওয়ানা হন। পথে জনৈক ধনী ব্যক্তির সহিত দেখা হয়। সে বলিল, মাওলানা, কোথায় যাইতেছেন? মৌলবী সাহেব উত্তরে বলিলেন, এই ভিস্তি দাওয়াত দিয়াছে, সেখানে যাইতেছি। ধনী ব্যক্তি বলিল, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা' আপনি মান-ইয্‌যত একেবারে ডুবাইতে বসিয়াছেন। ভিস্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাইতে যান? এ কেমন কথা! মৌলবী সাহেব বলিলেন, হাঁ জনাব। এর পর ভিস্তিকে বলিলেন, যদি তাহাকেও যাইতে রাযী করাইতে পার, তবে আমি যাইব। নতুবা আমিও যাইব না। ভিস্তি ধনী ব্যক্তিকে খুব অনুনয় বিনয় করিল এবং হাতে পায়ে ধরিয়া রাযী করাইয়া সঙ্গে লইয়া চলিল।

গরীবদের পীড়াপীড়ি কি ধরনের এবং আন্তরিকতা কি পরিমাণ—মৌলবী সাহেব এই কৌশলে ধনী ব্যক্তিকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। আসলে ধনীরা জানেই না যে, গরীবরা বুযুর্গ ও আলেমদের প্রতি কি পরিমাণ মহব্বত রাখে। জানিলে নিশ্চয়ই তাহাদের মজবুর মনে করিত। যেমন, এইক্ষণে সামান্য পীড়াপীড়িতেই ধনী ব্যক্তি মজবুর ও বাধ্য হইয়া গেল। মহব্বত এমনই বস্তু যেঃ

عشق را نازم كه يوسف را ببازار آورد ـ همچو صنعا زاهدى را او بزنار آورد

(এশ্‌ক রা নাযম কেহ্ ইউসুফ রা ব-বাজার আওয়ারদ
হমচুঁ ছানআ' যাহেদী রা উ বযুন্নার আওয়ারদ)

"এশ্‌কের উপর আমি গর্বিত। কেননা, সে ইউসুফকে বাজারে উপস্থিত করিয়াছে, যেমন ছানআর দরবেশকে সে পৈতা লাগাইতে বাধ্য করিয়াছে।"

কাজেই মহব্বত যদি কোন ধনীকে গরীবের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মহব্বতের কার্যকারিতা বিস্ময়কর। পরিতাপের বিষয় ধনীরা এসব খবর রাখে না। কারণ, তাহাদের প্রতি কাহারও মহব্বত নাই। কেহ তাহাদিগকে সম্মান দেখাইলেও তাহা ব্যাঘ্রকে সম্মান দেখানোর ন্যায়। কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইলে তাহা সর্প দেখিয়া দাঁড়ানোর ন্যায়। গর্বিত ধনীরা মনে করে যে, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্মান প্রদর্শন নহে; বরং ভীতি প্রকাশ। তাহাদের প্রতি কাহারও মহব্বত না থাকার কারণেই তাহারা মহব্বতের পরিমাণ করিতে পারে না। কোন গরীবের সহিত মহব্বত থাকিলে তাহার সহিত তেমনি ব্যবহার করে, যেমন আলেমগণ গরীবদের সহিত করেন।

মোটকথা, ভিস্তির বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহারা দুই তিন শত ভিস্তিকে অপেক্ষারত দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখা মাত্রই সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য সকলেই সম্মুখে আগাইয়া আসিল। ভক্তি ও মহব্বতের এই মনমাতানো দৃশ্য ধনী ব্যক্তির আজীবন দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। খানা আসিলে মৌলবী সাহেব ভিস্তিদিগকে ইশারা করিয়া দিলেন। তাঁহারা খুব বিনয় ও

www.almodina.com

পীড়াপীড়ি সহকারে খাদ্য পরিবেশন করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ধনী ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, মাওলানা, আজ দেখিতে ও বুঝিতে পারিলাম যে, প্রকৃত ইয্যত ধনীদের বাড়ীতে নয়—গরীবদের বাড়ীতে গেলেই পাওয়া যায়।

এইসব কারণেই হুযূর (দঃ) গরীবদের দাওয়াত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। সেমতে তিনি হযরত আনাস (রাঃ) কে সঙ্গে লইয়া সামান্য দর্জির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। মেহমানকে বসিতে দিয়া দর্জি কাপড় সেলাইয়ে লাগিয়া গেল। আজকাল মেহ্মানদের মাথার উপর সারাক্ষণ দাঁড়াইয়া না থাকিলে উহাতে অভদ্রতা জ্ঞান করা হয়।

বন্ধুগণ, যে সব বিষয়কে আজকাল ভদ্রতা আখ্যা দেওয়া হয়, মনে হয় সেগুলি শুধু নিষ্কর্মা কিংবা যাহারা মস্তিষ্ক চালনার কাজ করে না, তাহাদেরই কাজ। নতুবা আজকালকার ভদ্রতা সীমাহীন বিরক্তিকর। উদাহরণতঃ গৃহকর্তা সারাক্ষণ মেহ্মানদের মাথার উপর চড়াও হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয়, যেন মাথার উপর পাহাড় চাপিয়া বসিয়াছে। আজকাল কেহ ইহাকে বিরক্তিকর মনে করে না। ইহার কারণ এই যে, তাহারা কোন চিন্তার কাজ করে না।

তদ্রূপ অনেকেই চাকরদিগকে মেহমানের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ করে। চাকর এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে ধনীরা অস্বস্তি বোধ করে না। বুঝি না—চাকরেরা বসিয়া বসিয়া কর্তব্য পালন করিলে ধনীদের শাহী জাঁকজমকে কি ভাঙ্গন দেখা দিবে?

এইসব কার্যকলাপ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কার খোদা ও বন্দার মধ্যে একটি বিরাট পর্দাস্বরূপ। কোরআন শরীফের এক জায়গায় খোদা বন্দার তা'রীফ করিতে যাইয়া বলেনঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

"খোদার ঐ সব বন্দা, যাহারা জমিনের উপর নম্রতা সহকারে বিচরণ করে" এই আয়াতে প্রশংসাবাচক গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম নম্রতা এর পর যথাক্রমে নামায, মো'আমালা (লেন-দেন) ও আকায়েদকে উল্লেখ করিয়াছেন। বিনয় ও নম্রতাকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করায় বুঝা গেল যে, বিনয় ব্যতীত ঈমান থাকিতে পারে না। ইহার বিপরীতে এক জায়গায় কাফেরদের নিন্দা করিতে যাইয়া ظُلْمًا وَّعُلُوًّا (অত্যাচার ও আত্মম্ভরিতা) বলিয়াছেন। মোটকথা, কেহ মূর্তির ন্যায় বসিয়া থাকুক আর তার সম্মুখে চাকর দাঁড়াইয়া থাকুক—খোদা তাহা মোটেই পছন্দ করেন না। খাওয়ার সময়ও এই ধরনের লৌকিকতা প্রদর্শন করা হয়। দর্জি সম্মানিত মেহ্মানদিগকে বসাইয়া যাহা করিল, উহাকে আজকাল অভদ্রতা আখ্যা দেওয়া হইবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযূর (দঃ) বাছিয়া বাছিয়া লাউয়ের টুকরা খাইতেছিলেন। তাঁহাকে লাউ পছন্দ করিতে দেখিয়া সেই দিন হইতে আমিও লাউকে অত্যন্ত ভালবাসি। ইহাকেই বলে মহব্বত। বিষয়টি আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক ঠেকিতে পারে। কারণ, হুযূর (দঃ)-এর প্রতি আমাদের ততটুকু মহব্বত নাই। নতুবা মহব্বত এমনই জিনিস যাহার ফলে প্রেমাস্পদের প্রত্যেকটি অঙ্গ-ভঙ্গি প্রিয়তম বলিয়া মনে হয়।

**শ্রদ্ধার প্রতিক্রিয়াঃ** বর্তমান যুগের শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, হিন্দুস্থানী শাসক গোষ্ঠীর জনৈক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি খোঁড়াইয়া চলিতেন। ফ্যাশন পূজারীরাও তাঁহার দেখাদেখি খোঁড়া হইয়া চলিতে শুরু করে। একজন বাদশাহ্র থুক্কু দাঁড়ি ছিল। ফলে বহুদিন পর্যন্ত মানুষ তাহার ন্যায় থুক্কু দাঁড়ি রাখিত। সম্ভবতঃ তাহারা দো'আও করিত—যাহাতে তাহাদের দাঁড়িও তদ্রূপ হইয়া যায় কিংবা তাহারাও খোঁড়া হইয়া যায়।

বর্তমান যুগে শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদে সাদৃশ্যের এত বেশী হিড়িক পড়িয়াছে যে, আলেমগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও মানুষকে এই পথ হইতে ফিরাইতে পারেন না। অথচ ইহাতে কোন ওযরও নাই। অনেক গোনাহ্র কাজে বাহ্যতঃ ওযর বর্ণনা করা যায়। (ঘুষ দেওয়া কিংবা কোন কোন অবস্থায় লওয়া।) আসলে এগুলিতেও ওযর নাই। কিন্তু চালচলন ও উঠাবসায় সাদৃশ্য রাখার মধ্যে ওযর কল্পনাও করা যায় না। তা সত্ত্বেও ইহা ত্যাগ করা কঠিন মনে হয়। কারণ, শ্রদ্ধা ইহাকে প্রিয় বানাইয়া দিয়াছে। দুনিয়াদারদের শ্রদ্ধা যদি এই রং দেখাইতে পারে, তবে হুযূর (দঃ)-এর শ্রদ্ধা উপরোক্ত রং কেন দেখাইবে না?

বন্ধুগণ, বিজাতির প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে তাহার অনুসরণ করিতে যাইয়া হালাল-হারামেরও পার্থক্য থাকে না। অথচ হুযূর (দঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বতে আপনাদের এতটুকুও রং পরিবর্তিত হয় না। ইহার কারণ কি? সন্তোষজনক উত্তর দিন। আমি বলি, এজন্য খোদা তা'আলা কোন আযাব নাই দিলেন, কিন্তু যদি কিয়ামতের দিন সম্মুখে খাড়া করাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের অন্তরে পয়গম্বরের প্রতি বেশী শ্রদ্ধা ছিল, না দুনিয়াদার বাদশাহ্দের প্রতি? তবে এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

যদি বলেন, বাদশাহ্দের অনুসরণ শ্রদ্ধার কারণে নয়, তবে আমি বলিব, ইহা নিছক ভ্রান্তিমূলক; বরং এই অনুসরণ শ্রদ্ধার কারণেই হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা গেল যে, পোশাক পরিচ্ছদ এবং সর্বপ্রকার মোআমালাতেও হযরত (দঃ)-এর অনুসরণ করা দরকার।

হুযূর (দঃ) বলেনঃ আমার উম্মতে ৭৩টি দল হইবে। উহাদের একটি দল ছাড়া সবগুলিই দোযখে যাইবে। যে দলটি দোযখে যাইবে না, সেইটি হইলঃ مَاأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ "আমি এবং আমার ছাহাবীরা যে দলে আছি।" বলাবাহুল্য, এখানে مااَنا عليه -এর অর্থ ইহা যে, হুবহু হুযূর (দঃ)-এর পোশাকের ন্যায় পোশাক পরিতে হইবে; বরং যে পোশাক তিনি পরেন নাই, কিন্তু অন্যকে পরিতে মৌখিক অনুমতি দিয়াছেন, উহা পরিলেও সুন্নতের উপর আমল হইবে।

পয়গম্বর অন্যের জন্য নমুনা হইবেন—এই গূঢ়তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইবরাহীম (আঃ) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً "হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠান" বলিয়া দো'আ করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত ভূমিকা বর্ণিত হইল। হুযূর (দঃ)-এর অবস্থা কি ছিল এখন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়টি বাকী রহিয়া গেল। উহাতে বলা হইবে যে, আমাদের মধ্যে ধর্মকাজে যত্ন হওয়ার আগ্রহ নাই। খোদা চাহে তো উহা অন্য কোন সময় বর্ণনা করিব।

এখন দো'আ করুন, খোদা যেন আমাদিগকে সংশোধিত করেন এবং আমল করার তওফীক দান করেন। আমীন!

— ■ —

www.almodina.com

# ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

■

এল্‌মে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই ওয়ায ৫ই যিলকদ ১৩২৯ হিজরী তারিখে মাদ্রাসা এহ্‌ইয়াউল উলূম, এলাহাবাদে প্রায় দুই হাজার শ্রোতার সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। পৌনে তিন ঘন্টা পর্যন্ত ওয়ায করেন। মাওলানা ছাঈদ আহমদ সাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বর্তমানে সমগ্র জগতের মুসলমানদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমানরা ইসলামের আহ্‌কাম ও শিক্ষা হইতে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া পড়িতেছে এবং অমুসলমানগণ ইসলামের সৌন্দর্য দেখিয়া ক্রমে ক্রমেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইহা ঐ দিনের পূর্বাভাস, যে দিন আশ্চর্য নহে যে, এহেন মুসলমানগণ ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে এবং ঐ সমস্ত অমুসলমান মুসলমান হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّابَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ـ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

আয়াতের অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বংশধরের মধ্য হইতে একজন রাসূল পয়দা করুন। সে তাহাদিগকে আপনার আয়াতসমূহ শুনাইবে, তাহাদিগকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। নিশ্চয়ই, আপনি প্রবল পরাক্রমশালী এবং হেকমতওয়ালা।"

## কোরআনের মর্যাদা

গত শুক্রবার দিনও এই আয়াতখানি তেলাওয়াত করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে ভূমিকাস্বরূপ যাহা বলা হইয়াছিল, উহার সারমর্ম এই যে, ধর্মের প্রতি তোমাদের অমনোযোগিতার স্বভাবটি

www.almodina.com

সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। আয়াতে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে ইহাই শুনাইয়াছিলাম। জানা দরকার যে, কোরআনে যদিও ইতিহাসের ভঙ্গিতে অতীত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু উদ্দেশ্য কাহিনী বর্ণনা করাই নহে; বরং ইহার মাধ্যমে আদেশ নির্দেশ ব্যক্ত করাই মূল উদ্দেশ্য। কারণ, কোরআন শরীফ কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা কেন্দ্র। ইহাতে আধ্যাত্মিক রোগসমূহের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য। কারণ, আজকাল মানুষ কোরআনের উদ্দেশ্য মোটেই বুঝে না। কোরআনে যাহা নাই, তাহাই কোরআনে তালাশ করা হয়। কেহ বিজ্ঞান তালাশ করে, আবার কেহ ভূগোল খুঁজিয়া ফিরে। যাহারা কোরআন দ্বারা এই সব প্রমাণ করার প্রয়াস পায়, তাহাদের কার্যকলাপ তো আরও বেশী আশ্চর্যজনক। কেননা, যে জানে না, সেই তালাশ করে। সুতরাং তাহার এই ভুল আশ্চর্যজনক বটে। কিন্তু যাহারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা যেহেতু জানিয়া বুঝিয়া ভুল করে, এই জন্য তাহাদের কাজটি বেশী আশ্চর্যজনক। প্রায়ই দেখা যায়, দর্শনের কোন নূতন তত্ত্ব উদঘাটিত হইলে জোরজবরদস্তি উহাকে কোরআনের অন্তর্ভুক্তকরত অত্যন্ত গর্বের সহিত বলা হয়—তেরশত বৎসর পূর্বেই কোরআন এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে অবহিত করিয়াছে। ইহাতে কোরআনের অসাধারণ উচ্চাঙ্গ গুণসম্বলিত হওয়া সপ্রমাণ করা হয় এবং এই সব শাস্ত্রকে ইসলামী শাস্ত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা যারপরনাই পরিতাপের বিষয়। আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, এই সব তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রকৃত ইসলামী শাস্ত্রের বাতাসেরও সাক্ষাৎ পায় নাই। বন্ধুগণ! বিজ্ঞান ও কারিগরিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোরআনের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাহাই জিজ্ঞাস্য। কোরআনে ইহাদের উল্লেখ থাকিলেও তাহা গৌণ। কোরআনের প্রধান আলোচ্য বিষয় শুধু একটি। তাহা হইতেছে খোদার নৈকট্য লাভের উপায়। এই উপায়সমূহের সহিত যে সব বিষয় সম্পৃক্ত, উহাদের উল্লেখ কোথাও উদ্দেশ্য হিসাবে এবং কোথাও গৌণ হিসাবে হইয়াছে।

উদাহরণতঃ, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আমলসমূহ উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ, এগুলি নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। আর কতকগুলি বিষয় আসল উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে গৌণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদাহরণতঃ, কোরআন একত্ববাদের দাবী করিয়া ইহার দলীলস্বরূপ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ আয়াতখানি উল্লেখ করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত সৃষ্টজগতে একত্ববাদের দলীল মওজুদ রহিয়াছে। আসলে সমস্ত সৃষ্টজগৎ কয়েকটি দিকবিশিষ্ট। প্রথমতঃ, একত্ববাদের দলীল হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, উহার সৃষ্ট হওয়ার উপর এবং তৃতীয়তঃ, উহাতে পরিবর্তন আসার রীতিনীতি। এই তিনটি দিকের মধ্য হইতে সৃষ্টজগতের সহিত কোরআনের সম্পর্ক শুধু প্রথম দিক দিয়া। সুতরাং অন্যান্য দিক সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে, যেমন, মেঘ কিরূপে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি কিরূপে হয় ইত্যাদি এবং এসব প্রশ্নের উত্তর কোরআনে তালাশ করে, তবে তাহা নিছক ভ্রান্তি বৈ কিছুই হইবে না। স্বয়ং এগুলি সম্বন্ধে গবেষণায় মগ্ন হওয়াও একেবারে নিরর্থক।

হাদীসে বলা হইয়াছে, مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَايَعْنِيْهِ "নিরর্থক কাজ কর্ম ত্যাগ করাই মুসলমানদের সৌন্দর্য।" হুযূর (দঃ)-এর এই দরকারী উক্তিটি যথাযথ পালন করিতে থাকিলে আমরা বহুবিধ জটিলতার কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারি। এই উক্তিটির শব্দের সামান্য পরিবর্তন করিলেই ইহার স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া যাইবে। ইহার সারমর্ম এই যে, হুযূর (দঃ) অনর্থক সময়

নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনর্থক সময় নষ্ট করার অপকারিতা ও সময়ের যথাযথ সংরক্ষণ করার উপকারিতা সম্বন্ধে এই যুগে প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু একমাত্র শরীঅতই বিষয়টি কার্যে পরিণত করিয়াছে। অন্যান্যরা শুধু দাবীই করিয়া বেড়াইতেছে। যাক, যাহাতে কোন উল্লেখযোগ্য উপকার নাই, উহাই নিরর্থক।

**কোরআন ও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রঃ** এখন বলুন, কেহ যদি প্রমাণ করিতেই পারে যে, এইভাবে মেঘ উৎপন্ন হয় এবং এইভাবে বৃষ্টি হয়, তবে ইহাতে কি কেল্লা ফতহে হইয়া গেল? পক্ষান্তরে এসব তত্ত্ব জানা না থাকিলেই কোন্ জরুরী কাজটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে? ইহা নিছক একটি তত্ত্বানুসন্ধান—যাহাতে শুধু মানব মনের তৃপ্তি, তাছাড়া যদি মানিয়াও লওয়া হয় যে, এই সব তত্ত্বানুসন্ধানে সাংসারিক উপকার নিহিত আছে, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে কি না। ইহা মোটা কথা যে, বাদশাহ্‌দের কানূন তথা আইন বহিতে ব্যবসা ও কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় বটে; কিন্তু শুধু এই দিক দিয়া যে, কোন্ ব্যবসাটি বৈধ এবং কোন্‌টি অবৈধ। শান্তি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় আলোচনা করা হয়। ব্যবসা এইভাবে করিতে হয়, লাভ করিবার এই এই উপায় ইত্যাদি কথা কোন আইন বহিতেই হয় না। যদি মনে করেন যে, আইনের বহিতে এই সব বিষয়ও বর্ণিত হওয়া জরুরী, তবে গভর্নমেন্টের আইন বই খুলিয়া দেখান, কোথায় ইহাদের উল্লেখ আছে?

কোরআনও শান্তি ও মুক্তির একটি আইন বহি। দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, কোরআন তাহাই চায়। এমতাবস্থায় দুনিয়ার শাসনকর্তাদের আইন বহিতে যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করা না হয়, খোদার কালাম কোরআনে তাহা অনুসন্ধান করা খুবই অবিচারের কথা। ইহাতে বুঝা যায় যে, মানুষ আইন বহির আসল স্বরূপ বুঝিতেই পারে নাই।

এই আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ভৌগলিক তত্ত্ব ইত্যাদি উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রয়োজন-বশতঃ গৌণ হিসাবে ইহাদের উল্লেখ হইতে পারে এবং প্রয়োজন যতটুকুই, ততটুকুই উল্লেখ হইবে। সেমতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এতটুকুই আলোচনা হইবে যে, এগুলি সৃষ্ট বস্তু এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর জন্য সৃষ্টিকর্তা অত্যাবশ্যক। এই যুক্তি উত্থাপনের জন্য ঐসব জিনিসের আসল স্বরূপ উদঘাটন করা জরুরী নহে; বরং উহাদের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট। উপরোক্ত যুক্তি এই সব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল বলা ক্ষতিকর। কারণ, দলীলের কথাগুলি দুই প্রকার হইতে পারে—(১) প্রমাণ সাপেক্ষ এবং (২) পূর্বনির্ধারিত সত্য। প্রমাণ সাপেক্ষ কথাগুলিও শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা বুঝার পর জানা দরকার যে, কোরআন هُدًى لِّلنَّاسِ (মানবজাতির জন্য হেদায়ত) এবং هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (পরহেযগারদের জন্য হেদায়ত)।

**কোরআন কিরূপে বুঝিতে হইবেঃ** কোরআন পরহেযগারদের জন্য হেদায়ত—ইহাতে কেহ বুঝিবেন না যে, ইহা অপরহেযগারদের জন্য হেদায়ত নহে। এই আয়াত সম্বন্ধে অনেকেই ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত রহিয়াছে। অপর আয়াতটি সম্বন্ধেও তাহারা ভুল বুঝিয়া থাকে। কোরআনকে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখাই এই সব ভুল বুঝাবুঝির বড় কারণ। এই সফরেও জনৈক ব্যক্তি আমাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি বলিলাম, ইহা কোন প্রশ্নই নহে; বরং ইহা ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। অর্থ এই যে, বর্তমানে যাহাদিগকে পরহেযগার দেখা যায়, এই কোরআনের বদৌলতেই তাহারা পরহেযগার হইতে পারিয়াছে। এই উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকারী খুব আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল, এখন ব্যাপারটি আমার কাছে খুব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আসলে ইহাতে কোন

www.almodina.com

ঘোরপেঁচ নাই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, মানুষ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনকে দেখে। এই কারণে যাবতীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পূর্বে কোরআন শরীফ কোন সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ আলেমের নিকট পাঠ করা জরুরী। নিরেট অনুবাদের সাহায্যে নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া কোরআনকে সম্যকভাবে বুঝা সম্ভবপর নহে।

আমার বেশ মনে পড়ে—একবার জনৈক উকিল সাহেব আমার বাড়ীতে মেহমান হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আইনের বই ছিল। আমি উহা পড়িয়া তাঁহার সম্মুখে একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহার এই অর্থ নহে। এখন অনুমান করুন, আমরা কোন বিশেষজ্ঞের নিকট না পড়া পর্যন্ত আমাদের স্বজাতির রচিত উর্দু গ্রন্থই পড়িয়া সম্যকভাবে বুঝিতে পারি না। এমতাবস্থায় শুধু উর্দু অনুবাদ দেখিয়া কোরআন শরীফ বুঝিয়া ফেলা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

সুতরাং যাহারা শুধু অনুবাদ দেখিয়া কোরআন বুঝিতে চায়, তাহারা মারাত্মক ভুলে পতিত আছে। এর পর সর্বনাশের উপর সর্বনাশ এই যে, যেসব অনুবাদ হিসাবেও শুদ্ধ নহে, তাহাই অধ্যয়ন করা হয়। কোরআনের 'মদলূল' তথা অভীষ্ট অর্থ বহাল থাকা অনুবাদের বেলায় অত্যাবশ্যক। আজকালের অনুবাদের মধ্যে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে যাইয়া বিষয়বস্তুর প্রতি মোটেই লক্ষ্য করা হয় না। অথচ কোরআনের অনুবাদে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করা মোটেই জরুরী নহে। কারণ, কোরআন সাহিত্য পুস্তক নহে। কোরআন আলেমদের নিকট বুঝা উচিত।

কোরআনের অনুবাদকে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখার সহিত তুলনা করা যায়। যদি অপ্রাঞ্জল শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখা হয়; কিন্তু ঔষধের নাম ঠিক ঠিক লিখা হয়, তবে ব্যবস্থাপত্র উপকারী সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে প্রাঞ্জল শব্দ সহকারে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াও যদি ঔষধের নাম ভুল লিখা হয়, তবে ব্যবস্থাপত্র কোন কাজে আসিবে না।

ভুলবশতঃ অনুবাদে শুধু ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করে—যদিও কোরআনের আসল অর্থ রক্ষিত না থাকে। বর্তমানে এই ধরনের বহু অনুবাদ বাজারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নাম নির্দিষ্ট করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। তবে কোন অনুবাদ পাঠ করার পূর্বে আলেমদের নিকট হইতে জানিয়া লওয়া আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। জানিয়া লওয়ার পরও নিজে নিজে পাঠ করাকেই যথেষ্ট মনে করিবেন না; বরং কোন উস্তাদের নিকট পড়িয়া লইবেন। কোরআন শরীফ শুদ্ধরূপে বুঝার ইহাই উপায়।

মোটকথা, না বুঝিয়া কোরআন পাঠ করার ভুলটি আজকাল ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বিভিন্ন প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়া উঠে। নতুবা আসলে কোনও প্রশ্ন নাই। উদাহরণতঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতখানি দ্বারাই বুঝিয়া নিয়াছে যে, ইহা শুধু পরহেযগারদের জন্য হেদায়ত—অন্যের জন্য নহে। অথচ ইহা ভুল। কোরআনের শিক্ষা এবং প্রমাণাদি ব্যাপক ও সকলের জন্য সহজবোধ্য। এখানে একটি ভিন্ন আলোচনার অবতারণা করিতেছি।

**আজকালের রোগঃ** আলোচনাটি এই যে, এক্ষেত্রে সন্দেহ হয় যে, কোরআনের প্রমাণাদি সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইলেও প্রত্যেকেরই ইজতিহাদ করার অধিকার থাকা উচিত। সেমতে আজকাল ইজতিহাদের এত বেশী জোর যে, মানুষ অনুবাদ দেখিয়াই ইজতিহাদে প্রবৃত্ত হইয়া যায়।

www.almodina.com

একবার জনৈক মুয়ায্‌যিন আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, কোরআন শরীফ দ্বারা (ওযূ করার সময়) পা মছেহ্ করাও প্রমাণিত হয়। এর পর সে শাহ্ আবদুল কাদের (রঃ)-এর একখানা অনুবাদও আনিয়া আমাকে দেখাইল। এই অনুবাদটি অবশ্য শুদ্ধ এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; কিন্তু ইহাও নিজে নিজে পড়িয়া যথাযথ বুঝা খুবই কঠিন। উহাতে ওযূর আয়াতের অনুবাদ এইরূপ লিখিত ছিল—ধৌতকর আপন মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে এবং মোছ আপন মাথাকে (এর পর রহিয়াছে وَاَرْجُلَكُمْ শব্দটি। ইহাকে পূর্ববর্তী শব্দ وَاَيْدِيَكُمْ -এর উপর عطف তথা সংযোগ করা হইয়াছে এবং ইহা اِغْسِلُوْا ক্রিয়ার কর্ম। ইহার অনুবাদ এইরূপ লিখিত ছিল—) এবং পদদ্বয়কে। نحو ও صرف (আরবী শব্দবিন্যাস ও বাক্যবিন্যাস প্রণালী) না জানার কারণে আপনি বুঝিতে পারিবেন না যে, ইহার সম্পর্ক কোনটির সহিত। আপনি হয়ত নিকটতম শব্দের সহিত সম্পর্ক দেখাইয়াছেন। نحو ও صرف জানা না থাকিলে এরূপ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিবে যে, وَاَرْجُلَكُمْ শব্দটি যবরবিশিষ্ট ( منصوب ) দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহার সম্পর্ক مجرور (যেরবিশিষ্ট)-এর সহিত হইতে পারে না। مجرور -এর কেরাআত গ্রহণ করা অবশ্য ভিন্ন কথা। এখন অন্যান্য قواعد দ্বারা ইহা কোনটির উপর عطف তাহা জানা যাইবে। মুয়ায্‌যিনকে কিরূপে বুঝাইব, এ বিষয় আমি খুবই পেরেশান হইলাম। তাহাকে কিরূপে বলিব যে, وَاَيْدِيَكُمْ শব্দের উপর ইহার عطف হইয়াছে। কারণ, عطف কি বস্তুর নাম, সে তাহাই জানে না। অবশেষে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার সহিত মাথাঘামানো কোন কাজে আসিবে না। কারণ, ব্যাপারটি তাহার যোগ্যতা হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

যোগ্যতার সীমা বহির্ভূত বিষয়ে প্রশ্ন করাও আজকালকার একটি রোগ। একবার জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে আমাকে একটি প্রশ্ন করে। আমি বলিলাম, ইহা বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র) সম্বন্ধীয় বিষয়। আপনি ইহা বুঝিতে পারিবেন না। সে বলিতে লাগিল, বাঃ সাহেব, যিনি প্রত্যেককেই তাহার বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝাইতে সক্ষম, তিনিই তো আলেম। আমি বলিলাম, ভাল কথা আপনি আমাকে জ্যামিতির প্রথম সূত্রের পঞ্চম নক্সাটি বুঝাইয়া দিন তো দেখি। এইভাবে বুঝাইবেন যে, উহাতে পারিভাষিক কায়দা কানূনের বরাত এবং প্রচলিত শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারিবে না। যদি এইভাবে বুঝানো সম্ভবপর হয়, তবে আমি তাহা শুনিবার জন্য উদগ্রীব। আর যদি বলেন যে, এইভাবে বুঝানো সম্ভব নহে, তবে আমি বলিব যে, জ্যামিতির পণ্ডিত ঐ ব্যক্তিকেই বলা হইবে, যে প্রত্যেককেই তাহার বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝাইয়া দিতে পারে।

এর পর সে বলিল, তবে ইহা বুঝার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? আমি বলিলাম, যদি বাস্তবিকই আগ্রহ থাকে, তবে ইঞ্জিনিয়ারীকে সিকায় উঠাইয়া রাখুন এবং আমার নিকট 'মীযান' হইতে কিতাব পড়া আরম্ভ করুন। এই সীমানা পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তখন আমি আপনাকে ইহা বুঝাইয়া দিব। সে আবার বলিল, এখন বৃদ্ধাবস্থায় আবার পড়িতে বসিব? আমি বলিলাম, তথ্যানুসন্ধানে আগ্রহ থাকিলে তাহা মিটাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহা পছন্দ না হইলে আমি যাহা যেভাবে বলি, সেইভাবেই মানিয়া লউন। এই বিষয়টি এতই জাজ্বল্যমান যে, প্রত্যেকেই ইহা জানে এবং দিবারাত্র এইভাবেই সমস্ত কাজকর্ম চলে।

মনে করুন, কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি কুড়ি টাকা মাস হিসাবে চাকুরী করে। সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, ষোল দিনের বেতন কত? আপনি অঙ্ক করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন। এর পর যদি

সে বলে যে, ষোল দিনের বেতন এত টাকা কিরূপে হইল? এমতাবস্থায় আপনি তাহাকে কি বলিবেন? আপনি ইহাই বলিবেন যে, মিয়া, তুমি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না। যদি বুঝিতেই চাও, তবে প্রথম হইতে যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ ইত্যাদি শিখিয়া লও। এর পর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর। ইহাতে যদি সে বলে যে, আমি বৃদ্ধাবস্থায় অঙ্ক শিখিব—এ কেমন কথা? এমতাবস্থায় আপনি ইহাই বলিবেন যে, কারণ বুঝিবার জন্য ইহার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। যদি সাহসে না কুলায়, তবে আমি যাহা বলিয়াছি, সত্য মনে করিয়া তাহা মানিয়া লও।

এমনিতর বহু ঘটনা প্রত্যহ ঘটিতেছে। সাংসারিক ব্যাপারাদিতে কেহ কাহারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। সর্বদাই অন্যের কথার অনুসরণ করা হয়। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে প্রত্যেকেই মুজ্‌তাহিদ সাজিয়া যায়। চিকিৎসকের কাছে গেলে সে যাহা বলে, বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া নেওয়া হয়। কেহ জিজ্ঞাসা করে না যে, ব্যবস্থাপত্রে এই ঔষধটি কেন লিখা হইল এবং এই ঔষধটির এই পরিমাণ কেন দেওয়া হইল? ইহার কারণ এই যে, ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করার ইচ্ছা থাকে। প্রাণ বড় প্রিয় ধন। খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিলে ডাক্তার চটিয়া যাইতে পারে। ফলে ঔষধই হয়ত দিবে না। অপরপক্ষে ধর্মের বিষয়ের উপর আমল করার আন্তরিক ইচ্ছা নাই। খোদার কসম, ধর্মের উপর আমল করার ইচ্ছা থাকিলে ইহাকে নেয়ামত মনে করিত যে, তাহাকে সোজা পথ বলিয়া দেওয়ার লোকও আছে। কেননা, মানুষ যখন কোন কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা করে, তখন ঐ সম্বন্ধে অনুকূল জ্ঞান লাভকে সে গনীমত মনে করে। যে ক্ষেত্রে কাজ করার ইচ্ছা থাকে না, সেখানেই নানা দ্বিধা ও শঙ্কা দেখা দেয়।

উদাহরণতঃ, এক ব্যক্তি ষ্টেশনে পৌঁছার রাস্তা জানে না; কিন্তু তাহাকে ষ্টেশনে পৌঁছিতেই হইবে। এমতাবস্থায় কোন মামূলী ব্যক্তিও যদি বলে, চলুন, আমি আপনাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেই, তবে বিনা দ্বিধায় সে তাহার সঙ্গে চলিতে থাকিবে। এক্ষেত্রে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, এই রাস্তাটি যে ষ্টেশনেই যাইবে এবং ষ্টেশন হইতে দূরে লইয়া যাইবে না—তোমার কাছে ইহার কি দলীল আছে? ইহার কারণ এই যে, এই ব্যক্তি জানে, এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিধা ও শঙ্কা প্রকাশ করিলে ঐ ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া তাহাকে সেখানেই ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। ফলে সে ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারিবে না।

তদ্রূপ কোন বড় জংশন-ষ্টেশন যদি জানা না থাকে যে, কোন্ গাড়ীটি দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ যাইবে, তবে একজন কুলীর কথায়ও পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া যায় এবং বিনা দ্বিধায় তাহার কথা মানিয়া লওয়া হয়। শুধু তাহাই নহে; বরং বিনা পয়সায় এই জ্ঞান লাভ হওয়াকে গনীমত মনে করিয়া কুলীকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তবে দিল্লী অথবা লক্ষ্ণৌ যাওয়ার ইচ্ছা না থাকিলে কুলীকে নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হয় এবং তাহাকে বোকা বানাইতে গিয়া বলা হয়, হাঁ, মিয়া, কিরূপে জানিলেন যে, গাড়ীটি কানপুরেই যাইবে এবং ঠিক দশটায়ই ছাড়িয়া যাইবে।

মোটকথা, সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞান ভিত্তিক যোগ্যতা না হওয়া পর্যন্ত অন্যের অনুসরণ করা উচিত। এরূপ যোগ্যতা হইয়া গেলে তাহা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। তখন যে কোন প্রশ্ন (নিরর্থক না হইলে) করিতে পারে। কিন্তু আজকাল প্রশ্ন করা অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

মুয়ায্যিনও এমনি পা মছেহ্ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। আমি বলিলাম, ইহা যে কোরআন, তাহা কিরূপে জানিলে? উত্তর দিল, আলেমদের কথায় জানিলাম। আমি বলিলাম, আলেমদের কথায়

যখন কোরআনের কোরআন হওয়া মানিতে পারিলে, তখন তাঁহাদেরই কথা অনুযায়ী ইহাও মানিয়া লও যে, পা মছেহ্ করিতে হয় না; বরং ধৌত করিতে হয়। বাস্তবিকই ইহা মোটা কথা যে, একটি আরবী কিতাবকে যখন আলেমদের কথায় কোরআন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তখন তাঁহাদের কথায় একটি মাসআলা মানিয়া নিতে দ্বিধা করা কি উচিত?

প্রতাপগড়ে জনৈক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিলে সে 'ফাতেহা খালফাল ইমাম' অর্থাৎ, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা-ফাতেহা পাঠ করা সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিল। আমি বলিলাম, ইহা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মাসআলাই আপনার নিকট প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে কি? সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম, আপনি মুসলমান, কাজেই আমি আপনার নিকট প্রমাণ চাহিব এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্মকে খণ্ডন করিতে বলিব। যদি আপনি কোথাও ইতস্ততঃ করেন, তবে বুঝিব, আপনি মুকাল্লিদ (অন্যের অনুসারী)। আসল ধর্মের ব্যাপারেই যখন আপনি অন্যের অনুসরণ করিয়াছেন, তখন খুঁটিনাটি মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপার অনুসরণ করিতে লজ্জাবোধ করেন কেন?

আসল ব্যাপার এই যে, আজকাল মানুষ কাজ করিতে চায় না। যাহারা কাজ করিতে চায়, তাহাদের আকৃতিই ভিন্নরূপ। এই কারণে আমি বলিব, কোন আলেমের নিকট কোরআন না পড়া পর্যন্ত শুধু অনুবাদ দেখিয়া লওয়াই যথেষ্ট নহে। নিজে নিজে পড়ার আগ্রহ হইলে শুধু শব্দ পড়া উচিত। কেননা, নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া কোরআনের সঠিক মর্ম বুঝা সম্ভব নহে। উদাহরণতঃ, কোন ওস্তাদের নিকট না পড়িয়া আইন পরীক্ষা দিতে চাহিলে কিছুতেই পাশ করিতে পারে না। প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বসিলেই মনের মধ্যে নানা সন্দেহ দেখা দিবে। এরূপ ক্ষেত্রে নিজস্ব জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করা হইবে না। সাধারণ একটি আইনের বেলায় যদি এই অবস্থা হয়, তখন কোরআন এত সস্তা হইয়া গেল কেন যে, প্রত্যেকেই ইহাতে নিজস্ব তথ্যানুসন্ধানের স্পৃহার চূড়ান্ত করিয়া দিতে চায়? এ ব্যাপারে আলেমদের মতের সঙ্গেও বিনা দ্বিধায় টক্কর দেওয়া হয়।

**কোরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রকারভেদঃ** আমি এই সন্দেহ বর্ণনা করিতেছিলাম যে, কোরআন খুব সহজবোধ্য হইলে প্রত্যেকেরই তথ্যানুসন্ধান করার অধিকার নাই—কেন? আসল ব্যাপার এই যে, কোরআনের শব্দ ও অনুবাদ সহজ, কিন্তু উহা হইতে মাসায়েল বাহির করা খুবই কঠিন। এ কাজের জন্য ইজতিহাদ ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন। এগুলি আমাদের কাছে নাই। কোরআনের শুধু এই অংশটিই কঠিন। বাকী সমস্তই সহজ। তওহীদের প্রমাণাদিও এই দিক দিয়া সহজ যে, কেহ মুজতাহিদ না হইলেও তাহা সহজেই বুঝিতে পারে।

এখন বুঝুন যে, তওহীদের প্রমাণাদিতে বিজ্ঞানের বিষয়াদি উল্লিখিত হইলে বিজ্ঞান না বুঝা পর্যন্ত তওহীদ বুঝা যাইত না। বিজ্ঞান স্বয়ং প্রমাণ সাপেক্ষ বিষয়। সুতরাং ইহা না বুঝিলে তওহীদ প্রমাণিত হইত না। অথচ আরবের মূর্খ মরুবাসীদিগকেও সম্বোধন করিয়া তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হইয়াছে, তবে তাহাদের পক্ষে তওহীদ বুঝা কিরূপে সম্ভব হইত? কোরআনে বিজ্ঞানের আলোচনা প্রবিষ্ট করার ইহাই হইল অপকারিতা। অর্থাৎ, কোরআনের আসল উদ্দেশ্যই নস্যাৎ হইয়া যায়।

কোরআনের স্থানে স্থানে অবশ্য سماوات (আকাশসমূহ) এবং ارض (যমিন) শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু سماوات শব্দটিকে বহুবচন এবং ارض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হইয়াছে —যাহাতে দলীলের সূচনাতেই চিন্তাধারা বিভিন্ন দিকে ধাবিত না হইয়া যায়। এর পর স্বতন্ত্র

প্রমাণ দ্বারা বলিয়া দিয়াছেন যে, যমীনও সাতটি। অনেকে ইহাতেও আপত্তি করিয়া বলে, আমরা পৃথিবীর সর্বত্রই ঘুরাফিরা করিয়াছি; কিন্তু অন্য কোন যমীন বা পৃথিবী কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যে হাদীসে একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাতে ارض। শব্দের অনুবাদ اقليم। (সমস্ত ভূখণ্ডের এক সপ্তাংশ) করিয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, কোন কোন আলেম ব্যক্তিও এইরূপ অনুবাদ লিখিয়াছেন। আমি বলি, কোরআন শরীফে যেখানে سبع سماوات طباقا (স্তরে স্তরে সাত আসমান) এর পর من الارض مثلهن (পৃথিবীও আসমানের ন্যায় সাতটি) বলা হইয়াছে, সেখানে اقليم। অনুবাদ করার অবকাশ কোথায়? হাদীসে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, আসমান সাতটি এবং এক আসমান হইতে অন্য আসমানের দূরত্ব ৫০০ বৎসরের পথ। পাঁচশত বৎসর বলিয়া অধিক পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে। এর পর যমীন তথা পৃথিবী সম্বন্ধেও একইরূপ বলা হইয়াছে। এখানে اقليم -এর ব্যাখ্যা কিরূপে চলিতে পারে? আমরা অন্য পৃথিবী দেখি না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সম্ভবতঃ অন্য পৃথিবীগুলি কোন গ্রহ হইবে। কয়েকটি গ্রহই হয়ত কয়েকটি পৃথিবী হইবে।

পরিতাপের বিষয়, মুসলমানগণ স্বজাতীয় লোকদের মুখে কোন কথা শুনিলে তাহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই কথাটিই বিজাতিরা বলিলে শুদ্ধ মনে করিত। এই পৃথিবী সম্বন্ধেই আলেমগণ বহুদিন যাবৎ বলিয়া আসিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা কেহ কানে লয় না। এখন কিছুদিন যাবৎ বিজাতীয় পণ্ডিতগণ গ্রহ সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, মঙ্গলগ্রহ কোন কোন দিক দিয়া আমাদের পৃথিবীর ন্যায়। এখন মুসলমানগণ এই সব অভিমত শুধু বিশ্বাসই করে না; বরং প্রশংসা করিয়া বলে যে, ইহা বিরাট ও সর্বাধুনিক তথ্যানুসন্ধান বটে।

মোটকথা, এই সব গ্রহই ভিন্ন পৃথিবী হইতে পারে। সেখানে হয়ত কোন ভিন্ন সৃষ্টিজীব বসবাস করে। আমরা উহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। আমাদিগকে তাহা বলাও হয় নাই। বলিতে কি, ইহার কোন প্রয়োজনও নাই। আমরা নিজেদের খবরই জানি না—অন্য সৃষ্টিজীবের খবর কি ছাই জানিব? আমাদের অবস্থা তো হইলঃ

تو کار زمین را نکو ساختی ـ که با آسمان نیز پر داختی

"তুমি কি যমীনের কাজ ভালরূপে করিতেছ যে, আকাশের কাজেও মশগুল হইয়া পড়িবে?"

আমাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়—যাহার উপর কয়েকটি ফৌজদারী মোকদ্দমা কায়েম রহিয়াছে; কিন্তু ঐ বোকা নিজের চিন্তা না করিয়া সমস্ত এলাহাবাদ জিলার মোকদ্দমা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়া ফিরে। তাহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিলে সব কিছু ছাড়িয়া শুধু নিজের মোকদ্দমা সম্বন্ধেই চিন্তা করিত। যাহারা দুনিয়া সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত; কিন্তু নিজের খবর মোটেই রাখে না, তাহাদের অবস্থাও তথৈবচ। তাহাদের উপরও খোদায়ী দণ্ডবিধির অনেক গুলি ধারা আরোপিত হইতেছে। ইহা তাহাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ও অমনোযোগিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

মোটকথা, আমাদিগকে যদিও বলা হয় নাই, তথাপি চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে কিছু কিছু সৃষ্টিজীবের বসবাস অসম্ভব নহে। সুতরাং কোরআনের আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করার প্রয়োজন নাই। যাক, একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্ব যদিও প্রমাণিত ছিল, তথাপি কোরআনে ارضين। বহুবচনে বলা হয় নাই; বরং একবচনে বলা হইয়াছে।

কেননা, এই সব সৃষ্টিবস্তু দ্বারা তওহীদের প্রমাণ উপস্থিত করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রমাণের বাক্যাবলী সর্বদা স্বীকৃত হওয়া জরুরী। এমতাবস্থায় ارضين বহুবচন বলিলে উদ্দেশ্য প্রমাণিত না হইয়া একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্ব একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হইয়া যাইত। একবচন বলায় এই লাভ হইয়াছে যে, যাহারা একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাহারা ارض শব্দ দ্বারাও তাহা বুঝিতে পারে। কারণ, ইহা اسم جنس কম বেশী সবই বুঝায়। পক্ষান্তরে যাহারা অবগত নহে, তাহারা বাহ্যতঃ এক পৃথিবী দেখিয়া আসল দলীল বুঝিয়া ফেলে। অতএব, বুঝা গেল যে, শ্রোতার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন বিষয় কোরআনে উল্লিখিত হয় নাই। বিজ্ঞানের বিষয়াদি উহাতে থাকিলে শ্রোতা উহার তথ্যানুসন্ধানে লাগিয়া যাইত। প্রত্যেকের পক্ষে উহার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ সম্ভবপর ছিল না। ফলে প্রত্যেকেই এক প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হইয়া পড়িত। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানের বিষয়াদিতে এত বেশী মতভেদ রহিয়াছে যে, আজ পর্যন্তও কোন একটি অভিমত সুচিন্তিত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। মেরু অঞ্চল একটি বাস্তব ও ইন্দ্রিয়ভূত ব্যাপার। সেখানে পৌঁছার ব্যাপারে কত যে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমতাবস্থায় সত্য মাসায়েলের ভিত্তি ইহাদের উপর কিরূপে কায়েম হইত? সুতরাং কোরআনকে এসব কিছু হইতে খালি রাখা ওয়াজিব। ইহাই কোরআনের সৌন্দর্য। প্রত্যেক শাস্ত্রের পক্ষেই ইহা একটি সৌন্দর্য। ব্যাকরণ শাস্ত্রে চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত না হওয়াই ব্যাকরণ শাস্ত্রের সৌন্দর্য। চিকিৎসা শাস্ত্রে কৃষি ও বাণিজ্যের বিষয়াদি না থাকাই চিকিৎসা শাস্ত্রের সৌন্দর্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন পুস্তকে যদি প্রত্যেক পাতার পর একটি করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়, তবে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি উহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। কেননা, চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকে এসব বিষয় থাকা মোটেই স্থানোপযোগী নহে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। আমাদের দেশে জনৈক কবি ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইহলোকে বাঁচিয়া নাই। তিনি একখানি বাজে ধরনের কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে দ্বাদের ( ض ) রদীফ (কবিতায় শামিল শব্দ) ছিল না। লোকেরা বলিল, জনাব, আপনার কাব্যগ্রন্থে ( ض ) দ্বাদ-এর রদীফ নাই যে? তিনি বলিলেন, অন্য কোন রদীফ হইতে একটি গযল লইয়া প্রত্যেকটি পংক্তির শেষে مقراض (কাঁচি) শব্দটি যোগ করিয়া দাও। এইভাবে দ্বাদ-এর রদীফ তৈরী করিয়া লিখিয়া দাও। চিন্তা করুন, কবি সাহেবের এই কার্যক্রম কিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হইবে? আপনারা কি চান যে, কোরআনও তেমনি একটি কাব্যগ্রন্থ হউক, যাহাতে সমস্ত অক্ষরের রদীফ থাকে, কিন্তু পরস্পরে অসংলগ্ন?

**কোরআনের শান্তি শিক্ষাঃ** কোরআন মাত্র দুইটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। (১) সাধারণ শান্তি। ফলে দুনিয়াতে کسے را با کسے کارے نباشد "কাহারও সহিত কাহারও মনোমালিন্য নাই" এর ন্যায় অবস্থা বিরাজ করিবে।

আমার মতে, কোরআন যেরূপ শান্তি শিক্ষা দিয়াছে, কোন আইন কানূন তাহা পারে নাই। পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে বিজাতীয় লোকগণ মুসলমানদিগকে কলহপ্রিয় বলিয়া আখ্যা দেয়। অথচ তুলনামূলকভাবে দেখিলে মুসলমানদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় ও নিরাপত্তা সন্ধানী জাতি দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি নাই। উদাহরণতঃ একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। জুমুআ সম্বন্ধে কোরআন বলেঃ

اِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ

"নামায শেষ হইলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়।" শুধু খোদার এবাদতে ও তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করার উদ্দেশ্যে যে জনসমাবেশ হইয়াছে, উহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কাজ শেষ হইয়া গেলে একত্রিত থাকার কোন প্রয়োজন নাই। সকলেই পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়। কেননা, অনর্থক সমাবেশের কারণে কোন অনর্থ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর পর বলেনঃ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ "এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ কর।" উদ্দেশ্য এই যে, ছড়াইয়া যাওয়ার পর উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরাফিরা করিও না। কেননা, ইহাতেও ফ্যাসাদের আশঙ্কা আছে; বরং তোমরা হালাল রুযী অন্বেষণ করার কাজে লাগিয়া যাও। এর পর বলেনঃ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا "এবং খোদাকে খুব বেশী স্মরণ কর।" কেননা, খোদার নৈকট্য লাভই আসল উদ্দেশ্য। হক তা'আলার এই কালাম হইতে জানা যায় যে, অনাবশ্যক জনসমাবেশ না হওয়া উচিত। প্রয়োজনবশতঃ একত্রিত হইলে প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্রই সকলের বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া উচিত। চিন্তা করুন, নামাযীদের সমাবেশে কোনরূপ দাঙ্গা ফ্যাসাদের আশঙ্কাই নাই। তবে হক তা'আলা জানেন যে, মানুষ স্বভাবতই দুর্বল। ফলে এইরূপ সমাবেশেও বাদানুবাদ হওয়া বিচিত্র নহে, যদিও জুতা মারামারি না হয়। এই কারণেই সকলকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।

মোটকথা, প্রথম বিষয় হইল শান্তি স্থাপন এবং দ্বিতীয় হইল খোদার সন্তুষ্টি লাভ। এই দুইটি ছাড়া কোরআনে তৃতীয় কোন বিষয় থাকিলে উহা ইহাদের অনুসারী হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত দুইটি বিষয় ছাড়া কোরআনে অন্য কোন কিছু তালাশ সঙ্গত নহে। কোরআনে যেসব কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, উহাও উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের সেবক হিসাবে। উদাহরণতঃ অমুক জাতি এইরূপ কাজ করিয়াছিল, তাহাদিগকে এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। অমুক জাতি এই সৎকাজটি করিয়াছিল, ফলে তাহাদিগকে এইরূপ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। আমরাও যদি এরূপ করি, তবে তদ্রূপ শাস্তি অথবা পুরস্কার পাইব। কাজেই বুঝা গেল, যেখানে ইতিহাসের ভঙ্গিতে কোন কিছু বলা হইয়াছে, সেখানে ঘটনাবলী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে; বরং উহার মৌলিক বিধানাবলীর প্রতি নির্দেশ করাই লক্ষ্য।

এখানেও ইব্রাহীম (আঃ)-এর দো'আ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মের প্রতি মনোযোগ দান করা অত্যন্ত জরুরী। আয়াতে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে। আয়াতের তরজমা এইরূপঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একজন রাসূল পয়দা কর। সে তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইবে, তাহাদিগকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে।" কোরআনে এই কাহিনী উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য এই যে, হে শ্রোতাগণ, ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দান করিয়াছেন এবং যাহার জন্য আমার নিকট দো'আ করিয়াছেন, ঐগুলিই জরুরী বিষয়।

এক্ষণে জানা উচিত যে, ঐ জরুরী বিষয়গুলি কি? বিস্তারিতভাবে দেখিলে তাহা হইতেছে তিনটি বিষয়। (১) يتلوا অর্থাৎ, পাঠ করা (২) يعلم অর্থাৎ, শিক্ষাদান এবং (৩) يزكى অর্থাৎ, পবিত্রকরণ। সংক্ষেপে এইগুলি একই জিনিস। অর্থাৎ, দ্বীন তথা ধর্ম। কেননা, এই সবগুলি দ্বীনেরই শাখা। দ্বীন দুইটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। একটি এল্‌ম বা জানা; দ্বিতীয়টি আমল বা কাজ করা। যেমন, চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের ও পরে তাহা আমল বা বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়।

**আধ্যাত্মিক রোগ নিরূপণঃ** কোরআনও প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা শাস্ত্র; ইহাতে আধ্যাত্মিক রোগসমূহের চিকিৎসা-পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি দিক বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা সম্পর্কিত রোগ হউক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত। আত্মা সম্পর্কিত রোগ ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না; বরং আত্মিক রুচি দ্বারা নির্ণীত হয়। আত্মিক রুচি শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহা জানিবার উপায় বাহ্যিক দলীল ব্যতীত আর কিছু নহে।

দলীল এই যে, খোদার আনুগত্যই হইতেছে সিরাতে মোস্তাকীম বা সোজাপথ। এই সোজাপথ হইতে স্খলিত হওয়া মানেই اعتدال তথা স্বাভাবিক পথ হইতে পদস্খলিত হওয়া। কেননা, সরল রেখা একাধিক হয় না। অর্থাৎ, দুইটি বিন্দুকে অনেকগুলি রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে উহাদের মধ্যে একটি মাত্র সরল রেখা হইবে এবং উহা হইবে সবচেয়ে খাট। অবশিষ্ট সবগুলি রেখা বক্র হইবে। স্বাভাবিক পথ হইতে স্খলিত হওয়াই রোগ। অতএব, খোদার নাফরমানী রোগ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ইহাতে আরও জানা গিয়াছে যে, ইসলামী শরীঅতই হইতেছে সকল পথ হইতে সংক্ষিপ্ত ও খাট পথ। এই স্বাভাবিক পথ হইতে যে কেহ স্খলিত হইবে, সেই রোগী বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোরআনেও ইহাকে রোগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছেঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ "তাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে।" আত্মিক রুচি শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই আয়াতের তফসীর বোধগম্য হইতে পারে না। কেননা, এই রোগ অবস্থা একটি গুপ্ত বিষয়—ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু আত্মিক রুচি শুদ্ধ হইলে তাহা দ্বারা উহা যে একটি রোগ তাহা নির্ণয় করা যায়। যেমন, বাহ্যিক রোগও মাঝে মাঝে আত্মিক রুচি দ্বারা ধরা যায় এবং মাঝে মাঝে ধরা যায় না। চিকিৎসা সম্পর্কিত রোগসমূহের মধ্যে যেরূপ কিছু সংখ্যক আত্মিক রুচির সহিত সম্বন্ধ রাখে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক রোগও আত্মিক রুচির সহিত সম্পর্ক রাখে। আত্মিক রুচি শুদ্ধ হইলেই উহাদিগকে উপলব্ধি করা যায়।

ইহার একটি পরীক্ষা বলিতেছি। কোন গোনাহ্‌র কাজ হইয়া গেলে লক্ষ্য করুন অন্তরে কি পরিমাণ দুঃখ ও কষ্ট অনুভূত হয় এবং নিজের নফ্‌সকে মানুষ কি পরিমাণ তিরস্কার করে। যদি কেহ বলে, আমরা দিবারাত্র গোনাহ্ করি, কিন্তু কখনও মনে কষ্ট অনুভূত হয় না; তবে আমি বলিব যে, এই ব্যক্তি শুরু হইতে আজ পর্যন্ত কেবল রোগেই আক্রান্ত রহিয়াছে। তাহার ভাগ্যে কখনও সুস্থতা ঘটে নাই। ফলে সুস্থতার আরাম এবং গোনাহ্ রোগের কষ্টও সে অনুভব করিতে পারে নাই। এই ব্যক্তি জন্মান্ধ ব্যক্তির ন্যায়। জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনও অনুভব করিতে পারে না যে, সে অন্ধ। কেননা, দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে অন্ধ বলা হয়। জন্মান্ধ ব্যক্তির কখনও দৃষ্টিশক্তিই ছিল না। কাজেই সে কিরূপে নিজকে অন্ধ বলিয়া উপলব্ধি করিবে? তদ্রূপ যে ব্যক্তি কখনও সুস্থতার আনন্দ লাভ করিয়াছে, সে-ই নিজকে রোগী ভাবিতে পারে এবং রোগের কষ্ট অনুভব করিতে পারে। অতএব, গোনাহ্ করার পর যাহার মন মলিন হয় না, বুঝিতে হইবে যে, সে কখনও প্রফুল্লতা অর্জন করিতে পারে নাই, তাহার উচিত প্রথমে প্রফুল্লতা অর্জন করা। এর পরই দেখিতে পাইবে যে, গোনাহ্‌র পর মনে কি পরিমাণ ব্যথা অনুভূত হয়।

কমপক্ষে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এক সপ্তাহের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ত্যাগ করিয়া কোন বরকতবিশিষ্ট বুযুর্গের খেদমতে যাইয়া দেখুক। তাঁহার নিকট খোদার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যেভাবে বলেন, সেইভাবে এক সপ্তাহ কাজে মশগুল থাকুক। কাজ আরম্ভ করার পর হইতেই সে অন্তরে নূতন অবস্থা অনুভব করিবে, যাহা পূর্বে ছিল না। এই প্রাথমিক অবস্থা এবং পূর্বের

অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিবেন যে, উভয়ের মধ্যে তফাৎ আছে কিনা। খোদার কসম, আপনি দেখিবেন যে, পূর্বের অবস্থা যারপরনাই মলিন এবং এখন এক প্রকার সুস্থতা ও আন্তরিক প্রফুল্লতা অর্জিত হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেই আমি বলিয়াছিলাম যে, আত্মিক রুচি শুদ্ধ হইলে তাহা দ্বারা আত্মার রোগ নির্ণয় করা যায়। কাজেই আত্মিক রুচি শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টিত হউন যাহাতে রোগকে রোগ বলিয়া ধরা যায়। এর পর চিকিৎসার প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। সামান্য সর্দি হইলেই উহার জন্য কত ঔষধ পত্র যোগাড় করা হয়। পরিতাপের বিষয়, আমরা এত বড় রোগে আক্রান্ত হইতেছি যে, আমাদের রূহ্ বা আত্মা উহাতে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমরা উহার জন্য মোটেই চিন্তিত নহি।

কোরআন আমাদিগকে ইহার চিকিৎসা বলিয়া দিয়াছে এবং ইহার ক্ষতি সম্বন্ধেও অবহিত করিয়াছে। কাজেই কোরআন শরীফ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল। উহাতে মাত্র দুইটি বিষয় রহিয়াছে। একটি এল্ম ও অপরটি আমল। يُزَكِّيْ বলিয়া আমলের দিকে এবং يُعَلِّمُ বলিয়া এল্মের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াইল যে, হে শ্রোতৃবৃন্দ! দুইটি বিষয়ই গুরুত্ব দানের যোগ্য—এল্ম ও আমল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই দুইটি বিষয়েই গুরুত্ব দিয়াছেন।

এর পর এল্মের দুইটি স্তর রহিয়াছে। একটি শব্দ ও অপরটি অর্থ। কেননা, কোন কিছু জানিতে হইলে সেখানে কিছু শব্দ ও উহার কিছু অর্থ অবশ্যই থাকে। তাহা উর্দুতে হউক কিংবা আরবীতে, মৌখিক হউক কিংবা পুস্তকের সাহায্যে। কাজেই কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার ধারাবাহিকতা এইরূপ হইয়া থাকে—প্রথমে কতকগুলি শব্দ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর উহারা আপন অর্থ বুঝায়। এর পর উহাদের স্বরূপ উদঘাটিত হয় এবং সর্বশেষে আমল হয়। উদাহরণতঃ, কোন চিকিৎসককে রোগের ব্যবস্থাপত্র জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে কিছু সংখ্যক শব্দ জানা যায়। অতঃপর ঐ শব্দগুলি আপন অর্থ বুঝায়। এর পর শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ হয়। এই সবগুলি ধাপের পর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করা হয়। ধর্মের বেলায়ও এই যুক্তিযুক্ত ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

**ধর্ম খুবই সহজঃ** ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বৈ কিছু নহে যে, তিনি ধর্মকে কোন বিচিত্র আকৃতি দান করেন নাই; বরং আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে যে ধারাবাহিকতা রহিয়াছে, ধর্মের মধ্যেও তাহাই রাখিয়াছেন, যাহাতে ধর্মকর্ম সহজ হয়। অথচ ধর্ম এমনি বিষয় যে, ইহার রীতিনীতি অদ্ভুত এবং কষ্ট সাধ্য হইলেও তাহা লাভ করা উচিত ছিল। কেননা, ইহা লাভ করিলে আমাদের উপকার হইবে, খোদার নহে। ইহা লাভ না করিলে আমাদেরই ক্ষতি। উদাহরণতঃ, কোন চিকিৎসক তিক্ত ঔষধ লিখিয়া দিলে, তাহা পান করার উপকার রোগীই পাইবে এবং পান না করার অপকারও তাহারই ঘাড়ে চাপিবে। খোদা তা'আলা এই বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেনঃ

مَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

"যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা কাফের হইয়া যাউক।"

কোরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমাদের ঈমানে আমার কোন উপকার নাই এবং তোমাদের কুফরীতে আমার কোন ক্ষতিও নাই। যেমন, কোন চিকিৎসক বলে, তুমি

ঔষধ পান করিলে আমার কি উপকার এবং পান না করিলে আমার কি ক্ষতি? তবে চিকিৎসক তো এক দিক দিয়া লাভবান হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কোন লাভই নাই। কেননা, আল্লাহ্‌র পক্ষে অন্যের নিকট হইতে পূর্ণত্ব লাভ অসম্ভব। প্রত্যেক বস্তু অস্তিত্ব লাভের জন্য তাঁহার দিকে মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি কোন ব্যাপারেই কাহারও দিকে মুখাপেক্ষী নহেন। বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সূর্য আতরখানা ও গোবরের স্তূপ সকলকেই আলোকোদ্ভাসিত করে; কিন্তু তাহার গায়ে আতরখানার সুগন্ধিও লাগে না এবং গোবরের স্তূপের দুর্গন্ধও পৌঁছিতে পারে না। তাই মাওলানা বলেনঃ

مابـری از پاك و ناپـاكی همه ـ و ز گراں جانی و چالاكی همه

অর্থাৎ, "আমি এতই পবিত্র যে, পবিত্র হইতেও পবিত্র।" পবিত্র হইতে পবিত্র হওয়ার অর্থ এই যে, তুমি যাহাকে পবিত্র মনে কর, আমি উহা হইতেও পবিত্র। কেননা, মানুষ যতই পবিত্রতা বর্ণনা করুক, কিন্তু খোদা তা'আলার বাস্তব পবিত্রতার ধারে কাছে পৌঁছাও অসম্ভব।

হুযূর (দঃ) বলেনঃ

لَاأُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

"হে খোদা, তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি তোমার বর্ণিত প্রশংসা অনুযায়ীই প্রশংসিত।" বাস্তবিকই তাঁহার যত বড় প্রশংসা ও পবিত্রতাই বর্ণনা করা হউক, তাঁহার বাস্তব পবিত্রতার সম্মুখে উহা কিছুই নহে। মাওলানা ইহার উদাহরণ বর্ণনা করিয়া বলেনঃ

شاه را گویـد کسے جولاه نیـسـت ـ این نه مدح ست او مگر آگاه نیست

অর্থাৎ, কেহ যদি বাদশার তা'রীফ করিয়া বলে, আপনি এত বড় মহান ব্যক্তি যে, জোলা (তাঁতি) নহেন, তবে ইহাকে কেহ প্রশংসা বলিবে কি? কখনই নহে। ঠিক তেমনি আমাদের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী আমাদেরই উপকারার্থে শরীঅতে তাস্‌বীহ (খোদার পবিত্রতা) বর্ণনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মাওলানা বলেনঃ

من نگـردم پاك از تسـبيـح شاں ـ پاك هم ايشـاں شونـد دور فشاں

অর্থাৎ, (খোদা বলেন,) মানুষের পবিত্রতা বর্ণনা করার ফলে আমি পবিত্র হই নাই; বরং ইহাতে তাহারাই পবিত্র হইয়াছে। মোটকথা, খোদা তা'আলার কোন উপকার বা ক্ষতি হয় না। হাদীসে বলা হইয়াছে—সমস্ত দুনিয়া অনুগত হইয়া গেলেও খোদার রাজত্ব মাছির পাখার সমানও বৃদ্ধি পায় না। দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের অবস্থা ইহার বিপরীত। তাহাদের প্রজা যত বেশী অনুগত হয়, রাজত্ব তত দৃঢ় হয়। প্রজা অনুগত না হইলে রাজত্ব দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, দুনিয়ার বাদশাহ্ প্রজারা বানায়; কিন্তু খোদা তা'আলা স্বয়ং কামেল। এমতাবস্থায় প্রজাদেরই লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করা উচিত। তাহাদের এবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন লাভ হয় না।

মোটকথা, পরোক্ষভাবে হইলেও চিকিৎসক লাভবান হইতে পারে, তা সত্ত্বেও তাহার আপন ইচ্ছামত ব্যবস্থাপত্র লিখার অধিকার আছে। এমতাবস্থায় ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করার অধিকার খোদা তা'আলার আরও বেশী আছে। কেননা, তিনি একচ্ছত্র শাসনকর্তা, অথচ ইহাতে আমাদেরই উপকার নিহিত। কিন্তু তিনি মেহেরবানী করিয়া সহজ ও সরল ধর্ম অনুসরণ করিতে দিয়াছেন। কিন্তু আফসোস, মানুষ তবুও এই ধর্মের উপর আমল করার ব্যাপারে গা বাঁচাইয়া চলে। আহ্‌কাম

www.almodina.com

আরও সহজতর করিয়া দেওয়ার জন্য আলেমদিগকে অনুরোধ করা হয়। তাহারা মনে করে যে, শরীঅত পরিবর্তন করার কাজটি আলেমদের হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

এ প্রসঙ্গে জনৈকা বৃদ্ধার ঘটনা মনে পড়িল। বৃদ্ধা হজ্ব করিতে যাইয়া ছাফামারওয়া পাহাড়ে সাঈ (দ্রুত যাতায়াত) করিতেছিল। দুই তিনবার পরিভ্রমণের পর সে মোআল্লেমকে বলিল, আমি আর পারিতেছি না। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাকে মাফ করিয়া দাও। বৃদ্ধার যেমন বিশ্বাস ছিল যে, মোআল্লেম মাফ করিয়া দিলেই মাফ হইয়া যাইবে; তদ্রূপ ইহারাও মনে করে।

জনৈক বড় নওয়াব সাহেব একজন বড় অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন তিনি খুবই দুর্বল দেখাইতেছিলেন। অফিসার বলিলেন, আপনি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন কেন? নওয়াব সাহেব বলিলেন, আজকাল রমযান মাস চলিতেছে। রোযা রাখার কারণেই আমার এই অবস্থা। অফিসার বলিল, আপনারা এক কাজ করিতে পারেন। আপনাদের পাদ্রীদের সভা করাইয়া তাহাদের দ্বারা রোযা ফেব্রুয়ারী মাসে লইয়া যান। তিনি বলিলেন, সাহেব, এই ধরনের ক্ষমতা আপনাদের পাদ্রীদের থাকিতে পারে, আমাদের আলেমদের কমিটির এরূপ কোন ক্ষমতা নাই।

পূর্বে বিজাতী লোকগণ ধর্মকর্ম সহজ করার দরখাস্ত করিত; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানগণও এই দরখাস্ত করিতে শুরু করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মানুষ এখন দরখাস্তের সীমা ডিঙ্গাইয়া "অবশ্যই এরূপ করা দরকার" বলিয়া অভিমত পেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমি একবার লাহোর পৌঁছিলে জাতির হিতাকাঙ্ক্ষীরা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই সুযোগে সুদের ব্যাপারে আলোচনা হইয়া যাওয়া উচিত। তাহাদের আগ্রহ অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হইল। সভায় কেবলমাত্র আলেমগণই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল যে, দেখা যাক কি প্রস্তাব পাশ হয়। অথচ সেখানে তের শত বৎসর পূর্বের প্রস্তাব ছাড়া আর কি পাশ হইতে পারিত? কেননা, আজকালকার যুবক শ্রেণী ধর্মীয় ব্যাপারে দুঃসাহসিক হস্তক্ষেপ করিতে চায়, আলেমদের মধ্যে কে এরূপ সাহস করিতে পারেন?

এক ব্যক্তি একটি মাসিক পত্রিকায় حَرَّمَ الرِّبٰوا 'আল্লাহ্ তা'আলা সুদ হারাম করিয়াছেন' আয়াতে পরিবর্তন করত মত প্রকাশ করিল যে, رِبٰوا শব্দটির প্রথম অক্ষরে পেশ দিয়া رُبٰوا পড়িতে হইবে। ইহার অর্থ লাফ দেওয়া। আমি বলি, প্রবন্ধকার যদি رِبٰوا শব্দটিকে رُبٰوا না বলিয়া زنا বলিয়া দিত, তবে আরও সহজ হইত। কেননা, زنا কমপক্ষে আরবী শব্দ; رُبا আরবী শব্দ নহে; বরং ইহা ربودن ধাতু হইতে উদ্ভূত একটি ফারসী শব্দ। তাহাও আবার লিখার মধ্যে 'ওয়াও' আসে না; বরং رُبَا লিখিত হয়।

এই বিষয়টির একটি উদাহরণ শুনুন। এক ব্যক্তি তাহার মাকে কানাকড়িও দিত না। মা জনৈক আলেমের খেদমতে পৌঁছিয়া ইহার অভিযোগ করিলে তিনি পুত্রকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্র বলিল, কোরআন শরীফে যদি মার কোন হক থাকে, তবে আমি অবশ্যই দিব। লোকটি ছিল নিরেট মূর্খ। তাই আলেম সাহেব ভাবিতে লাগিলেন যে, কি উপায়ে কোরআনের নির্দেশ তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়? অবশেষে বলিলেন, মিয়া, তুমি কোরআন শরীফ কিছু পড়িয়াছ কি? সে বলিল, দুই চারিটি সূরা পড়িয়াছি বৈ কি। আলেম সাহেব বলিলেন, تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ এই সূরাটিও পড়িয়াছ? উত্তর করিল, হাঁ, পড়িয়াছি। এর পর সে সূরাটি পড়িতে পড়িতে مَاكَسَبَ পর্যন্ত পৌঁছিলে আলেম ছাহেব বলিলেন, দেখ, এইখানেই

লিখিয়াছে ماں کاسب অর্থাৎ, মারই সবকিছু। অতএব, তোমার কিছুই নাই। এই কথা শুনিয়া পুত্র অনুনয় করিয়া বলিল, মৌলবী সাহেব, রক্ষা করুন। এখন হইতে মাকে রীতিমতই দিব। এখানে একটি স্থিরীকৃত মাসআলা গন্ডমূর্খ ব্যক্তিকে বুঝাবার জন্য আলেম সাহেব একটি উর্দু বাক্যকে ব্যঙ্গচ্ছলে কোরআনের অংশ বলিয়াছেন। কিন্তু উপরোক্ত প্রবন্ধকার কোরআন শরীফে স্পষ্ট পরিবর্তন সাধন করিয়া হারাম সুদ হালাল করার উদ্দেশ্যে অপচেষ্টায় মাতিয়াছে।

**কোরআনে পরিবর্তন সাধনের অপচেষ্টা ঃ**মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোরআন ও শরীঅতের আহ্‌কাম সম্বন্ধে নূতন অভিমত ও চিন্তাধারা পোষণ করে। কোরআন যেন শিশুদের খেলার পুতুল আর কি! هرکه آمد عمارت نو ساخت "যেই আসে সেই নূতন প্রাসাদ গড়ে।"

আজকালকার ইছলাহ্ তথা সংস্কারের একটি উদাহরণ দিতেছি। একবার বাদশাহ্‌র একটি বাজ পাখী জনৈক বৃদ্ধার হাতে পড়িয়া যায়। বাজ পাখীর নখ লম্বা ও চঞ্চু বক্র দেখিয়া বৃদ্ধার খুব দুঃখ হইল। সে পাখীটিকে বলিল, কেমন নির্দয় ব্যক্তির হাতে বন্দী হইয়াছিলে যে তোর নখেরও খবর লয় নাই এবং চঞ্চুটিও ঠিক করিয়া দেয় নাই? আহা খাওয়া দাওয়া ও চলাফিরায় তোর কতই না কষ্ট হইয়াছে! এই বলিয়া বৃদ্ধা তাহার নখ ও চঞ্চু কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিল। এই বৃদ্ধা যেরূপ বাজ পাখীর ইছলাহ্ করিয়াছে, তদ্রূপ তাহারাও কোরআন শরীফের ইছলাহ্ করে।

উপরোক্ত আলোচনা সভা শেষ হইলে এবং প্রবন্ধকারের প্রবন্ধও জনসমক্ষে প্রকাশিত হইলে সকলেই দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিল, আফসোস্! আলেমদের এখনও হুশ আসে নাই। সুদ হালাল হওয়ার এত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এখনও তাঁহারা ইহাকে হারামই বলিতেছে। আমি এক বিবৃতির মাধ্যমে তাহাদিগকে বলিলাম ঃ হে যালেমরা! যদি তোমরা পরিণাম খারাপ করিতেই চাও, তবে সুদ হালাল বলিয়া চিরতরে ধ্বংস হইয়া যাইও না। তোমাদের আবিষ্কৃত প্রয়োজনাদি এইভাবেও মিটিতে পারে যে, তোমরা সুদকে হারাম মনে করিয়াও ইহাতে লিপ্ত থাক এবং অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। আমি আরও বলিলাম, যদি সারা দুনিয়ার আলেমগণ একমত হইয়া সুদকে হালাল বলে, তবুও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহারা ইহাকে হারাম মনে করে, তাহারা তখনও ইহাকে হালাল মনে করিবে না। তবে তাহারা আলেমদিগকে অবশ্যই এই বলিয়া গালি দিবে যে, ইহারা লেখাপড়া শিখিয়া এবং জানিয়া বুঝিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। খোদা তা'আলা এই ধর্মের হেফাযতকারী। কাজেই কোন বিশেষ দল কর্তৃক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এই ধর্ম পরিবর্তিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যদি এই ধর্মে বিপ্লবের কল্পনা করা যায়, তবে উহার জন্য উপযুক্ত সময় ছিল হযরত (দঃ)-এর ওফাতের সময়। হুযূর (দঃ)-এর ওফাতের সময়ই যখন বিপ্লব সংঘটিত হইল না, তখন কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন ভয় নাই। এখন ইহার পরিবর্তিত হওয়ার কোনরূপ আশংকাই নাই। এমতাবস্থায় কোন মৌলবীও যদি পরিবর্তন করিতে চায়, তবে তাহার পরিণামও আধুনিক কালের অন্যান্য পরিবর্তন-কারীদের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ও মানুষের নিকট মরদূদ (রহমত হইতে বিতাড়িত) হইবে ঃ

ازیں سو رانده و ازاں سو مانده 'অর্থাৎ, এদিক হইতে বঞ্চিত ওদিক হইতে লাঞ্ছিত।'

نہ خدا ہی ملا نہ ربواہی ملا ـ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

"খোদাও পায় নাই এবং সুদও মিলে নাই। কাজেই তাহারা না এদিকের হইল, না ওদিকের।"

মোটকথা, কোরআন শরীফে নানা প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। আজকাল প্রত্যেকে নিজকে ধর্মের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানী মনে করে। অথচ আমাদের যুবক ভাইগণ যে সকল উন্নতিশীল জাতির অনুকরণ করে, তাহাদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, প্রত্যেকেই প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না। এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য বিষয় অন্যের অনুসরণ না করিয়া পারে না।

মনে করুন, জনৈক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক একটি ঘরে অবস্থান করে। একজন ইঞ্জিনিয়ার আসিয়া তাহাকে বলিল, দুই ঘন্টার মধ্যে এই ঘরটি মাটিতে পড়িয়া যাইবে। এমতাবস্থায় বৈজ্ঞানিক তৎক্ষণাৎ তাহার কথায় ঘর খালি করিয়া দিবে এবং একজন বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ারের অনুসরণ করিবে। এই অনুসরণে সে মোটেই লজ্জাবোধ করিবে না। ইহা যখন স্বীকৃত, তখন অবশ্যই এইরূপ আমল করা উচিত। কেননা, ইহা আপনাদেরই নেতৃবৃন্দের সুচিন্তিত অভিমত।

মোটকথা, হয় গভীর জ্ঞানী হইয়া যান এবং ইহার আসবাবপত্র যোগাড় করুন। মূর্খতা দূর করুন এবং বিদ্যা শিক্ষা করুন। যতসব অনিষ্ট অল্প বিদ্যার কারণেই। আর না হয় অন্যের অনুসরণ করুন, অর্থাৎ, যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের কথা বুঝুন এবং তদনুযায়ী আমল করুন। ধর্মকে সহজ করার উদ্দেশ্যে নিজের অভিমত কাজে লাগাইবেন না। ধর্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সহজ।

**এল্‌ম ও আমলের অভাবঃ** আলোচ্য আয়াতে ইছলাহ্‌র ধারাবাহিকতা খুবই সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ রাখা হইয়াছে, প্রথমে এল্‌ম ও পরে আমলের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আয়াতে এই দুইটি বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এল্‌মের দুইটি শাখা রহিয়াছে। এই কারণে এই আয়াত তিনটি বিষয় বুঝাইতেছে। প্রথম শব্দ, দ্বিতীয় অর্থ এবং তৃতীয় আমল। এই তিনটি বিষয়ই অর্জন করা আমাদের জন্য জরুরী।

এখন লক্ষ্য করুন যে, আমরা এই তিনটি বিষয়ের সহিত কি ব্যবহার করিয়াছি। আমল আমাদের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। এল্‌ম যেভাবে শিক্ষা করা উচিত, তাহা নাই। ফলে বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে এল্‌মও নাই। তবুও দুনিয়ার জন্য হইলেও ইহার অল্পবিস্তর চর্চা আছে। যাহাদের সম্মুখে স্বরূপ উদঘাটিত হইয়াছে তাহারা আমলের প্রতিও কমবেশী মনোযোগী। কিন্তু এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি এমনও আছে যে, সকলেই উহাকে ত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। অর্থাৎ, কোরআনের শব্দের খেদমত। অথচ ইহা এল্‌মের দুইটি শাখার মধ্যে একটি। আজ-কালকার জ্ঞানিগণ এই বিষয় ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছেন যে, কোরআন পাঠ করার কোন প্রয়োজন নাই। ফলে তাঁহারা ছেলেদিগকে কোরআন পড়ায় না এবং ইহাকে অনর্থক সময় নষ্ট করা মনে করেন। আমি বলি, তেলাওয়াত অনর্থক কাজ হইলে কোরআনে ইহার যে নির্দেশ ও ফযীলত এবং তেলাওয়াতকারীর প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে, উহা কি অনর্থক কাজের জন্যই? যেমন এক জায়গায় বলা হইয়াছেঃ

اُتْلُ مَآاُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط

"আপনার নিকট কিতাবরূপে যে ওহী পাঠান হইয়াছে, তাহা তেলাওয়াত করুন এবং নামায কায়েম করুন।"

يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ "তাহারা রাত্রি বেলায় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে।" জিজ্ঞাসা করি, কোরআনের এই অংশগুলি কি শুধু দেখার জন্য, আমল করার জন্য নয়? এই অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আমরা কি কিতাবধারী হওয়ার অধিকারী থাকি?

বন্ধুগণ, এক ব্যক্তির কাছে অগাধ মালদৌলত আছে, কিন্তু সে উহা এমন স্থানে রাখিয়া দিয়াছে যে, উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহাকে কি বলা হইবে? কোরআন তেলাওয়াত বাদ দিলে এই ব্যক্তি যে ধরনের মালদার, আপনিও সেই ধরনের কিতাবধারী হইবেন। পরিতাপের বিষয়, আপনি একটি বিরাট দৌলত ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, অথচ আপনি মোটেই চিন্তিত নহেন। ধর্মের দিক দিয়া দেখিলে স্বয়ং কোরআনেই তেলাওয়াতের নির্দেশ রহিয়াছে। যদি কেউ কোরআনে না পায়, তবে আমি যুক্তির দিক দিয়াই জিজ্ঞাসা করি—ধর্মীয় শিক্ষা দুনিয়াতে বাকী থাকা জরুরী নয় কি? নিশ্চিতই ইহার উত্তর হইবে যে, জরুরী। জরুরী হইলে ধর্মীয় শিক্ষার উৎস হইতেছে কোরআন। সুতরাং কোরআনের বাকী থাকাও জরুরী হইবে। নতুবা শব্দ ব্যতীত এলম বাকী থাকার কোন উপায় নাই। যদি বলেন, এল্‌ম বাকী থাকার জন্য আরবীর প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমি বলিব যে, অনুবাদ দ্বারা কখনও পূর্ণ উদ্দেশ্য হাছিল হইতে পারে না। কেননা, কিছু সংখ্যক দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রত্যেক ভাষায় থাকে। উহাদের তফসীরও বিভিন্ন হয়। এমতাবস্থায় শব্দ বাদ দিলে উহার অবস্থা আজকালকার তওরীত ও ইঞ্জিলের ন্যায় হইতে বাধ্য। আজকাল সত্যান্বেষী ব্যক্তি তওরীত ও ইঞ্জিলের আসল আহ্‌কাম জানিতেই পারে না। অতএব, বুঝা গেল যে, শব্দ বাকী থাকা নেহায়েত জরুরী। যদি বলেন, ইহার জন্য পাঠ করার কি প্রয়োজন? তবে শুনুন, পাঠ না করিলে কোরআন লিখা, ছাপা, বিক্রয় ইত্যাদিও বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে কোথাও কোরআন পাওয়া যাইবে না। এই কথাটি এখন আপনি হাল্‌কা মনে করিতে পারেন, কিন্তু শতাব্দী পর আপনি প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবেন। কোরআন যদি পাওয়া যায়; তথাপি শুদ্ধভাবে লিখা ও শুদ্ধ অশুদ্ধ জানা একমাত্র তেলাওয়াত ও হেফ্‌যের সাহায্যেই সম্ভব। বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষার যে দুর্গতি, তাহা কাহারও অজানা নহে। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতও সম্পূর্ণ বাদ দিলে মানুষের মস্তিষ্ক হইতে কোরআন একেবারে মুছিয়া যাইবে এবং কোন শব্দ কিংবা আয়াত সম্বন্ধে দ্বিমত দেখা দিলে ফয়সালা কে করিবে? আমার মতে ধর্মীয় শিক্ষা বাকী থাকার পরও তেলাওয়াত ত্যাগ করিলে কোরআন মজীদের বিশুদ্ধতা কায়েম থাকিবে না।

আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়ে। একবার আমি নামাযে কোরআন শরীফ শুনাইতেছিলাম। শ্রোতা ছিলেন শ্রদ্ধেয় ওয়ালেদ (পিতা) মরহুম। ঐ সময় আমি আরবী ব্যাকরণের ছোট ছোট কিতাবাদি পড়িতাম।

আমি فَيَوْمَئِذٍ لَّايُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ আয়াতে পৌঁছিলে يُعَذِّبُ শব্দের যালকে যবরের সহিত পড়িলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে, عَذَابَهٗ শব্দের সর্বনাম (ضمير) -এর مرجع (লক্ষ্য) হইবে اِنْسَانْ - نَائِبِ فَاعِلْ শব্দটি। ইহা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত আছে। يعذب শব্দের যালকে كسرة (যের) দেওয়ার কোন ব্যাকরণগত কারণ আমার বোধগম্য হইল না। ওয়ালেদ সাহেব আমার তেলাওয়াতে লোক্‌মা দিলেন। কিন্তু আমি পূর্বের ন্যায়ই আবার পড়িলাম। তিনি আবার লোক্‌মা দিলেন। আমিও আবার তাহাই পড়িলাম। ওয়ালেদ সাহেব তৃতীয়বার লোক্‌মা দিলে আমি যালকে যের দিয়া পড়িলাম। কিন্তু মনে মনে এই ধারণায়ই অটল রহিলাম যে, ওয়ালেদ সাহেবের লোক্‌মা দেওয়া ঠিক হয় নাই। সালাম ফিরানোর পর ওয়ালেদ সাহেব

বলিলেনঃ তুমি يُعَذِّبُ শব্দে যবর দিয়া পড়ার উপর এত জোর দিলে কেন? আমি বলিলাম, يُعْذَبُ পড়িলে আয়াতের অর্থ ঠিক হয় না। কাজেই ইহা শুদ্ধ নহে। এর পর কোরআন খোলা হইলে দেখা গেল যে, উহাতে يُعَذِّبُ ই লিখিত আছে। আমার সন্দেহ ইহাতেও ঘুচিল না। অন্য কোরআন দেখা হইল। কিন্তু সবগুলিতেই يُعَذِّبُ ছিল। অবশেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিলাম।

উদাহরণতঃ, নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করিলাম। নতুবা এই ধরনের আরও বহু ভ্রম হইয়া থাকে। কোরআন হেফ্য করার বদৌলতে এই সব ভ্রম সংশোধিত হইয়া যায়। হাফেয বাকী না থাকিলে আলেমগণ থাকিলে কোরআনের পরিবর্তন অসম্ভব নহে; অতএব, আজকাল আমরা যে শুদ্ধ কোরআন দেখিতে পাই, তাহা হাফেযদের বদৌলতেই। এখন কোরআন হেফয করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবেন কি? আমি আরও অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই যে, যদি কোরআনের হেফ্য বন্ধ হইয়া যায় এবং পড়া ও পড়ানোও বাদ দেওয়া হয়, তবে বিশুদ্ধ কোরআন পাওয়া গেলেও তাহা বিশুদ্ধরূপে পাঠ করা সম্ভব হইবে না।

এই দাবীর সমর্থনের একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। একবার ভাই সাহেব রেলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি টাইপে মুদ্রিত তফসীর ছিল। জনৈক ইংরেজ বাহাদুরও ঐ কম্পার্টমেন্টে ছিলেন। তিনি ভাই সাহেবের হাতে কিতাব দেখিয়া বলিলেন, আমি ইহা দেখিতে পারি কি? ভাই সাহেব বলিলেন, হাঁ, স্বচ্ছন্দে পারেন। ভদ্রলোক তফসীর খুলিতেই সর্বপ্রথম الٓرٰ দৃষ্টি গোচর হইল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন না, তখন ভাই সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি آلو (আলু)? ভাই সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে তফসীর লইয়া বলিলেন, ইহা আপনার পড়ার পুস্তক নহে।

বলাবাহুল্য, আপনাদের প্রস্তাব অনুযায়ী হেফ্য বন্ধ করিয়া দিলে আপনাদেরকেও এইরূপ কুদিন দেখিতে হইবে। আপনারা এই ইংরেজের ন্যায় الٓرٰ কে آلو পড়িতে থাকিবেন। খোদার কসম, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট না পড়া পর্যন্ত الٓرٰ অথবা এই ধরনের অন্যান্য শব্দ শুদ্ধ করিয়া পড়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে যে, 'আলিফ' লাম ও রা-কে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিতে হইবে? যদি বলেন, ইহা শুদ্ধ করিয়া পড়ার প্রয়োজন নাই, তবে বলিব যে, যাহারা ধৃষ্টতায় এতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে তাহাদের সহিত কোন কথা নাই।

**কোরআন হেফ্য করার আবশ্যকতাঃ** হেফ্য জরুরী হওয়ার পক্ষে আমি আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। আজকালকার রুচি অনুযায়ী এই প্রমাণটি খুবই বিচিত্র মনে হইবে। প্রথমে ইহার জন্য দুইটি ভূমিকা শুনুন।

প্রথম ভূমিকা এই যে, সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে একটি কিতাবও এমন নাই যে, উহা মুখস্থ হওয়ার পর চিরকালই মুখস্থ থাকে। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছাড়া কেহ উহা মুখস্থও করিতে পারে না। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা খুব দ্রুত মুখস্থ হইয়া যায়। খুব কচি বয়সেই ছেলেরা উহা মুখস্থ করিয়া ফেলে।

পানিপথ নামে একটি ছোট শহর আছে। সেখানে দশ বৎসরের বালক হেফ্য না করিলে বলা হয় যে, তুমি কি বুড়া হইয়া হেফ্য করিবে? সেখানকার অধিকাংশ বালিকাও হাফেয এবং অনেক বালিকা সাত কেরাআতও জানে। এছাড়াও কোরআন হেফ্য করার এমন এমন ঘটনা প্রচলিত আছে, যাহা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

www.almodina.com

বর্ধমান নিবাসী আমার জনৈক বন্ধু মাত্র তিন মাসের মধ্যে সারা কোরআন মুখস্থ করিয়া ফেলেন। অপর একজন বন্ধু আপন পীর অর্থাৎ, আমার উস্তাদকে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তাহাকে বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিয়াছেন। ফলে তাহার বুকে একটি নূর প্রবেশ করিয়াছে। জনৈক তাবীর (ফলাফল) বর্ণনাকারীকে এই স্বপ্নের ফল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, তুমি হাফেয হইবে। এর পর হইতে বন্ধুবর মুখস্থ আরম্ভ করেন এবং ছয় মাসের মধ্যে পুরাপুরি হাফেয হইয়া যান।

আরও একটি ঘটনা মনে পড়িল। মুজাফফর নগরে জনৈক ওয়ায়েয ওয়ায করিতেছিলেন। তিনি ইচ্ছাপূর্বক একখানি আয়াতে আসিয়া থামিয়া যান এবং শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেনঃ এই মজলিসে যাহারা হাফেয আছেন, দাঁড়াইয়া যান। এই আয়াতের অবশিষ্টাংশ আমি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে চাই। এই কথা শুনিয়া বিরাট এক দল দাঁড়াইয়া গেল। ওয়ায়েয বলিলেন, বন্ধুগণ, আয়াতখানি আমার জানা আছে। আমি শুধু দেখাইতে চাহিয়াছি যে, মুসলমানদের এই পূর্ব প্রস্তুতিহীন ও সংক্ষিপ্ত সভায় ধর্মীয় কিতাব মুখস্থকারী এত বেশী সংখ্যক লোক মওজুদ রহিয়াছে। অথচ এই সভায় বিশেষভাবে হাফেযদিগকেই একত্রিত করা হয় নাই। জগতের জন্য কোন জাতি ঢাকঢোল পিটাইয়াও এত বেশী পরিমাণ ধর্মীয় কিতাব মুখস্থকারী দেখাইতে পারিবে কি? মোটকথা, কোরআন মজীদ খুব সহজে মুখস্থ হইয়া যায়। এই পর্যন্ত প্রথম ভূমিকা বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় ভূমিকাটি এই যে, আধুনিক যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বীকার করেন যে, নেচার বা প্রকৃতি যখন যে বস্তুর প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা সৃষ্টি করে। আমি ইহাকে শরীঅতের পরিভাষায় এইরূপে বলিব—খোদা তা'আলা যখন যে বস্তুর প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা সৃষ্টি করেন।

এই দুইটি ভূমিকার পর আমি বলিতে চাই যে, কোরআন শরীফ এত শীঘ্র মুখস্থ হইয়া যাওয়ার যে যোগ্যতা আল্লাহ্ তা'আলা মানবকে দান করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? উপরোক্ত ভূমিকা অনুযায়ী জানা যায় যে, এইরূপ মুখস্থ হওয়ার স্বভাবই প্রয়োজন ছিল। কাজেই বন্ধুগণ, হেফ্‌যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া নিজেদের কল্পিত নেচার বা প্রকৃতিকেই অস্বীকার করিবেন না।

লোকমুখে শুনিয়াছি যে, মুন্‌শী নওয়েল কিশোর (লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ হিন্দু পুস্তক প্রকাশক। সে কোরআন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী কিতাবাদি প্রচুর পরিমাণে ছাপাইয়া প্রকাশ করিত।)-এর প্রকাশনালয়ে একটি পাথরে কোরআন লিখিত ছিল এবং উহা একটি নর্দমায় রাখা হইয়াছিল। মৌলবী হাবিবুর রহমান সাহারানপুরী একবার উহাকে দেখিয়া বলিলেন, মুন্‌শী সাহেব, ইহা আমাদের কাছে যেমন সম্মানিত আপনাদের কাছেও তেমনি পূজনীয়। আমাদের কাছে এই জন্য সম্মানিত যে, ইহা কোরআন শরীফ এবং আপনাদের কাছে এই জন্য পূজনীয় যে, ইহা পাথর। পাথর দ্বারাই আপনারা মূর্তি নির্মাণ করিয়া থাকেন।

আমিও তেমনি বলি, যাহারা রাসূলের অনুসারী, তাহাদের পক্ষে রাসূলের আদেশের কারণে এবং যাহারা প্রকৃতির পূজারী, তাহাদের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মের কারণে কোরআন সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যকীয়। অতএব, হাফেয হওয়া যে জরুরী, তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। আপনি ভীত হইবেন না। কারণ, প্রত্যেকেই হাফেয হইবে, আমি সে কথা বলিব না। তবে হাফেয হওয়া জরুরী—একথা অবশ্যই সকলকেই মানিতে হইবে। আমরা জরুরী মনে করি—মুখে একথা বলাই জরুরী মনে করার নিদর্শন নহে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা অন্তরেও বদ্ধমূল হইতে হইবে। বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়া অন্তরের এই অবস্থা জানা যায়।

www.almodina.com

মনে করুন, মদ্য পান না করিলে কখনও উম্মত্ততা ও অজ্ঞানতা প্রকাশ পাইবে না—যদিও মুখে হাজার বার বলা হয় যে, মদ্য পান করিয়াছি, মদ্য পান করিয়াছি। কিন্তু মদ্য পান করিলে তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে—যদিও তাহা দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়।

অতএব, "জরুরী মনে করি"—শুধু এতটুকু বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট নহে; বরং অন্তর দ্বারা জরুরী মনে করিতে হইবে, যাহার প্রতিক্রিয়াও বাহিরে প্রকাশ পাইবে এবং তদনুযায়ী আমলও হইবে। প্রশ্ন করিতে পারেন যে, আমরাই সবকিছু করিব কেন? জরুরীও আমরাই মনে করিব এবং আমলও আমরাই করিব—এ কেমন কথা? দুনিয়াতে আরও তো বহু লোক রহিয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, কোন বিষয় প্রমাণিত হইলে উহার প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সহই প্রমাণিত হয়। কাজেই জরুরী মনে করাও তখনই বুঝা যাইবে, যখন উহার প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়টিও বুঝা যায় এবং উহা হইতেছে আমল।

উপরোক্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল। হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেবের জনৈক ছাত্র যারপরনাই নির্বোধ ছিল। একবার সে ক্লাসে মাওলানাকে একটি দাবী সম্বলিত প্রশ্ন করিল। মাওলানা বলিয়াছেন, ইহার প্রমাণ দাও। ইহাতে ছাত্র প্রবর বলিল, সব কাজ আমিই করিব—দাবীও আমি করিব এবং দলীলও আমিই দিব—এ কেমন কথা? আমি দাবী করিয়া দিলাম। এখন দলীল আপনি দিন।

লক্ষ্য করুন, এই গল্পটি শুনিয়া কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। কিন্তু কোরআনের হেফ্য জরুরী মনে করার পর আমল করার প্রয়োজন নাই এইরূপ ধারণা পোষণ করার বেলায় কাহারও হাসি পায় না। অথচ উভয়টি এই একই পর্যায়ের বিষয়। বন্ধুগণ, যদি সকলেই একমত হইয়া যায় যে, কোরআন হেফ্য জরুরী মনে করাই যথেষ্ট এবং এরপর কেহই আমল না করে, তবে লক্ষ্য করিয়া দেখুন কাহারা কোরআন হেফ্য করিবে? নাছারা ও ইহুদীরা করিবে কি? বর্তমানে যেরূপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে এবং কালের গতি যেভাবে বদলিয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে ইহাও অসম্ভব নহে। এখনও পরিবর্তন প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই সামলাইয়া উঠা যাইবে। কিন্তু এখন এদিকে মনোযোগ না দিলে পঞ্চাশ বৎসর পর সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা দেখা দিবে। বর্তমানে মুসলমানগণ প্রায় কোরআন পাঠ ছাড়িয়াই দিয়াছে এবং বিজাতিরা বিতর্কের কু-মতলব লইয়া কোরআন পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। এই ধারা অব্যাহত থাকিলে এরূপ হওয়া আশ্চর্য নহে যে, কিছু দিনের মধ্যেই মুসলমানগণ ইসলাম হইতে দূরে এবং অমুসলমানগণ ইসলামের নিকটে আসিয়া পড়িতে পারে।

**দুনিয়ার স্বরূপঃ** খোদা তা'আলা ও তাঁহার ধর্মকে ছাড়িয়া শুধু দুনিয়া উপার্জনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং ধর্মোপার্জনকে দুনিয়া উপার্জনের বাধা মনে করা ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়ার প্রথম ধাপ। বাস্তব অবস্থা এই যে, হালাল দুনিয়া ধর্মের জন্য ছায়াস্বরূপ। কেহ ছায়া ধরিতে চাহিলে আসল বস্তুকে নাগালে আনাই ইহার একমাত্র পন্থা। সেমতে ধর্মকে শক্তভাবে অবলম্বন করিলেই দুনিয়া হাছিল হইতে পারে। পরিতাপের বিষয় আজকাল দর্শন ও রহস্যোদ্ঘাটনের চর্চা খুব উন্নতির পথে; কিন্তু দুনিয়ার রহস্যের প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। শুধু মালদৌলত ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা হয়। অথচ এই দুইটি বিষয় কিরূপে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।

অতএব, ধনদৌলত তো উপকার লাভের জন্য এবং সম্মান অপকার দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে লাভ করা হয়। আমাদের বড় হওয়ার এতটুকু প্রয়োজন, যাহাতে অত্যাচারীদের কবল হইতে নিরাপদ থাকা যায়। সমাজে ভিস্তিওয়ালা, মুচি ইত্যাদি নীচ জাতির লোকদিগকে পারিশ্রমিক ব্যতীত খাটান হয়; কিন্তু যাহারা সম্ভ্রান্ত, তাহাদের দ্বারা এরূপ করান হয় না। কেননা, তাহারা সম্মানী লোক। সম্মান একটি খোদাপ্রদত্ত দুর্গ। যাক, মালদৌলত ও সম্মান উপরোক্ত দুইটি উদ্দেশ্যের জন্যই। অতএব, যে পরিমাণ মাল দ্বারা উপকার লাভ করা যায়, শুধু সেই পরিমাণ মালই অর্জন করা উচিত। দুঃখের বিষয়, এখন মানুষ ধনসম্পদকে একচ্ছত্র মা'বূদ বানাইয়া রাখিয়াছে। ইহা কত বড় দার্শনিক ভ্রম!

বন্ধুগণ, শুধু ধর্মোপার্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা লাভ হইয়া গেলে অন্যান্য উদ্দেশ্য আপনাআপনি লাভ হইয়া যায়। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, যাহারা খোদার কাজে নিযুক্ত, তাহাদের কেহই পেরেশানীতে পতিত নহে। এমন কি আমি ইহাও বলি যে, খোদা-প্রেমিকগণ যেরূপ আরাম ও শান্তিতে আছেন, দুনিয়াদারদের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। ইহা জানিবার পরীক্ষা এই যে, প্রথমে কোন দুনিয়াদারদের নিকট এক মাস অবস্থান করুন। এর পর কোন খোদা-প্রেমিকদের নিকট এক মাস থাকিয়া দেখুন। ইতঃপর উভয়ের অবস্থা তুলনা করিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, দুনিয়াদারের চিন্তার সীমা পরিসীমা নাই; কিন্তু দ্বীনদার ব্যক্তি যাবতীয় পেরেশানী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই পর্যন্ত মালের উদ্দেশ্য বর্ণিত হইল।

মান-সম্মানেও খোদা-প্রেমিকগণ দুনিয়াদারদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। আসল সম্মান বা ইয্‌যত যাহাকে বলা হয়, তাহা খোদা-প্রেমিকগণের ভাগ্যেই রহিয়াছে। ইয্‌যত দুই প্রকার। একটি মৌখিক ও অপরটি আন্তরিক। দুনিয়াদারদিগকে শুধু মুখে ও হাতে পায়ে সম্মান দেখানো হয়। অর্থাৎ, জনসাধারণ বাহ্যতঃ তাহাদের সম্মান করে; কিন্তু অন্তরে তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা রাখে না। পক্ষান্তরে খোদা-প্রেমিকদের সম্মান অন্তরের সহিত করা হয়।

দ্বীনদার ও দুনিয়াদারদের মধ্যে এরচেয়েও বড় একটি পার্থক্য আছে। উহা একটি তমদ্দুন সংক্রান্ত ব্যাপার। এর জন্য দুইটি ভূমিকা প্রয়োজন। প্রথম ভূমিকা এই যে, স্বজাতীয়দের মধ্যে যে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত, সেই প্রকৃত সম্মানিত। দ্বিতীয় ভূমিকা এই যে, একাধিক শ্রেণীর লোকদের সমষ্টিতে ঐ শ্রেণীকে জাতি বলা হইবে, যাহার লোক সংখ্যা বেশী। যেমন, পূর্বেও বলিয়াছি যে, যে স্তূপে গম বেশী হইবে, উহাকে গমের স্তূপ বলা হইবে। তদনুযায়ী এখন জিজ্ঞাসা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য কাহাদের—গরীবদের, না ধনীদের? মুসলমানদের মধ্যে গরীবদের সংখ্যা বেশী—ইহাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব, গরীব সম্প্রদায়কেই মুসলমান জাতি আখ্যা দেওয়া হইবে। এখন দেখিতে হইবে যে, গরীবদের মধ্যে কাহার সম্মান বেশী—দ্বীনদারের, না দুনিয়াদারের? প্রত্যেকেই জানে যে, গরীবদের মধ্যে দ্বীনদার ব্যক্তিই সম্মান বেশী পায়। সেমতে দ্বীনদার ব্যক্তিই—জাতির নিকট সম্মানিত। এই তমদ্দুন সংক্রান্ত আলোচনায় প্রমাণিত হইল যে, ধনদৌলত ও মান-সম্মান দ্বারা যাহা উদ্দেশ্য তাহা খোদা-প্রেমিকগণের মধ্যেই বিদ্যমান।

কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়াকে পূর্ণ উদ্দেশ্য মনে করে না। তাহারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি লাভ করিতে চায় এবং ইহাকে খুব গুণ ও কৃতিত্বের বিষয় মনে করে। এই একত্রিকরণের চেষ্টাকে ঐ ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যে ব্যক্তি সর্বাঙ্গে মহিলাদের পোশাক পরিধান করিয়া মাথায় একটি টুপীও লাগাইয়া লয়। এই ব্যক্তিকে যেই দেখিবে, সেই ইহাকে ভাঁড় মহিলা মনে করিবে।

তদ্রূপ যাহারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, দুনিয়াই তাহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মুসলমানের উভয়টি লাভ করার মধ্যে ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, তাহার উপর দ্বীনের প্রাধান্য থাকে এবং প্রয়োজন মাফিক দুনিয়া লাভ হয়। মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই দ্বীনদার হওয়া জরুরী।

**খেদমতে দ্বীনের গুরুত্বঃ** অবশ্য জীবিকা উপার্জনেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। তজ্জন্য এই কাজেও কিছুসংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকা দরকার এবং কিছুসংখ্যক লোকের কর্তব্য, একমাত্র কওমের খেদমতে নিয়োজিত থাকা। কেননা, সকলেই জীবিকা অর্জনের পিছনে পড়িয়া গেলে ধর্মের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। উদাহরণতঃ শিক্ষা পরিচালনা সকলেই ত্যাগ করিলে সমস্ত চাকুরী-নকরীর দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ কেহই ধর্মের কাজ না করিলে, ধর্মও বন্ধ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ শুধু ধর্মের খেদমতের জন্য একদল লোক থাকা দরকার। তাহারা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। আমি ইহার একটি নযীর পেশ করিতেছি। সরকারী কর্মচারীদের জন্য আইন রহিয়াছে যে, তাহারা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে না। কেহ এরূপ করিলে, তাহাকে হয় চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য করা হয়, না হয় অন্য কাজ ত্যাগ করিতে বলা হয়।

সৈয়দ সাহেবকে দেখুন, দুনিয়াই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। ইহার পিছনে তিনি জীবন ও সমস্ত আরাম আয়েশ উৎসর্গ করিয়া দেন। আমি তো কিছুই নহি। তা সত্ত্বেও অবস্থা এই যে, কোন পুস্তিকা রচনার সময় রাত্রে ঘুম আসে না। পেন্সিল, কাগজ সঙ্গে লইয়া শয়ন করি। কিছু মনে পড়িলেই উঠিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করি। এরূপ ব্যক্তিকে অন্য কাজে ব্যস্ত করার পরিণাম এই দাঁড়াইবে যে, উভয় দিকই নষ্ট হইয়া যাইবে।

জনৈক কবির একটি গল্প প্রচলিত আছে। নামায পড়া অবস্থায় কবিতার একটি চরণ তাহার মস্তিষ্কে উদয় হয়। সে তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিয়া উহা কাগজে লিখিয়া লইল। তাহার এই কাণ্ড যদিও পছন্দনীয় নহে; কিন্তু ইহা দ্বারা জানা যায় যে, কোন কাজের খেয়াল চাপিয়া বসিলে মানুষের কি অবস্থা দাঁড়ায়। অতএব, বুঝা গেল, ধর্মের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করিবে না—এরূপ একদল লোক থাকা নেহায়ৎ জরুরী।

এই দলের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করা অন্যায় যে, তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। তাহারা যদি তোমাদের কাছে কিছু চায়, তবে যা ইচ্ছা তাহাদিগকে বলিতে পার। কিন্তু খোদার শোকর যে, তাহাদের রুচি এরূপ নহে। জনৈক বুযুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি খাওয়া দাওয়া কোথায় করেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমরা খোদার অতিথি। খোদা তিন দিন পর্যন্ত আতিথ্য করেন এবং اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ "খোদার নিকট একদিন এক হাজার বৎসরের সমান।" বন্ধুগণ, খোদার কসম, এখনও খোদার এমন বান্দা জীবিত আছেন যে, তাহাদিগকে কেহ কিছু দিতে চাহিলে তাঁহারা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপঃ

دلا را ے کہ داری دل درو بند ــ دگر چشم از همه عالم فرو بند

"যে মাশুক তোমার আছে, উহাতেই অন্তর আবদ্ধ রাখ। এছাড়া সমস্ত দুনিয়া হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া লও।" তাঁহারা এক সত্তার মধ্যেই এমন মগ্ন রহিয়াছেন যে, অন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপও হয় না। নিমরোয দেশের বাদশাহ্ একবার জনৈক বুযুর্গকে পত্র লিখেন (এই গল্প দ্বারা জানিতে

পারিবেন যে, দাতা দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করে, কিন্তু গ্রহিতা পরিষ্কার না বলিয়া দেয়।) আমি আমার অর্ধেক রাজ্য আপনার অধিকারে সমর্পণ করিতে চাই। উত্তরে বুযুর্গ ব্যক্তি লিখিলেনঃ

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاه باد ـ در دل اگـر بود هوس ملك سنـجـرم
زانگـه که یافتم خبر از ملك نیم شب ـ من ملك نیمـروز بیـك جو نمی خرم

"অন্তরে সাঞ্জারের রাজত্বের লোভ থাকিলে আমার নছীবও যেন সাঞ্জারী পতাকার ন্যায় কাল হইয়া যায়। যে দিন হইতে অর্ধ রাত্রির রাজত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সে দিন হইতে আমি একটি সামান্য যবের পরিবর্তেও নিমরোয রাজ্য ক্রয় করিতে রাযী নহি।"

লক্ষ্য করুন, ঐ দিক হইতে পীড়াপীড়ি আর এদিক হইতে প্রয়োজন নাই বলিয়া শুষ্ক উত্তর। এই উত্তরে মোটেই কৃত্রিমতা ছিল না। থাকিলে মোটেই প্রতিক্রিয়া হইত না। যাক, তাঁহারা যখন আপনার নিকট কিছুই চান না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? সুতরাং তাঁহারা কোথায় খাওয়া দাওয়া করেন, তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? বলিতে পারেন যে, আমার এই উত্তর সন্তোষজনক নহে। কেননা, ইহাতে তাঁহারা কোথা হইতে পানাহার করিবে, তাহা মোটেই জানা গেল না। বন্ধুগণ, প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি এই উত্তর দিয়াছি।

**ধর্মের খাদেমের খেদমতঃ** এবার শুনুন আসল উত্তর কি। এই উত্তরে প্রশ্নকারিগণ অপমানিত হইবেন। এর জন্য প্রথমে আমি একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। বিবাহ করার পর স্ত্রীকে বাড়ীতে আনিয়া যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিবাহ তো করিয়া ফেলিয়াছ, এখন খাওয়া দাওয়া কোথা হইতে করিবে বল? তবে ঐ স্ত্রী স্বামীকে কি উত্তর দিবে? সে ইহাই বলিবে যে, তোমার পকেট হইতেই খাওয়া দাওয়া করিব। সে আরও বলিবেঃ আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা হইল না? ইহাতে তুমি নিজেরই বেইয্‌যতি প্রকাশ করিতেছ। স্ত্রীর এই উত্তর নেহায়ৎ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হইবে।

এই উদাহরণ বর্ণনা করার পর এখন আমি উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ধর্মের খাদেমগণ প্রশ্নকারীদের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া খাইবে। এই প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নকারীরা নিজেদেরই ভেদ খুলিয়া দিতেছে যে, তাহাদের মধ্যে মোটেই দ্বীনি জোশ নাই, তাহারা দ্বীনের খাদেমের খেদমত করার প্রয়োজন মনে করে না। ইহা শরীঅতেরই মাসআলা যে, কেহ অন্যের কাজে আবদ্ধ থাকিলে তাহার ভরণ-পোষণ ঐ ব্যক্তির যিম্মায়ই ওয়াজেব হয়। এই কারণেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব। স্ত্রী স্বেচ্ছায় বাপের বাড়ী চলিয়া গেলে স্বামীর যিম্মায় তাহার ভরণপোষণ ওয়াজিব থাকে না। অথচ তখনও সে স্ত্রীই থাকে। কাজীর ভরণপোষণও এই একই কারণে বায়তুল মাল বা সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া হয়। কেননা, সে জনসাধারণেরই প্রয়োজনীয় কাজে আবদ্ধ থাকে।

বায়তুল মাল কাহাকে বলে, এখন তাহাই বুঝুন। সংক্ষেপে বায়তুল মাল—মুসলমানদের অর্থের সমষ্টি। শব্দান্তরে তাহাদের প্রদত্ত চাঁদাকে বলা হয়। তবে চাঁদা শব্দটি অপমানজনক এবং বায়তুল মাল বা ধনাগার শব্দটি সম্মানজনক। কিন্তু উভয়টির স্বরূপ একই। বাদশাহ্ শাহী ধনাগার হইতে বেতন গ্রহণ করেন। উহাও বায়তুল মাল ছাড়া কিছু নহে। উহাও মুসলমানদের এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া প্রদত্ত অর্থের সমষ্টি। উহা অপমানজনক হইলে বাদশাহ্ উহা হইতে বেতন গ্রহণ করিতেন না। অন্যান্য অফিসারগণও এই একই খাত হইতে বেতন পাইয়া থাকে। কারণ, তাহারা এতদূর আবদ্ধ থাকে যে, অন্য কাজ করিতে গেলেই অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যায়।

www.almodina.com

আরও দেখুন—কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হইলে তাহাকে খাওয়া খরচ দেওয়া হয়। ইহা কম ও বেশী হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বড় লোক হইলে বেশী এবং সাধারণ লোক হইলে কম দেওয়া হয়। এখানেও ঐ একই কারণ নিহিত আছে। অর্থাৎ, সাক্ষ্যদাতা অন্যের কাজে আবদ্ধ থাকে। এই মাসআলাটি এতই জাজ্জল্যমান যে, কাফেরেরাও ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। সুতরাং কওমের খাদেমগণও কওমেরই কাজে নিয়োজিত থাকেন। অতএব, তাহারাও কওমের নিকট হইতে খরচপত্র লইবে। কওম যদি তাহা না দেয়, তবে খোদার নিকট নালিশ করিয়া আদায় করা হইবে। মোটকথা, যুক্তি ও শরীঅতের নির্দেশ উভয় দিক দিয়াই এই মাসআলাটি প্রমাণিত। তবে আমাদের কওমের একটি দোষ আছে। তাহারা অন্য কওমকে কোন কাজ করিতে না দেখা পর্যন্ত সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না। এই কারণে তৃতীয় একটি দলীল বর্ণনা করিতেছি।

আপনারা জানেন, আর্যগণ তাহাদের ধর্মপ্রচারে খুবই তৎপর। তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, একদল লোক কেবল ধর্ম প্রচারেই নিয়োজিত থাকিবে এবং অবশিষ্ট সকলেই তাহাদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিবে। বন্ধুগণ, যে জাতির মধ্যে কখনও ধর্মীয় দলের অস্তিত্ব ছিল না, তাহারা ধর্মীয় দল প্রস্তুত করার জন্য চেষ্টিত হইয়াছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তোমাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই একটি বিরাট ধর্মীয় দল রহিয়াছে; কিন্তু তোমরা তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছ। স্মরণ রাখ, যদি তোমরা তাহাদের ব্যয়ভার বহন না কর, অধিকন্তু সকলেই তাহাদের বিরোধিতা কর এবং সাহায্য সহায়তা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেও, তবুও এই দলটি কায়েম থাকিবে এবং মৌলবীদের খাওয়া-দাওয়া চলিতেই থাকিবে।

প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তাহারা কিরূপে খাইবে, কোথা হইতে খাবার পাইবে? আমি এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি, শুনুন। কোরআন শরীফে এরশাদ হইয়াছেঃ

هَٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَايَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ۝ — سورة محمد آيت ٣٨

আয়াতের মোটামুটি তরজমা এই যে, তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য আহবান করা হইতেছে। কিন্তু তোমাদের কেহ কেহ কৃপণতা করে। ইহাতে সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করিতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা পরম ঐশ্বর্যশালী, আর তোমরা পরমুখাপেক্ষী। যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি পয়দা করিবেন। তাহারা ধর্মের খেদমত করিবে—তোমাদের ন্যায় হইবে না। কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, অন্য জাতি কোথা হইতে সৃষ্ট হইবে? ইহার উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি কাজ প্রত্যহই অব্যাহত গতিতে চালু রহিয়াছে। আরও একটি উত্তর এই যে, বর্তমানে সমগ্র জগতের লোকদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমানরা ইসলামের আহ্কাম ও শিক্ষা হইতে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া পড়িতেছে এবং অমুসলমানগণ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি ক্রমে ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে চলিয়াছে। ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়ের রহস্য ও হেকমত বর্ণনা করার প্রতিও তাহাদের মনোযোগ রহিয়াছে।

www.almodina.com

জনৈক অমুসলিম ডাক্তার মাটির ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা (পার্ক) করা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মাটি অনেক ক্ষতরোগের প্রতিষেধক। প্রস্রাবের মধ্যে যে 'তেযাব' (এক প্রকার এসিড) রহিয়াছে, উহার অপকারিতা রোধ করার পক্ষে মাটির ব্যবহার খুবই উপকারী।

তদ্রূপ অপর একজন অমুসলিম ডাক্তার বলেন, আমি হুযূর (দঃ)-এর এই বাণী শুনিয়াছি—কুকুর কোন পাত্রকে চাটিলে উহা সাতবার ধৌত কর। এই সাতবারের মধ্যে একবার মাটি দ্বারা মাজিয়াও ধৌত কর। এই উক্তি শুনিয়া মনে প্রশ্ন জাগে যে, মাটি দ্বারা মাজিবার কথা বলিলেন কেন? সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করা যথেষ্ট নয় কি? অবশেষে বহু দিন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে, মাটিতে নিশাদলের (ঔষধ বিশেষ) অংশ মিশ্রিত আছে। কুকুরের মুখের লালায় যে বিষ মিশ্রিত থাকে, উহার জন্য নিশাদল অব্যর্থ প্রতিষেধক। এই জিনিসটি সর্বত্রই পাওয়া যায় না। এই কারণে হুযূর (দঃ) এমন একটি বস্তু দ্বারা মাজিতে বলিয়াছেন যাহা সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং অতি সহজেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাটি। লক্ষ্য করুন, মুসলমানদের কি অবস্থা এবং অমুসলমানদের কি অবস্থা।

এগুলি ঐ দিনেরই পূর্বাভাস—সেদিন বিচিত্র নয় যে, মুসলমানগণ ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে এবং উপরোক্ত প্রকার অমুসলমানগণ মুসলমান হইয়া যাইবে। মুসলমানগণ যদি এই কুদিনের মুখ দেখিতে না চান এবং ইসলামের হেফাযতের সৌভাগ্য তাঁহারাই অর্জন করিতে চান, তবে এখনও সামলাইয়া যাওয়া উচিত এবং কাজে লাগিয়া যাওয়া কর্তব্য। মুসলমানদের শস্যশ্যামলা ক্ষেত উজাড় হইতেছে; কিন্তু এখনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সামান্য মনোযোগ দিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। নতুবা বর্তমানের অবস্থা দৃষ্টে আমি গুরুতর আশঙ্কা বোধ করিতেছি।

যাক, বুঝা গেল যে, অদৃশ্যজগৎ হইতেই ধর্মের খাদেমদের খেদমত ও তাহাদের সাহায্য হইবে। যাহার ইচ্ছা হয়, নিজেদের উপকারের জন্য এই সৌভাগ্য অর্জন করিতে অগ্রসর হউক। কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা বিশেষ দলের উপর তাহাদের নির্ভরশীল হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের অবস্থা হইল এই যে, گر نستانی بستم میرسد 'যদি না লও, তবে জোর করিয়া দেওয়া হইবে।' আমি জনসেবামূলক আঞ্জুমান ও মাদ্রাসাসমূহের কর্মকর্তাদিগকে এই অভিমত দিতে চাই যে, তাহারা অন্যের কাছে চাওয়া একেবারে ত্যাগ করুক। যেদিন হইতে তাহারা এইরূপ করিবে, ইনশাআল্লাহ্ খোদা তা'আলা তাহাদিগকে বহু কিছু দান করিবেন। তিনি এরশাদ করেনঃ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ط

"আল্লাহ্ তা'আলা এমন স্থান হইতে রিযিক দিয়া থাকেন, যে স্থান সম্বন্ধে কল্পনাও করা যায় না।"

অতএব, ধর্মের খেদমতের জন্য একটি বিশেষ দল থাকা প্রয়োজন। যেহেতু প্রত্যেকে ধর্মের খাদেম হইতে পারে না, এই হেতু অধিকাংশের এরূপ করা উচিতঃ

چو باز باش که صیدے کنی ولقمه دهی – طفیل خواره مشو چوں کلاغ بے پر و بال

"তুমি বাজ পাখীর ন্যায় হইয়া নিজে শিকার কর এবং অপরকে আহার্য যোগাও। লোম ও পাখাবিহীন পাখীর ছানার ন্যায় পরভোজী হইও না।" অর্থাৎ, তাহারা উপার্জন করিবে এবং অন্যদের সাহায্য করিবে।

www.almodina.com

**খোদা-প্রেমিকগণ অপমানিত নহেনঃ** এই অবস্থা দৃষ্টে কেহ খোদা-প্রেমিকদিগকে পরনির্ভরশীল বলিতে পারে না। কেননা, তাঁহারা সরকারী লোক। দেখুন, গভর্নর জেনারেল বিরাট অঙ্কের টাকা পান। অথচ বাহ্যতঃ তাঁহাকে কোন বিরাট কাজ করিতে হয় না। তবে তাঁহার কাজটি শুধু মস্তিষ্ক চালনাজনিত হওয়ার কারণেই এত বেশী টাকা দেওয়া হয়। খোদা-প্রেমিকগণও যে অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করেন এবং তাহাদিগকে যেরূপ মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, অন্য যে কেহ হইলে কয়েক দিনেই পাগল হইয়া যাইত। খোদাপ্রেমিকগণ অলস অবশ বলিয়া অনেকেই দোষারোপ করে, এই আলোচনায় ইহার অসারতা জানা গেল। তাঁহারা কখনও অলস নহেন, তবে দৈহিক দিক দিয়া তাঁহারা অলস বটেন। কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয়। তাঁহাদের অবস্থা কোরআনের একটি বর্ণনার সম্পূর্ণ অনুকূলে। কোরআন বলেঃ

أُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ○

"তাঁহাদিগকে খোদার রাহে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীতে গমনাগমন করিতে সক্ষম নহেন।" অতএব, এই অক্ষমতাও গৌরবের বস্তু। তাছাড়া তাঁহারা স্বয়ং বলেনঃ

ما اگر قلاش و گر دیوانه ایم ـ مست آں ساقی وآں پیمانه ایم

"আমরা নিঃস্ব ও পাগলপারা হইলে তাহা অন্য কাহারও জন্য নহে। ঐ সাকী (অর্থাৎ আল্লাহ্) ও ঐ পেয়ালার (অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রেমের) জন্যই।"

তাঁহারা পরমুখাপেক্ষী ও তাঁহাদের দেহ বেকার হইলেও তাঁহাদের অন্তর খুব বিরাট কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। যে গুরুভার পাহাড়ও উঠাইতে পারে নাই, যমীন ও আসমান যে বোঝা বহন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহাদের আত্মা সেই বোঝা উঠাইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ○

"যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তবে আপনি অবশ্যই উহাকে খোদার ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইতে দেখিতেন।" অন্যত্র এরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط

"আমি এই আমানতকে (কোরআন) আসমান, যমীন ও পাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। তাহারা সকলেই ইহা বহন করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে এবং তাহারা ইহাতে ভীত হইয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্যন্ত মানুষ এই বোঝা বহন করিয়াছে।" যাহার আত্মা এতবড় গুরুভার উঠাইয়াছে, তাহাকে অলস অবশ কিরূপে বলা যাইতে পারে? কেহ চমৎকার বলিয়াছেঃ

اے ترا خارے بپا نہ شکستہ کے دانی کہ چیست

حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

"যাহার পায়ে কখনও কাঁটা ফুটে নাই, সে ঐ সিংহের অবস্থা কিরূপে বুঝিবে, যে বালা-মুছীবতের তরবারির আঘাত মাথায় লয়?"

www.almodina.com

তাহাদের অবস্থা আপনারা কি জানেন? বন্ধুগণ, তাহারা এরূপ আন্তরিক ব্যথায় ব্যথিত, যাহার একটি নমুনা হইল এইঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لَّايَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

"তাহারা ঈমান আনে না দেখিয়া বোধ হয় আপনি আত্মহত্যা করিতে চান।" লক্ষ্য করুন, কতদূর মনোকষ্টে পতিত দেখিয়া হুযূর (দঃ)-কে এই কথা বলা হইয়াছে!

**কোরআন হেফাযতের দায়িত্বঃ** অতএব, অধিকাংশ লোককেই জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের পক্ষেও দ্বীনদার হওয়া, শরীঅতের নির্দেশ অনুযায়ী চলা এবং ধর্মের হেফাযত করা অত্যন্ত জরুরী। শুধু জরুরী মনে করাই যথেষ্ট নহে।

দেখুন, কোন একটি শরীকানা সম্পত্তিতে একজনের আট আনা অংশ দ্বিতীয় জনের চারি আনা, তৃতীয় জনের দুই আনা এবং চতুর্থ জনের এক আনা অংশ রহিয়াছে। এমতাবস্থায় কোন আলেম ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলে এক আনার অংশীদার ব্যক্তি কি চুপ করিয়া থাকিবে? কখনও নহে। ইহাতে বুঝা যায় যে, শরীকানা জিনিসের হেফাযত প্রত্যেক অংশীদারকেই করিতে হইবে। কোরআন শরীফও মুসলমানদের শরীকানা সম্পত্তি। সে মতে ইহার দেখাশুনাও প্রত্যেককে করিতে হইবে।

যদি শরীকানা হওয়া অস্বীকার করেন, তবে দয়া করিয়া তাহা কাগজে লিখিয়া দিন। আমরা তাহা জনসমীপে প্রকাশ করিব। এর পর কখনও আপনাদিগকে ইহার হেফাযতের জন্য বলিব না, খোদা চাহে তো অন্য কেহও বলিবে না। যদি ইহা পছন্দ না করেন, তবে বুঝা গেল যে, আপনার যিম্মায়ও কোরআনের হেফাযত জরুরী এবং আপনার দ্বারা জবরদস্তি ইহার হেফাযত করানোর অধিকার অন্যেরও রহিয়াছে। তাহারা আপনার নিকট হইতে মাল লউক কিংবা অন্য যে কোন প্রকারে আপনার দ্বারা কোরআনের হেফাযত করাইতে পারে।

আজকাল অনেকেই চায় যে, সর্বপ্রকার আরাম-আয়েশ তাহারা ভোগ করুক এবং যাবতীয় বিপদাপদ ও কষ্ট অন্যের ঘাড়ে চাপিয়া থাকুক। তাহারা যেভাবেই চলুক না কেন, মৌলবী তাহাদের অনুসরণ করুক এবং জাহান্নামগামী পথ হইতে তাহাদিগকে কেশাগ্র পরিমাণও না সরাউক। আমি এরূপ লোকদিগকে বলি, পুরাতন মৌলবী তো তোমাদের কাবু ছাড়া হইয়াই গিয়াছেন—তাঁহারা আর তোমাদের অনুসরণ করিবেন না এবং এখন এরূপ আশা করাও বৃথা। তবে আপন সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দাও। তাহারা তোমাদের নির্দেশ মত চলিবে এবং তাহাদের দ্বারা মনমত কাজ লইতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি আজ পর্যন্ত এরূপ কোন জাতির দরদী ব্যক্তি দেখি নাই, যে সত্যিকার জাতীয় দরদে উদ্বুদ্ধ হইয়া সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেয়। তাহারা মনে করে, আমার ছেলে এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করিলে এই বড় বড় পদ লাভ হইবে কিরূপে? কেহ কোন ছেলেকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মনোনীত করিলেও বাছিয়া বাছিয়া সকলের মধ্যে নির্বোধ ও ভোতা ছেলেকেই মনোনীত করে। সোব্‌হানাল্লাহ্‌, শরীঅতের শিক্ষার প্রতি তিনি কি অসাধারণ সম্মান দেখাইলেন! বন্ধুগণ, যখন বোকারাই এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করে, তখন তাহারা আলেম হওয়ার পরও তো বোকাই থাকিবে।

কেহ মৌলবী মানফাআত আলী সাহেবকে প্রশ্ন করিল, আজকাল আলেমদের মধ্যে রাযী, গায্‌যালী (রঃ) পয়দা হয় না ইহার কারণ কি? উত্তরে মৌলবী সাহেব বলিলেন, তখনকার দিনে

সর্বাপেক্ষা মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছেলেকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নির্বাচন করা হইত; কিন্তু আজকালের রীতি এই যে, বাছিয়া বাছিয়া সর্বাপেক্ষা আহ্মক ও স্থূল-বুদ্ধি ছেলেকেই এই শিক্ষার জন্য মনোনীত করা হয়।

ইহার প্রমাণ এই যে, এখনও যে সব মেধাবী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছেলে এই শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহারা রাযী ও গায্যালীর চেয়ে কম হয় না। আমার সঙ্গে চলিয়া আলেমদের অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, এখনও গায্যালী ও রাযী (রঃ) বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা সকল যুগেই থাকেন, তবে সংখ্যায় অবশ্যই কম থাকেন। ইহার কারণ এই যে, যাহারা যোগ্য ও মেধাবী, তাহারা এই লাইনের দিকে আসে না। নতুবা সত্য বলিতে কি, বিশ জন যোগ্য লোক এল্মে দ্বীন শিক্ষা করিলে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ পনর জন গায্যালী ও রাযীর ন্যায় প্রতিভাবান না হইয়া পারে না। আজকাল দরিদ্র, কাঙ্গাল, জোলা ও ধুনকারের ছেলেরা এই শিক্ষা অর্জন করে। তাহাদের বোধশক্তি যেরূপ আলেমও তদ্রূপ হইবে। গরীব কাঙ্গালদের ছেলেদিগকে এই এল্ম না শিখাইয়াও উপায় নাই। কারণ, ধনীরা নিজেরাই ইহা ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন গরীবদিগকে যদি আমরা পড়িতে না দেই, তবে এই এল্মে দ্বীন কাহাদিগকে পড়াইব? গরীবরাই বা কি করিবে? ইংরেজী পড়ার দুর্মূল্যতার কারণে তাহারা উহা পড়িতে পারিবে না। এমতাবস্থায় আমরা যদি তাহাদিগকে আরবীও না পড়াই, তবে তাহারা একেবারেই যে নিরক্ষর থাকিয়া যাইবে।

**এল্মে দ্বীনের সহজ লভ্যতা ঃ** এল্মে দ্বীন এমনি সহজ বিষয় যে, ইহাতে যেমন পরিশ্রম কম, তেমনি ইহার খরচও অতি নগণ্য। ইংরেজী শিক্ষা এরূপ নহে। এল্মে দ্বীন কিরূপ সস্তা, তাহা লক্ষ্য করুন। যদি কেহ মীযান হইতে শুরু করিয়া শেষ পর্যন্ত পড়িতে চায়, তবে খরিদ করা ছাড়াই সমস্ত কিতাব বিনামূল্যে পাইবে। মাদ্রাসার তরফ হইতে যাবতীয় কিতাব ধার করিয়া লেখাপড়া করিয়াছে—এরূপ লোকের সংখ্যা প্রচুর। অপরপক্ষে আপনি এরূপ কোন ব্যক্তি দেখাইতে পারিবেন না, যে প্রায় সবগুলি পুস্তক ক্রয় না করিয়াই বি, এ পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এল্মে দ্বীন খুব সস্তা এবং দুনিয়ার বিদ্যা যথেষ্ট দুর্মূল্য। এ প্রসঙ্গে আমার ছোট ভাইয়ের একটি উক্তি মনে পড়িয়া গেল।

একবার সে আব্বাজানকে বলিল, আপনি আমার নিকট হইতে খরচের হিসাব লন, অথচ বড় ভাইজানের নিকট কোন হিসাব চান না, ইহার কারণ কি? আমার খরচ তাঁহার খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী। আমার একটি কলম দরকার হইলে তাহাও কমপক্ষে আট আনা দিয়া কিনিতে হইবে। আর তিনি খাট হইতে সামান্য কাঠের টুক্রা বাহির করিয়া কলম বানাইলেও তাহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে কাজ চলিয়া যায়।

দেখুন, এলমে দ্বীন কত সস্তা! ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইহা সম্মানিত! কেননা, প্রকৃতির নিয়ম এই যে, বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু বেশী সস্তা এবং সর্বত্র পাওয়া যায়। কোন জিনিসের প্রয়োজন যত কম হইবে, তাহা ততই দামী এবং দুর্লভ হইবে। ইহা খোদা তা'আলার বিস্ময়কর শক্তির প্রমাণ। ইহাতেই চিন্তা করিয়া দেখুন আরবী শিক্ষার কি মর্যাদা এবং ইংরেজী শিক্ষার কি মর্যাদা। অর্থাৎ, আরবী শিক্ষার প্রতি বেশী মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহার প্রয়োজন বেশী এবং ইংরেজীর কম। যাহারা দ্বীনদার, তাহাদিগকে আরবী শিক্ষার প্রতি কম মনোযোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায়। কিন্তু যাহাদের ধর্ম বরবাদ হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, নিশ্চিতরূপে তাহাদিগকেই ইংরেজী শিক্ষা হইতে বিরত রাখিতে হইবে। তাহারা ইংরেজী শিক্ষা

পুরাপুরি ত্যাগকরত আরবী শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করুক। এই পর্যন্ত ইসলাম কিংবা ধর্মের হেফাযতের জন্য আরবী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইল।

**আরবী শিক্ষার গুরুত্বঃ** আমার শেষ কথা হইল এই যে, তোমরা যদি খোদার জন্য আরবী নাই পড়, তবে কমপক্ষে ইংরেজীর জন্যই আরবী পড়িয়া লও। এই কথাটির ব্যাখ্যা এই যে, আরবী শিক্ষার ফলে যোগ্যতা অনেকাংশে বাড়িয়া যায়। এই যোগ্যতা দ্বারা ইংরেজী শিক্ষায় অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যে মুরাদাবাদ গিয়াছিল। সেখানে তাহার মেধাশক্তি দেখিয়া সকলেই হতবাক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার শিক্ষকও তাহার মেধাশক্তির নিকট হার মানিতে বাধ্য হয়।

একবারের একটি ঘটনা বলিতেছি। রমযান মাস আগত প্রায় ছিল। ট্রেনিং-এর ছাত্ররা একজন হাফেয রাখিয়া তারাবীর নামাযে কোরআন খতম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞাসা করায় জওয়াব পাওয়া গেল যে, এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা এখানে নূতন। কাজেই অনুমতি দেওয়া যায় না। ইহাতে আমার ভাইটি বলিল, পুরাতন নীতি হইলে অনুমতি পাওয়া যাইত কি? উত্তর হইল, হাঁ। সে আবার বলিল, আপনার নিয়মানুযায়ী বুঝা যায় যে, কোন পুরাতন বিষয়ের অস্তিত্বই নাই। কারণ, প্রত্যেক পুরাতন কোন না কোন সময় নূতন ছিল। অথচ নূতন হওয়াই অনুমতির পরিপন্থী। কোন নূতন পন্থার যদি অনুমতি না পাওয়া যায়, তবে ইহা পুরাতন হইবে কিরূপে? এই যুক্তি শুনিয়া প্রিন্সিপাল হতবাক হইয়া গেল। আমার ভাই আরও বলিল, অতএব, বুঝা গেল—পুরাতন হইলেই অনুমতি পাওয়া যাইত, তাহা ঠিক নহে, বরং ইহাতে কোনরূপ অনিষ্টকর বিষয় না থাকার উপরই অনুমতি নির্ভরশীল। তারাবীর নামাযে অনিষ্টের কি আছে! অবশেষে প্রিন্সিপাল বাধ্য হইয়া অনুমতি দিল।

উপরোক্ত যুক্তিতর্ক একমাত্র আরবী শিক্ষার বদৌলতেই সম্ভব হইয়াছিল। কেননা, এই শিক্ষার ফলে বিভিন্ন সম্ভাবনা আবিষ্কার করার যোগ্যতা পয়দা হয়। আমার ভাইটির এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা আছে। এছাড়া আমি আরও অনেক ঘটনা দেখিয়াছি। এইজন্য বলিতেছি যে, খোদার জন্য আরবী না পড়িলেও কমপক্ষে ইংরেজীর খাতিরেই ইহা পড়িয়া লও। এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, এল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার উৎসাহ দেওয়া হইল, তাহা শিক্ষা করিয়া ধর্মের দিক দিয়া লাভ কি? ইহার উত্তর এই যে, এলমে দ্বীন এমন বস্তু যে, এক দিন না এক দিন ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই এবং ঐ ব্যক্তিকে আপন বশে আনিবেই। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ فَاَبَى الْعِلْمُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ —"আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নিয়তে এলমে দ্বীন শিখিয়াছিলাম, কিন্তু ইহা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য নির্দিষ্ট হইতে অস্বীকার করিয়াছে।" আমি বলি, আরবী শিক্ষা দ্বারা যে কোন বিষয়ে আলো লাভ করিতে পারে। ইহা দ্বারা চরিত্র সংশোধিত হয়।

আমি জনৈক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির গল্প বলিতেছি। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, তাহার উপর এল্‌মে দ্বীনের কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে এই প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না। অথচ এইরূপ প্রতিক্রিয়া লাভ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আমার কানপুরে অবস্থানকালে একদিন নিত্যকার অভ্যাসমত ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক নায়েব (তহ্‌শীলদার) উপস্থিত হইল এবং তাহার ছেলের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন আছে বলিয়া জানাইল। আমি উপস্থিত ছাত্রদিগকে আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—যাহাতে আগন্তুক বুঝিতে সক্ষম না হয়।

আমি কথা আরম্ভ করিতেই সে বলিল, জনাব, আরবী ভাষায় কথা বলিতেছেন দেখিয়া মনে হয় এই সময়কার কথাবার্তা আমা হইতে গোপন রাখিতে চান। ঘটনাক্রমে, আমি আরবী জানি। কাজেই আমি এখান হইতে উঠিয়া গেলেই ভাল হইবে। তাহার এই কথায় আমি যারপরনাই লজ্জিত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আল্লাহু আকবার, আমি তাহার সহিত কি ব্যবহার করিলাম, আর সে আমার সহিত কি ব্যবহার করিল! অবশেষে আমি তাহাকে বলিলাম, জনাব, আমি ভুল করিয়াছি। বাস্তবক্ষেত্রে কোন গোপনীয় বিষয় ছিল না। কাজেই এখন আমি উর্দুতেই তাহা বলিতেছি।

এই ঘটনা সম্পর্কে এখন আমি দুইটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এল্‌মে দ্বীন ছাড়াই কাহারও মধ্যে এরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে কি? কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়া লাভ হওয়া জরুরী নয় কি? সকলেই বলিবে নেহায়ৎ জরুরী। কারণ, একে অন্যের গুপ্ত বিষয় অবগত হওয়া কিছুতেই জায়েয নহে। মোটকথা, সভ্যতা, চরিত্র, ইংরেজী শিক্ষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য এল্‌মে দ্বীন লাভ করা অত্যন্ত জরুরী। কাজেই এল্‌মে দ্বীনের তথা কোরআনের হেফাযত করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। কোরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বলা হইল।

**কোরআনের শব্দের গুরুত্বঃ** এখন আরও একটি প্রশ্ন রহিয়া গেল—যাহা অনেকের মুখে শুনা যায়। তাহা এই যে, "শুধু শুধু কোরআনের শব্দ পড়িয়া লাভ কি?" এর এক উত্তর পূর্বেও বলিয়াছি যে, ইহা পাঠ করার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন থাকা অবস্থায় অন্য কোন লাভের দরকার নাই। মনে করুন, কেহ পিপাসার্ত হইলে যদি পানি পান করিতে চায়, আর কেহ বলে যে, পানি পান করিলে কি লাভ? তখন তাহাকে এই কথাই বলিয়া দেওয়া যথেষ্ট যে, নূতন কোন লাভ না হইলেও পানি পান করার প্রয়োজন আছে। যদি বিশেষ কোন উপকার দেখিতেই চান, তবে তাহাও বলিয়া দিতেছি। এই সম্পর্কে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, উপকার বলিতে কি বুঝায়? আজকাল পাঠ করার উপকার একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। এর ফলেই যতসব বিভ্রান্তির জন্ম। অনেকেই বলে—যখন বুঝাই গেল না, তখন তোতার ন্যায় আবৃত্তি করিয়া লাভ কি? ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা অর্থ বুঝাকেই পাঠ করার উপকার মনে করে। অথচ ইহাই আপত্তির বিষয়।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এক ব্যক্তি তহ্‌শীলদারীর পরীক্ষা দিতে চায় এবং উহাতে আইন করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অমুক পুস্তকটি পড়িয়া শুনাইতে পারিবে, সে পরীক্ষায় পাশ করিবে—যদিও উহার বিন্দুবিসর্গ না বুঝে। বাস্তবে এরূপ আইন হইলে ইহার পরও আপনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই পুস্তকটি না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে কি লাভ? কখনই এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব, বুঝা গেল যে, শুধু বুঝার মধ্যেই উপকার সীমাবদ্ধ নহে; বরং এছাড়া আরও উপকার আছে। কোরআন শরীফ পাঠ করার মধ্যে যদি বুঝা ছাড়া অন্য উপকার না থাকিত, তবে উপরোক্ত প্রশ্ন ন্যায়সঙ্গত হইত। অন্য উপকার থাকা অবস্থায় এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

**আখেরাতের ব্যাপারঃ** হুযূর (দঃ)-এর শান হইলঃ

گفتــۂ او گفتــۂ الله بود ــ گرچه از حلقوم عبد الله بود

"তাঁহার উক্তি আল্লাহ্ তা'আলারই উক্তি—যদিও আল্লাহ্‌র বান্দার মুখ হইতে তাহা উচ্চারিত হয়।" তিনি বলিলেনঃ যে কোরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করিবে, তাহার জন্য দশটি নেকী

লেখা হয়। অনুমান করুন, এক অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া গেলে সারা কোরআন পাঠে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যাইবে, ইহা কি কম বড় উপকার? যদি কেহ বলে যে, নেকী দ্বারা কি কাজ হইবে? তবে জানা দরকার যে, এক্ষণে নেকী অকেজো মনে হইলেও দুনিয়া হইতে আখেরাতে পৌঁছার পর বুঝিতে পারিবে যে, নেকী কেমন উপকারী মুদ্রা।

মনে কর, এক ব্যক্তি মক্কা যাইতেছে। বোম্বাই পৌঁছিলে কেহ তাহাকে মক্কায় প্রচলিত মুদ্রা দিল। এখন এই মুদ্রা যদিও বোম্বাইয়ে অচল এবং আদন বন্দরেও চলিবে না; কিন্তু সে জানে যে, চারি দিন পরই সে মক্কা পৌঁছিবে। এই কারণে সে মুদ্রাকে বেকার বা অচল মনে করিবে না। কেহ মনে করিলে তাহাকে বলা হইবে যে, কয়েক দিন পরই বুঝিতে পারিবে যে, ইহা কি কাজে আসিবে?

বর্তমানে নেকী বেকার জিনিস বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে যখন সকলের আমলনামা ওযন করা হইবে এবং তদনুযায়ী প্রত্যেকেই পুরস্কার কিংবা শাস্তি পাইতে থাকিবে, কিন্তু তোমার হাত খালি থাকিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, নেকী কি জিনিস? কবি বলেনঃ

که بازار چندانکه آگنده تر — تهیدست را دل پر آگنده تر

অর্থাৎ, কোন উৎকৃষ্ট বাজারে নিঃস্ব ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিলে সে বিষণ্ণ না হইয়া পারিবে না। কারণ, সে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করিবে, উত্তম ও মূল্যবান জিনিসপত্র দেখিতে পাইবে। সঙ্গেসঙ্গে আপন রিক্তহস্ততাও মনে পড়িবে। ফলে তাহার দুঃখ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে। বিশেষতঃ বাজারে যাইবার সময় যদি তাহাকে টাকা লইয়া যাইতে বলা হইয়া থাকে; কিন্তু সে উপেক্ষাভরে খালি হাতেই চলিয়া যায়, তবে তাহার মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না।

যাহারা নেকীর কোন মূল্য দেয় না, কিয়ামতের ময়দানে তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। সে সময় নেকীরূপ মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন মুদ্রা কাজে আসিবে না। কারণ, তথায় দুনিয়ার কোন বস্তু সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَاخَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَاخَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ○

অর্থাৎ, তোমরা এখানে একা একা আসিয়াছ। আমি যে সব বস্তু তোমাদিগকে দিয়াছিলাম সব পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছ। সঙ্গে আনিলেও কোন লাভ হইত না। কারণ আল্লাহ্ বলেনঃ মানুষ যদি সারা দুনিয়ার ধনভাণ্ডারও প্রাপ্ত হয় এবং তাহা মুক্তি লাভের জন্য ফিদয়াস্বরূপ দেয়, তবুও তাহা গ্রহণ করা হইবে না। সুতরাং 'নেকী দ্বারা কি করিব'-এর উত্তর জানা গেল। অর্থাৎ, কিয়ামতের ময়দানে ইহার মূল্য বুঝা যাইবে। সেখানে নেকীই হইবে সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তু।

এমন কি, এক ব্যক্তির আমল ওযন করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার গোনাহ্ ও নেকী উভয়ই সমান সমান। তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইবে—কাহারও নিকট হইতে একটি নেকী যোগাড় করিয়া আনিলে তোমার মাগ্‌ফেরাত হইবে। ইহা শুনিয়া সে খুবই আনন্দিত হইবে যে, ভাই, পুত্র, মা বাপ, আত্মীয়স্বজন কত লোকই তো রহিয়াছে। কেহ না কেহ অবশ্যই আমাকে একটি নেকী দিবে। সে এই মনে করিয়া একে একে সকলের নিকট যাইবে; কিন্তু প্রত্যেকেই নেকী দিতে অস্বীকৃত হইবে। তখন সে খুবই পেরেশান হইবে এবং প্রায় নিরাশ হইয়া যাইবে। ঠিক তখনই

এক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে, সে তাহার পেরেশানী দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, আমি একটি মাত্র নেকী খুঁজিয়া ফিরিতেছি। ইহা না হইলে আমার মাগ্‌ফেরাত হইবে না; কিন্তু কেহই দিতেছে না। ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি বলিবে, একটিমাত্র নেকীর কারণে তোমার মাগ্‌ফেরাত হইতেছে না। আমি সারা জীবনে নেকী বলিতে একটিমাত্রই করিয়াছি। বাকী সমস্তই গোনাহ্‌। সুতরাং একটি নেকী আমার কোন কাজে আসিবে না। লও, আমি ঐ নেকীটি তোমাকেই দান করিলাম যাহাতে তোমার মাগ্‌ফেরাত হইয়া যায়। এই নেকীটি লইয়া এই ব্যক্তি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে খোদার দরবারে পৌঁছিবে। ফলে তাহার মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে এবং সঙ্গেসঙ্গে নেকীদাতারও মাগ্‌ফেরাত হইয়া যাইবে।

নেকীর মূল্য কতটুকু, কিয়ামতের ময়দানে ইহার প্রয়োজন কতখানি এবং তথায় ইহা কিরূপ দুষ্প্রাপ্য হইবে—উপরোক্ত আলোচনায় আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন। তখন বুঝা যাইবে যে, দুনিয়াতে কেহ একবার কোরআন খতম করিয়া থাকিলে, উহা দ্বারা তাহার কত উপকার হইবে এবং তাহার আমলনামায় কি পরিমাণ নেকী লিখিত হইবে। এখন আরও সুস্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বুঝুন।

স্কুলে ছাত্রদিগকে জ্যামিতি পড়ানো হয়; কিন্তু প্রতি বিশজনের মধ্যে একজনও এমন হয় না যে, উহার সূত্রগুলি সঠিকভাবে বুঝিতে পারে। তবু পরীক্ষার সময় তাহারা না বুঝিয়াই সেগুলি মুখস্থ করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, না বুঝিয়া মুখস্থ করাও লাভজনক।

বন্ধুগণ, পরিতাপের বিষয়, দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে যে সব বিষয় স্বীকৃত ধর্মের ব্যাপারে সেগুলিতেই যতসব সন্দেহ ও শঙ্কা পেশ করা হয়। যেন বানান শুদ্ধ কিন্তু মিলাইয়া পড়া ভুল। এক ব্যক্তি تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ পড়া আরম্ভ করিয়াছিল। সে ইহার বানান করিল তে বে যবর তাব্‌ ও বে তে যবর বাত; কিন্তু মিলাইয়া পড়ার সময় ইহাকে بطخ বাত্‌খ উচ্চারণ করিল। তদ্রূপ আজকালকার মানুষ পৃথক পৃথকভাবে দলীলের প্রত্যেকটি মোকদ্দমা তথা অংশবিশেষ স্বীকার করে; কিন্তু সবগুলি অংশ মিলাইলে যে নতীজা বা ফল প্রকাশ পায়, তাহা অস্বীকার করে। ইহাকেই বলে, 'বানান শুদ্ধ কিন্তু মিলাইয়া পড়া ভুল'। কেমন হঠকারিতা ও গোঁড়ামি! দলীলের সবগুলি অংশ স্বীকৃত হইলে উহার ফল স্বীকৃত না হওয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? উহাও অবশ্য স্বীকৃত হওয়া দরকার। সুতরাং বুঝা গেল, হেফাযতের খাতিরে না বুঝিয়া হইলেও কোরআন পাঠ করা নেহায়ৎ জরুরী এবং ছওয়াব ও বিরাট পুরস্কার পাওয়ার জন্য খুবই উপকারী।

**কোরআন শিক্ষা দেওয়ার সঠিক সময়ঃ** মুসলমানের সন্তানদিগকে সর্বপ্রথম কোরআন শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেননা, কচি বয়সে অন্যান্য শিক্ষার যোগ্যতা হয় না। এমতাবস্থায় লাভের মধ্যে কোরআন পড়া হইয়া যায়। কোরআন না পড়াইলে এই সময়টি অনর্থক কাটে। অনেকেই মনে করে—বয়স হইলে ছেলে নিজেই কোরআন পড়িয়া লইবে। ফলে তাহারা ছেলেদিগকে কোরআন পড়ায় না। কিন্তু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, বয়স বাড়িয়া গেলে চিন্তাধারা একমুখী থাকে না, সময় জুটে না এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও যোগাড় হয় না। একদিকে জীবিকার চিন্তা, অন্যদিকে পরিবার পরিজনের কলহ কোন্দল। এসবের ফলে চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এতসব ঝামেলার মধ্যে কোন কাজ না হওয়াই স্বাভাবিক। দুই এক জনে এই অবস্থায়ও কোরআন পড়িয়া

থাকিলে তাহা ধর্তব্য নহে। কেননা, এরূপ ব্যতিক্রম সর্বত্র হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে কোন নীতির ব্যাপকতা বাতিল হইয়া যায় না। অতএব, বড় হইয়া কোরআন পড়া মুশকিল, এমন কি প্রায় অসম্ভব। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করিতেছে, ভবিষ্যতেও যদি এরূপ থাকে, তবে বিচিত্র নয় যে, নামায পাঠ করার জন্য মুসলমান ছেলেদিগকে আর্য এবং খৃষ্টানদের নিকট কোরআন জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

**অনুমতি লাভের রহস্যঃ** বিষয়টি সম্ভবতঃ আপনার নিকট আশ্চর্যজনক ঠেকিবে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অবস্থার বর্তমান গতিধারার এরূপ পরিণতি হওয়া মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নহে। দেখুন, আপনি শরীঅতের আহ্‌কাম ছাড়িতে বসিয়াছেন। অন্যান্য কওম ইহাদের সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ করিতেছে। ফলে আজ আপনি অনেক-গুলি ইসলামী আহকামকে ইসলামী আহকাম বলিয়াই জানেন না; বরং আপনার ধারণা এই যে, এগুলি ইংরেজ কিংবা অন্যান্য জাতির সামাজিকতার বৈশিষ্ট্য এবং আপনি তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতেছেন।

অনুমতি প্রার্থনা করার ব্যাপারটি ঐ সব আহকামের মধ্যে অন্যতম। আমাদের পবিত্র শরীঅত এই নির্দেশ দেয় যে, অন্যের নির্জন বাসগৃহে—যদিও তাহা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে—গৃহকর্তার অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করিও না। বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সভ্য জাতিগুলি এই নির্দেশের সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া ইহার উপর আমল করিতে শুরু করিয়াছে। এখন মুসলমানগণ ইহাকে ইউরোপীয় সামাজিকতার অঙ্গ বলিয়া মনে করে। ইহা যে আমাদের শরীঅতের নির্দেশ এবং অন্যে ইহা হইতে লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে তাহারা মোটেই জ্ঞাত নহে। অথচ এই নির্দেশটি সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছেঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

অর্থাৎ, "তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ, শুন—নিজের বসবাসের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিও না—যে পর্যন্ত গৃহবাসীর অনুমতি না লও এবং (অনুমতি লওয়ার পূর্বে) তাহাকে সালাম না কর। ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম। (ইহা এই জন্য বলা হইল) যাহাতে তোমরা লক্ষ্য রাখ (এবং এই অনুযায়ী আমল কর)।

ইহার রহস্য এই যে, এই নিয়মানুযায়ী আমল করিলে জাতীয় একতা বৃদ্ধি পায়। কেননা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও অকৃত্রিমতাই ঐক্যের মূল শিকড়। যে পর্যন্ত একে অন্যের দ্বারা কোনরূপ কষ্ট না পায়, সেই পর্যন্ত পরস্পরের আন্তরিক পরিচ্ছন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অনুমতি প্রার্থনার উপরোক্ত মাসআলাটির উপর আমল না করিলে প্রায়ই কষ্ট হইয়া থাকে; বরং কষ্ট মনে মলিনতা সৃষ্টি করে এবং আন্তরিক মলিনতা কপটতা ও বিভেদকে জন্ম দেয়। এই মাসআলাটির উপর আমল করিলে কখনও এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে না। মনে করুন, কেহ আপনার নিকট অনুমতি চাহিলে আপনি অকপটভাবে বলিয়া দিতে পারেন যে, এখন আমি কাজে আছি কিংবা বিশ্রাম করিতে চাই। যে সব জাতি এই মাসআলাটির উপর আমল করে, লক্ষ্য করুন, তাহারা কত শান্তিতে বসবাস করিতেছে।

এমনি আরও অনেক মাসআলা ইসলাম আমাদিগকে শিখাইয়াছিল। আমরা আজ সেগুলি ত্যাগ করিয়াছি এবং বিজাতীয়রা গ্রহণ করিয়াছে। আজ সেগুলির উপর আমল করিলে তাহাদের নিকট হইতে আমদানী করিয়া এবং তাহাদেরই বিষয়-সম্পদ মনে করিয়া আমল করি। আমার আশঙ্কা হয় যে, এই সব মাসআলার ন্যায় কোরআনও বিজাতির নিকট পাঠ করার সময় আসিয়া পড়িতে পারে। (খোদা না করুন) যদি এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তবে মুসলমানদের আত্ম-সম্মানবোধ তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? সহ্য না করিলে এখন হইতেই ইহার সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা হয় না কেন? বন্ধুগণ, স্মরণ রাখুনঃ

سر چشمہ بایـد گرفتن به میـل ۔ چو پر شد نه شاید گزشتن به پیل

"নালার মুখ সামান্য জিনিস দ্বারাও বন্ধ করা যায়, কিন্তু উহা বড় হইয়া গেলে হাতী দ্বারাও তাহা রোধ করা যায় না।" অর্থাৎ, সীমা ছাড়াইয়া গেলে সকল চেষ্টা চরিত্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

**মস্তিষ্কের দুর্বলতাজনিত অজুহাতঃ** এতদ্ব্যতীত কোরআনের শব্দগুলি এত মধুর ও মিষ্ট যে, আপনাআপনি সেদিকে আকর্ষণ হওয়া উচিত ছিল। ছওয়াব ইত্যাদি পাওয়ার ওয়াদা না থাকিলেও উহা মুখস্থ করা উচিত ছিল। কেহ কেহ বলে, হেফ্য করিলে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে। এই কারণে তাহারা আপন ছেলেদিগকে হেফয করায় না। কারণ, মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়িলে তাহারা অন্য কোন কাজের উপযুক্ত থাকে না। ইহার উত্তরে একজন ডাক্তারের উক্তি উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি।

জনৈক ডাক্তার আমাকে বলিয়াছেন, একমাত্র গভীর চিন্তার কারণেই মস্তিষ্ক দুর্বল হয়, শব্দ মুখস্থ করার কারণে হয় না। কেননা, মুখস্থ করা মস্তিষ্কের আসল সাধনা নহে; বরং উহা শুধু জিহ্বার সাধনা। মস্তিষ্কের সাধনা হইল গভীর চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা। অতএব, মুখস্থ করার কারণে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় না। ইহার ফলে ক্লান্ত হইলে জিহ্বাই ক্লান্ত হইবে, কিন্তু জিহ্বা কখনও ক্লান্ত হয় না।

ডাক্তার সাহেব আরও বলিয়াছেন, ছেলে যখন কোনকিছু করার যোগ্য হয় না, তখনই কোরআন মুখস্থ হইয়া যায়। অর্থাৎ, ছেলের মস্তিষ্কে যখন কোন কাজ করার কিংবা চিন্তা করার যোগ্যতাই পয়দা হয় না, তখনই সে কোরআন মুখস্থ করিতে পারে। ঐ সময় জোর জবরদস্তি ছেলেকে কোন কাজে লাগাইয়া দিলে পরিণামে ক্ষতিই ভোগ করিতে হয়।

অতএব, বুঝা গেল যে, সংযত গতিতে চলিলে যখন ছেলেকে অন্য কোন কাজে না লাগানো হয়, তখনও সে কোরআন মুখস্থ করিতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, হেফ্য করিলে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে—তবুও আমি বলি যে, মস্তিষ্ক কাহার দেওয়া? বন্ধুগণ, আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া মস্তিষ্ক সারা জীবন শুধু নিজের কাজে ব্যয় করা এবং দুই চারি বৎসরও খোদার কাজে নিয়োজিত না করা কি লজ্জার বিষয় নহে? মোটকথা, যে দিক হইতেই দেখা হউক না কেন, কোরআন হেফ্য করা নেহায়ৎ জরুরী বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহার একটি বড় উপকার এই যে, কোরআন হেফ্য করিলে অন্যান্য শিক্ষা খুবই সহজ হইয়া যায়।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রঃ)-এর নিকট কেহ ছেলে লইয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, সে কোরআন হেফ্য করিয়াছে কি না। ছেলেটি হাফেয হইলে তিনি বলিতেন,

www.almodina.com

ইনশাআল্লাহ্ সে পড়িতে পারিবে। পক্ষান্তরে হাফেয না হইলে তিনি ওয়াদা করিতেন না; বরং এইরূপ বলিতেন, আমিও দো'আ করিব, আপনিও দো'আ করিতে থাকুন—যাহাতে সে লেখাপড়া করিতে পারে।

বাস্তবিকই অভিজ্ঞতা দৃষ্টে জানা গিয়াছে যে, হাফেযদের পক্ষে অন্যান্য শিক্ষা খুবই সহজ হইয়া যায়। ছেলেকে হাফেয বানাইলে তাহার হেফ্‌য যাহাতে বাকী থাকে, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা, অনেক হাফেয ইংরেজী শিক্ষায় এত বেশী মগ্ন হইয়া পড়ে যে, পিতামাতার চেষ্টা ও শৈশবের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। এই সব লোকদের কারণেই তথাকথিত জ্ঞানীরা এই অসার ধারণা পোষণ করিয়া থাকে যে, হেফয করা মানেই সময় নষ্ট করা। কাজেই হাফেয ছেলের হেফয যাহাতে বজায় থাকে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন এবং কোরআন তেলাওয়াতের জন্য দৈনিক একটি সময় বাহির করিয়া লউন।

যদি বলেন, কাজের ভিড়ের দরুন সময় পাওয়া যায় না, তবে আমি বলিব যে, আপনি যদি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ডাক্তার এই পরামর্শ দেয় যে, দৈনিক এক ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করিতে হইবে, তখন সময় কোথায় পাইবেন? কাজেই কিছুক্ষণের জন্য ধর্মকে এইরূপই মনে করিয়া তজ্জন্য সামান্য সময় বাহির করিয়া লউন।

(এই পর্যন্ত পৌঁছিলে ওয়ায-লেখকের কাগজ ফুরাইয়া যায়। সভাস্থলে তালাশ করিয়াও কাহারও নিকট কাগজ পাওয়া গেল না। ফলে বাধ্য হইয়া অবশিষ্ট ওয়ায লিপিবদ্ধ করার কাজ ত্যাগ করিতে হইল।)

— ■ সমাপ্ত ■ —

www.almodina.com